কাজী আনোয়ার হোসেন

দুইখণ্ড একত্রে

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

কলোরাডোর পার্বত্য অঞ্চলে টেবল লেকের
গভীর পানির নিচে ছাব্বিশ বছর ধরে
শুয়ে আছে এক বিশাল প্লেন।

সামান্য এক সূত্র ধরে কয়েক পা এগিয়েই প্লেনটা আবিষ্কার করে
ফেলল কৌতূহলী রানা। স্ট্র্যাটোক্রুজারে থাকার কথা
চারজনের কঙ্কাল, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে পাঁচটি।
পঞ্চম কঙ্কালটির গায়ে এখনও মাংস লেগে রয়েছে কেন?
তবে কি অনেক পরে গিয়ে মারা পড়েছে লোকটা?
নাকি কেউ মেরে রেখে এসেছে ওখানে?

ভয়ঙ্করদর্শন কামানের গোলাগুলো সব ঠিক আছে তো?
নাকি চুরি গেছে এক আধটা? কেউ জানে না কী মারাত্মক বিপদ
ঘনিয়ে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

প্রেতাত্মা

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7089-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮১
ষষ্ঠ প্রকাশ ২০০৪

প্রচ্ছদ বিদেশী ছবি অবলম্বনে
আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল. ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি ও. বক্স: ৮৫০
E-mail sebaprok@citechco.net
Website. www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

তেতাল্লিশ টাকা

Masud Rana
PRETATMA
Part I & II
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

প্রেতাত্মা-১	—৯৬
প্রেতাত্ম-২	৯৭—১৮৪

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৯/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৫৪/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫২/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৮/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৫২/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৪৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৮০/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,ঋ২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)'	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-

১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৫৩/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫	আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭	অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০	শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৫৪/-
১৯১-১৯২	দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৬৯/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪	নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮	বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০	স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-

২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪	কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১	কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪	হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১	কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮	শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫	প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৪৬/-
২৭৬-২৯১	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭	শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩	গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪	কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত.	৪২/-
২৯৫-২৯৭	বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬	শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২	বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪	জন্মশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭	দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২	পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৫৪/-
৩০৯-৩১০	দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪	বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬	চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯	মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭	চরসন্দ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১	মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৪৩/-
৩২৩-৩৫২	অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮	অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৫৮/-
৩২৬-৩২৭	স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৩৩২-৩৩৩	টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩১-৩৪১	ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৪২/-
৩৪০-৩৪৩	আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৫/-

প্রেতাত্মা-১

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৮১

এক

উনিশশো চুয়ান্ন সাল। জানুয়ারি।

কলোরাডো। বাকলী ন্যাভাল এয়ার স্টেশন।

হাড়-কাঁপানো শীতের রাত। হু হু করে বইছে বাতাস। ঝিরঝির তুষার ঝরছে। রানওয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাইনোসর আকৃতির প্রকাণ্ড বোয়িং সি-নাইনটি-সেভেন স্ট্রাটোক্রুজার। উইং আর ফিউজিলাজে ধবধব করছে তুষারের স্তূপ। ককপিট উইণ্ডশীল্ডের আলোটা পিটপিট করছে, আধিভৌতিক ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্রুরা।

মার্কিন নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কটের কামরা। কাঁচ লাগানো জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমান বাহিনীর মেজর ভ্যান জনসন। তেল ঢালার কাজ শেষ করে ফিরে যাচ্ছে ফুয়েল ট্রাক, ঝড়ো আলো-আঁধারিতে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, সেদিকে তাকিয়ে আছে সে। চোখ ফিরিয়ে আবার যখন তাকাল স্ট্রাটোক্রুজারের দিকে, দেখল মস্ত পেটের পিছন থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছে লোড করার ঢালু সেতুটা। হেভী-ডিউটি ফর্ক-লিফটের ওপর চৌকো একটা আলো পড়েছে, ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে সেটা, ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কার্গোর দরজা।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রানওয়ের দিকে তাকাল মেজর ভ্যান জনসন। বাকলী এয়ার স্টেশনের এগারো হাজার ফুট রানওয়েকে দুই সারি সাদা আলো ঘিরে রেখেছে। সমুদ্রের গা থেকে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে, কলোরাডোর বিস্তীর্ণ সমভূমির মাঝখানে এই এয়ার স্টেশন। ভৌতিক আলোকমালার মিছিল খুব বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না, অঝোর ধারা তুষারের পর্দায় বাধা পেয়ে আবছা হয়ে গেছে।

জানালার কাঁচে নিজের মুখের প্রতিবিম্বে চোখ রাখল মেজর ভ্যান জনসন। চেহারায় আশ্চর্য একটা কাঠিন্যের সাথে মিশে রয়েছে উৎকণ্ঠার ভাব। ক্যাপটা মাথার পিছনে অবহেলার সাথে নামানো, পাতলা সোনালী চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। কাঁধ দুটো ঝুঁকে রয়েছে সামনের দিকে। চোখ দুটো সতর্ক সজাগ, স্টার্টার পিস্তলের আওয়াজ হলেই যেন হানড্রেড মিটার দৌড় শুরু করবে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে দুর্যোগের ঘটা, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল স্ট্রাটোক্রুজার, নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল মেজর। চোখ দুটো বুজে মনের পর্দা থেকে দৃশ্যটা মুছে ফেলার চেষ্টা করল সে, ধীরে ধীরে পিছন ফিরল জানালার দিকে।

ডেস্কের কিনারায় বসে আছেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। যত্নের সাথে

একটা মিটিয়োরোলজিক্যাল চার্ট ভাঁজ করে রুমাল বের করলেন তিনি, টাক মাথায় জমে ওঠা ঘাম মুছে মেজরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। 'ঝড়ের মুখটা রকির পুব ঢাল থেকে সরে যাচ্ছে। কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের কাছাকাছি পৌঁছে দুর্যোগের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে তুমি।'

'এই হস্তিনীকে যদি মাটি থেকে তুলতে পারি, তবেই!'

'ওটা কোন সমস্যাই নয়,' গম্ভীর সুরে বললেন অ্যাডমিরাল, 'তুমি শুধু শুধু ভয় করছ।'

'শুধু শুধু, স্যার?' অ্যাডমিরালের চোখে চোখ রেখে কথা বলছে মেজর, অনেক কষ্টে গলাটাকে শান্ত রেখেছে সে। 'থারটি নট বাতাসের ঝাপটা পাল্টা ঝাপটার মাঝখানে সত্তর হাজার পাউণ্ড কার্গোসহ ফুল ফুয়েল লোড নিয়ে বিশাল এক প্লেনকে আকাশে তোলা আমার কাছে কুসুম কোমল কোন কাজ নয়, অ্যাডমিরাল।'

'সবগুলো বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা হয়েছে, মেজর,' অনুত্তেজিত ঠাণ্ডা গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'তিন হাজার ফুট বাকি থাকতেই তোমার প্লেনের চাকা রানওয়ে ছেড়ে উঠে পড়বে।'

চুপসানো বেলুনের মত একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল মেজর ভ্যান জনসন। 'আপনি যাই বলুন, যত আশ্বাসই দিন, আমি জানি আমার ক্রুদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। আমাকে ভুল বুঝবেন না, অ্যাডমিরাল। কিন্তু ঝুঁকি নেয়ার পিছনের কারণটা জানা থাকলে নিজেকে অন্তত একটু সান্ত্বনা দিতে পারতাম। এমন কি ভয়ঙ্কর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটেছে যে এই রাত দুপুরে মুহূর্তের নোটিশে এয়ার ফোর্সের একটা প্লেন ধার করতে হলো ইউ.এস. নেভীকে? মানুষ নয়, সত্তর হাজার পাউণ্ড আবর্জনা বয়ে নিয়ে যেতে হবে আমার ক্রুদেরকে। তাও প্যাসিফিক মহাসাগরের কোন এক অখ্যাত দ্বীপে, যার নাম পর্যন্ত শুনিনি কখনও!'

মুহূর্তের জন্যে চেহারাটা লালচে হয়ে উঠল অ্যাডমিরালের, কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। শান্ত কোমল একটা ভাব ফুটে উঠল তাঁর চোখে-মুখে। একটু পর যখন কথা বললেন, প্রায় ক্ষমা-প্রার্থনার মত শোনাল গলার আওয়াজটা। 'এর মধ্যে গোলমেলে কোন ব্যাপার নেই, মেজর। তুমি যাকে আবর্জনা বলছ, ওটা আসলে একটা টপ প্রায়োরিটি কার্গো, হাইলি ক্লাসিফায়েড টেস্ট প্রোগ্রামের আওতায় প্রশান্ত মহাসাগরে পাঠানো হচ্ছে। এক হাজার মাইলের মধ্যে তোমাদের স্ট্রাটোক্রুজারটারই একমাত্র হেভী ট্র্যান্সপোর্ট ছিল বলে ওটাকেই ধার করতে হয়েছে নেভীর। স্ট্রাটোক্রুজারের সাথে তোমাদেরকেও ধারে পেয়েছি আমরা। ব্যস, এর মধ্যে আর কিছু নেই।'

তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকাল অ্যাডমিরালের দিকে মেজর। 'আমি বেয়াড়া হতে চাইছি না, অ্যাডমিরাল। কিন্তু তবু বলছি—না, এইটুকুই সব নয়।'

ডেস্ক থেকে নামলেন অ্যাডমিরাল। ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছেন চেয়ারের দিকে। চেয়ারে বসার আগে কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন মেজরের দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ধীরে ধীরে বসলেন তিনি। বললেন, 'তুমি এটাকে একটা রুটিন ফ্লাইট বলে মনে কোরো, তার বেশি কিছু না।'

'কিন্তু আপনি যদি জানান আমার কার্গো কেবিনের ওই মেটাল ক্যানগুলোয়

কি আছে, আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব, স্যার।'

মেজরের চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিলেন অ্যাডমিরাল। 'দুঃখিত, মেজর। ওগুলো হাইলি ক্লাসিফায়েড জিনিস।'

অপমান বোধ করল মেজর জনসন, লাল হয়ে উঠল চেহারাটা, কিন্তু আর কোন টুঁ-শব্দ না করে ডেস্ক থেকে তুলে নিল একটা ফোল্ডার। এতে তার ফ্লাইটের প্ল্যান আর চার্ট আছে। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল সে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগোচ্ছে দরজার দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। 'যদি এমন কিছু ঘটে, যাতে আমরা প্লেনটাকে নামাতে বাধ্য হই...'

'না! নামাবে না! ইমার্জেন্সী দেখা দিলে,' দ্রুত বলে গেলেন অ্যাডমিরাল, 'এমন জায়গায় নামাবে যেখানে লোকবসতি নেই।'

'এ আপনি কি বলছেন, স্যার!' ভুরু কুঁচকে উঠল মেজরের। 'ইমার্জেন্সী কি আর...'

'এটা আমার অনুরোধ নয়, মেজর,' কড়া সুরে বললেন অ্যাডমিরাল, 'আমি তোমাকে অর্ডার করছি! যাই ঘটুক না কেন, এখান থেকে তোমাদের গন্তব্যের মাঝখানে অন্য কোথাও স্ট্রাটোক্রুজারকে ত্যাগ করা চলবে না।'

মুখটা কালো, গম্ভীর হয়ে উঠল মেজরের। 'বেশ, আপনি যখন বলছেন, তাই হবে।'

'আরও একটা কথা।'

'বলুন।'

'গুড লাক, মেজর,' ফাঁক হলো না, অ্যাডমিরালের ঠোঁট জোড়া শুধু প্রসারিত হলো। নিঃশব্দে হাসছেন তিনি। হাসিটা ভাল লাগল না মেজরের, কেন যেন নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল সে। কোন উত্তর না দিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল, বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

স্ট্রাটোক্রুজার। কন্ট্রোল কেবিন। মাথা নিচু করে একটা ফ্লাইট চেকলিস্ট দেখছে কো-পাইলট লেফটেন্যান্ট স্যাম উড। তার পিছনে, খানিকটা বাঁ দিকে ক্রুদের নেভিগেটর অ্যালান ব্যাংকিন একটা প্রোট্র্যাকটর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কার্গো কেবিনের দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল পাইলট মেজর ভ্যান জনসন, কিন্তু যে যার কাজে এতই মগ্ন, কেউ মুখ তুলে তাকাল না।

'কোর্সের প্লট তৈরি হয়েছে?' অ্যালান ব্যাংকিনকে জিজ্ঞেস করল পাইলট।

'সমস্ত ঝামেলার কাজ নেভীর এক্সপার্টরা সেরে দিয়ে গেছে,' বলল ব্যাংকিন। 'কেমন যেন রহস্যময় ব্যাপার, মেজর। খুঁতখুঁত করছে মনটা।'

'কারণ?'

'বেছে বেছে এমন একটা রুট তৈরি করে দিয়ে গেছে...' কাঁধ ঝাঁকাল নেভিগেটর, 'পশ্চিমের সবচেয়ে নির্জন এলাকার ওপর দিয়ে যেতে বলা হচ্ছে আমাদেরকে। কারণটা যে কি বুঝতে পারছি না।'

কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল মেজর জনসনের। ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়াল না র‍্যাংকিনের। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে, কার্গো সেকশনের দিকে তাকাল মেজর। বড় আকারের মেটাল ক্যানগুলো স্ট্র্যাপ দিয়ে শক্তভাবে বাঁধা রয়েছে। কি

আছে ওগুলোর ভেতর?

কেবিনের দরজা দিয়ে উঁকি মারল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার মাস্টার সার্জেন্ট জো। 'সমস্ত চেকিঙের কাজ শেষ, পাইলট। স্ট্রাটোক্রুজার আপনার যে-কোন আদেশ পালন করার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।'

মেটাল ক্যানগুলোর দিক থেকে চোখ না সরিয়ে মেজর ভ্যান জনসন বলল, 'ঠিক আছে, আতঙ্কের ডিপোটাকে এবার রাস্তায় নামাও।'

সুইচ অন করতেই প্রথম এঞ্জিনটা জ্যান্ত হয়ে উঠল, তারপর দ্রুত একে একে প্রাণ পেল বাকি তিনটে এঞ্জিন। এরপর অক্সিলারী-পাওয়ার ইউনিটের প্লাগ খুলে ফেলা হলো, ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়া হলো চাকা ধরে রাখার চোকগুলোকে। বোঝার ভারে আড়ষ্ট প্লেনটাকে নিয়ে মেইন রানওয়ের শেষ মাথার দিকে রওনা হয়েছে পাইলট। সিকিউরিটি গার্ড আর মেইন্টেন্যান্স ক্রুরা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটছে হ্যাঙ্গারের দিকে, তাদের মাথায় আর পিঠে লক্ষ-কোটি খুদে বর্শার মত আঘাত করছে তুষার কণা।

বাকলী কন্ট্রোল টাওয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। ভরামাসের পোয়াতী ছারপোকার মত হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে স্ট্রাটোক্রুজার, সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। তাঁর হাতে একটা টেলিফোনের রিসিভার, কথা বলছেন নিচু গলায়।

'প্রেসিডেন্টকে জানান, সেক্সটন-ফাইভ-থ্রী টেক-অফের জন্যে তৈরি হচ্ছে।'

'পৌঁছুতে আন্দাজ কতক্ষণ লাগবে বলে মনে করেন?' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি ডেভিড সেলজার তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইলেন।

'ফুয়েলের জন্যে একবার শুধু হাওয়াইয়ের হিকাম ফিল্ডে থামবে, ওখান থেকে সোজা এক্সপেরিমেন্ট এলাকায় পৌঁছুবার কথা ওয়াশিংটন সময় চোদ্দশো ঘণ্টায়।'

'শূন্য-আট-শূন্য-শূন্য ঘণ্টায় আমাদের সাথে দেখা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের। তাঁর নির্দেশ, ওই সময় অনুষ্ঠিতব্য এক্সপেরিমেন্ট আর সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর ফ্লাইট প্রোগ্রামের বিশদ বিবরণ জানাতে হবে তাঁকে।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওয়াশিংটনে পৌঁচাচ্ছি আমি,' বললেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। 'প্লেনটা আকাশে উঠলেই আমি রওনা হব।'

'আশা করি সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতা নেয়া হয়েছে, অ্যাডমিরাল?' সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ডেভিড সেলজার গম্ভীর গলায় বললেন, 'বড় কোন শহরের ভেতর বা কাছাকাছি ওই প্লেন যদি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে, তার পরিণাম কি হবে, নিশ্চয়ই আপনার তা জানা আছে?'

একটানা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, মি. সেক্রেটারি, আমার তা জানা আছে। সেটা এমন একটা দুঃস্বপ্ন হবে, যা দেখার পর কেউ আমরা বেঁচে থাকতে চাইব না।'

গভীর মনোযোগের সাথে এঞ্জিনিয়ারের প্যানেলের দিকে তাকিয়ে আছে সার্জেন্ট জো। 'বোর্ডে ম্যানিফোল্ড প্রেসার আর টর্ক রিডিং সামান্য একটু নিচে দেখতে

পাচ্ছি,' ঘোষণার সুরে বলল সে।

'এনাফ টু অ্যাবোর্ট?' জানতে চাইল স্যাম উড।

'সরি, লেফটেন্যান্ট। ইন্টারন্যাল-কমবাস্টশন এঞ্জিন সী-লেভেলে যে ধরনের আচরণ করে তা ডেনভারের পাতলা পাহাড়ী বাতাসে আশা করা যায় না। উচ্চতার বিবেচনায় কোর্স অনুপাতে গজ রিডিং ঠিকই আছে।'

সামনের লম্বা রানওয়ের দিকে তাকিয়ে আছে মেজর ভ্যান জনসন। আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়ে গেছে তুষারের ধারা। রানওয়ের অর্ধেক দূরত্বে মার্কারটা আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে সে এখন। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা আরেকটু দ্রুত গতি পেল, উইণ্ডশীল্ডে ওয়াইপারের অবিরাম যাওয়া-আসার সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ি খাচ্ছে পাঁজরের গায়ে। ছোট একটা মাঠের মত লাগছে রানওয়েটাকে। ঢোক গিলল পাইলট। নেশাগ্রস্ত মাতালের মত টলে উঠল একবার মাথাটা। হ্যাণ্ড মাইকটা চেপে ধরল সে।

'বাকলী কন্ট্রোল, দিস ইজ সেক্সটন-ফাইভ-থ্রী। রেডি টু রোল। ওভার।'

'গুড লাক, আই রিপিট, গুড লাক, সেক্সটন-ফাইভ-থ্রী,' হেডফোনে অ্যাডমিরালের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে মেজর জনসন। 'আবার যখন দেখা হবে, তোমাকে একটা ফুল উপহার দেব আমি।'

বাঁধাধরা গৎ আউড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল মেজর জনসন। রিলিজ করে দিল ব্রেকগুলো। বিরতিগুলোয় না থেমে ঠেলে দিল চারটে থ্রটল।

ইলেকট্রিক বাল্বের মত ভোঁতা নাক নিয়ে সামনে এগোতে শুরু করল স্ট্রাটোক্রুজার। ঝড়ের মাতলামি এখন তুঙ্গে। কো-পাইলট স্যাম উড একঘেয়ে সুরে গ্রাউণ্ড স্পীড জানাচ্ছে।

'ফিফটি নট্স্।'

হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা নয় লেখা আলোকিত সাইন ধেয়ে এল ওদের দিকে, নিমেষে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সেটা।

'আর নয় হাজার ফুট বাকি,' স্যাম উড সতর্ক করে দিল। 'গ্রাউণ্ড স্পীড সত্তর।'

ডানার ডগার পাশ দিয়ে রানওয়ের সাদা আলো স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে পিছিয়ে যাচ্ছে। শক্তিশালী প্রাট-হুইটনি এঞ্জিনগুলো ক্রমশ তাদের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করছে। বিদ্যুৎগতিতে বাতাস কাটছে চার ব্লেডের প্রপেলারগুলো। হুইলের ওপর ভ্যান জনসনের হাত দুটো শক্ত সিমেন্টের মত আটকে গেছে। সাদা হয়ে গেছে তার নখের ডগাগুলো, ঠোঁট জোড়া নড়ছে। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে সে, অথবা অভিশাপ দিচ্ছে।

'একশো নট···বাকি সাত হাজার ফুট।'

মুহূর্তের জন্যেও ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না সার্জেন্ট জো, গজ কাঁটার প্রতিটি কম্পন তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে সে, বিপদ ঘটলে তার প্রথম লক্ষণটাই ধরতে চায়। নেভিগেটর অ্যালান র‍্যাংকিন চুপচাপ বসে আছে, করার কিছু নেই তার। সম্মোহিতের মত একদৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে আছে রানওয়ের দিকে।

'একশো পঁচিশ।'

কন্ট্রোলের সাথে যুঝছে এখন পাইলট। তার বাঁ দিকের চোয়াল বেয়ে ঘামের একটা ধারা নেমে আসছে, কিন্তু স্পর্শটা অনুভব করছে না সে। টপ্ করে একটা ফোঁটা পড়ল কোলের ওপর। গভীর ধ্যান মগ্নতার সাথে অপেক্ষা করছে সে একটা লক্ষণের জন্যে, যা থেকে বোঝা যাবে প্লেনটা হালকা হতে শুরু করেছে। কিন্তু কোথায় কি, এখনও মনে হচ্ছে দানবের একটা হাত যেন কেবিনের ছাদে চাপ দিয়ে রেখেছে।

'একশো পঁয়ত্রিশ নট। পাঁচ হাজার ফুট মার্কারকে বিদায় জানাও।'

'বাতাসে চড়ো, সুন্দরী! চড়ো!' ভীত সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে আবেদন জানাচ্ছে র‍্যাংকিন। ওদিকে একের পর এক নামছে স্যাম উডের রিডিং।

'একশো পঁয়তাল্লিশ নট। আর মাত্র তিন হাজার ফুট বাকি।'

'অ্যাড়মিরালের সেফটি মার্জিন ছাড়িয়ে এসেছি আমরা,' বিড় বিড় করে বলল মেজর ভ্যান জনসন।

'এগিয়ে আসছে দু'হাজার ফুট। গ্রাউণ্ড স্পীড একশো পঞ্চান্ন।'

রানওয়ের শেষ মাথায় লাল আলোটা দেখতে পাচ্ছে পাইলট। অথচ সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করছে, একটা পাথরকে শূন্যে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে সে। চোখে-মুখে একরাশ উদ্বেগ নিয়ে ঘন ঘন তার দিকে তাকাচ্ছে উড। কনুই নেড়ে ইঙ্গিতে নেভিগেটরকে জানাল আকাশে ওঠার জন্যে কন্ট্রোলকে এনগেজ করছে পাইলট। দেয়ালে গাঁথা পেরেকের মত স্থির হয়ে বসে আছে মেজর জনসন।

'ওহ্ গড···এক হাজার ফুট মার্কার···যাচ্ছে, যাচ্ছে, এই চলে গেল!'

ধীর ভঙ্গিতে কন্ট্রোল কলামটা টেনে আনল পাইলট। ঝাড়া প্রায় তিন সেকেণ্ড কিছুই ঘটল না। ভয়ঙ্কর গতিতে এগিয়ে আসছে রানওয়ের শেষ প্রান্ত। তিনটে সেকেণ্ড নয়, যেন তিনটে যুগ পেরিয়ে গেল। তারপর অসহনীয় ধীর ভঙ্গিতে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠল স্ট্রাটোক্রুজার, রানওয়ে আর মাত্র পঞ্চাশ গজ বাকি থাকতে।

'গিয়ার আপ,' কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল পাইলট।

কয়েকটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত। ল্যাণ্ডিং গিয়ারগুলো ঠেলে খোপের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। এয়ারস্পীড একটু বেড়েছে, অনুভব করল পাইলট।

'গিয়ার আপ অ্যাণ্ড লক,' বলল উড।

চারশো ফুট ওপরে উঠে ফ্ল্যাপগুলো তুলে ফেলা হলো, সাথে সাথে ফোঁস করে স্বস্তির হাঁফ ছাড়ল একযোগে কো-পাইলট আর নেভিগেটর। সতর্কতার সাথে উত্তর-পশ্চিম দিকে বিরাট একটা বাঁক নিচ্ছে পাইলট জনসন। পোর্ট উইংয়ের নিচে ডেনভারের আলো ঝলমল করছে, কিন্তু একটু পরই কাছে এগিয়ে এসে বিশাল একটা মেঘের ভেলা ঢেকে ফেলল সেটাকে। এয়ারস্পীড দুশো নট না ওঠা পর্যন্ত স্বস্তিবোধ করল না মেজর। মাটি থেকে প্লেনের দূরত্ব এখন পঁয়ত্রিশশো ফুট।

'চলো পাখি উড়ে যাই,' বলল অ্যালান র‍্যাংকিন। উডের দিকে তাকাল সে। 'মিথ্যে কথা বলব না, ভয়ে কলজে শুকিয়ে গিয়েছিল আমার। মনে হচ্ছিল এ-যাত্রা আর আকাশে ওঠা হলো না।'

নিঃশব্দে হাসছে স্যাম উড। 'আমিও সন্দেহে পড়ে গিয়েছিলাম।'

মেঘের ওপর উঠে এসেছে স্ট্রাটোক্রুজার। সোজা এগোচ্ছে রকি পর্বতমালার

দিকে। মাটি থেকে দূরত্ব ষোলো হাজার ফুট।

'সামলাও একে,' কো-পাইলট উডকে বলল ভ্যান জনসন। 'আমি পেছনটা চেক করতে যাচ্ছি।'

পাইলটের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকাল উড। ফ্লাইট শুরু হবার পর এত তাড়াতাড়ি কখনও কন্ট্রোল ছেড়ে ওঠে না মেজর। ইয়োক-এর ওপর হাত রাখল সে, বলল, 'ঠিক আছে।'

সীট বেল্ট আর শোল্ডার হারনেস খুলে উঠে দাঁড়াল মেজর, ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকল কার্গো কেবিনের ভেতর। দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর এক এক করে গুনল মেটাল ক্যানগুলো। প্রত্যেকটা একই সাইজের, স্টেইনলেস-স্টীলের তৈরি, চকচক করছে। মোট ছত্রিশটা। প্রতিটি ক্যানের ওপরের অংশ সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করল সে। স্টেনসিল দিয়ে লেখা মিলিটারি মার্কিং খুঁজছে, যাতে উল্লেখ করা হয় ওজন, ডেট অব ম্যানুফ্যাকচার, ইন্সপেক্টরের ইনিশিয়াল, হ্যাণ্ডলিং ইনস্ট্রাকশন ইত্যাদি। কিন্তু একটা ক্যানেও সে-ধরনের কোন চিহ্ন নেই।

পনেরো মিনিট খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে মেজর, এই সময় থমকে গেল তার চোখের দৃষ্টি। দুই ক্যানের মাঝখানে সরু একটা জায়গা, সেখানে ছোট্ট একটা অ্যালুমিনিয়ামের প্লেট পড়ে রয়েছে। প্লেটটার পিছনে আঠা লাগানো। স্টেইনলেস স্টীলের গায়ে চারকোনা একটা আবছা দাগ দেখে সেখানে আঙুল ছুঁইয়ে চটচটে একটা স্পর্শ পেল মেজর। ওখানে মাপ মত বসে গেল প্লেটটা। আবার সেটাকে ক্যানের গা থেকে তুলে নিয়ে আলোর নিচে এসে দাঁড়াল সে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মসৃণ দিকটায়। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। এনগ্রেভ করা খুদে মার্কিংটা তার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আশঙ্কাটাকেই সত্য বলে প্রমাণিত করছে।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে মেজর ছোট্ট প্লেটের দিকে, এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠল স্ট্রাটোক্রুজার। ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল মেজর, কেবিনের দেয়াল ধরে কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে। তারপর ছুটল ককপিটের দরজার দিকে।

দরজা খুলতেই একরাশ ধোঁয়া ঘিরে ধরল মেজরকে। ওদের তিন জনের সাথে খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করল সে। চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে বুজে চেঁচিয়ে উঠল, 'অক্সিজেন মাস্ক!'

চোখ মেলে আবার এগোল মেজর। ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার আর নেভিগেটর র‍্যাংকিনের আবছা কাঠামো দেখতে পাচ্ছে সে, স্যাম উড সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে ধোঁয়ায়। হোঁচট খেতে খেতে কোনরকমে পাইলটের সীটে গিয়ে পৌঁছুল, হাতড়ে খুঁজছে অক্সিজেন মাস্কটা। ইলেকট্রিক্যাল শর্ট-সার্কিটের তীব্র কটূ গন্ধ ঢুকছে তার নাকে।

'বাকলী টাওয়ার, দিস ইজ সেক্সটন ফাইভ-থ্রী,' একটা মাইক্রোফোনে চিৎকার করছে স্যাম উড। 'ধোঁয়ায় ভরে গেছে আমাদের ককপিট। ইমার্জেন্সী ল্যাণ্ডিং ইনস্ট্রাকশন চাইছি। ওভার।'

'কন্ট্রোলের দায়িত্ব নিচ্ছি,' বলল মেজর।

'বাঁচলাম, স্যার,' স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বলল কো-পাইলট উড।

'জো?'

'স্যার?'

'গোলমালটা কোথায় বলো তো?'

'বুঝতে পারছি না, স্যার। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ধোঁয়ায়।' অক্সিজেন মাস্কের ভেতর থেকে সার্জেন্ট জো-র গলার আওয়াজটা ফাঁপা শোনাচ্ছে। 'মনে হচ্ছে রেডিও ট্র্যান্সমিটার এলাকার দিকে কোথাও শর্ট সার্কিট…'

'বাকলী টাওয়ার, দিস ইজ সেক্সটন ফাইভ-থ্রী,' বলে চলেছে উড। 'প্লীজ কাম ইন। ধোঁয়ায় ভরে গেছে আমাদের ককপিট…।'

'লাভ নেই, লেফটেন্যান্ট,' বলল সার্জেন্ট জো। 'শর্ট সার্কিটের ফলে রেডিও ইকুইপমেন্ট অকেজো হয়ে গেছে। ওরা তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে না। কেউ তোমার কথা শুনতে পাবে না।'

দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে পাইলটের। 'প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে বাকলীর দিকে কোর্স সেট করছি,' শান্তভাবে জানাল সে।

কিন্তু একশো আশি ডিগ্রী বাঁকটা পুরো শেষ করার আগেই স্ট্রাটোক্রুজার অকস্মাৎ তীব্র একটা ঝাঁকি খেল, সেই সাথে ওদের কানের পর্দায় প্রচণ্ড আঘাত করল কর্কশ একটা ধাতব শব্দ, টেনে যেন ইস্পাত ছিঁড়ছে কেউ। এক নিমেষে সমস্ত ধোঁয়া অদৃশ্য হয়ে গেল ককপিটের ভেতর থেকে, পরমুহূর্তে শত-সহস্র মৌমাছির মত ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠাণ্ডা হিম বাতাসের ঝাপটা। প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে প্লেন, মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

'তিন নম্বর এঞ্জিনের একটা প্রপেলার ব্লেড ভেঙে গেছে!' সার্জেন্ট জো আঁতকে উঠল।

'জেসাস খ্রাইস্ট…বন্ধ করো তিন নম্বর!' নির্দেশ দিল মেজর জনসন।

কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর দ্রুতবেগে উড়ে বেড়াচ্ছে সার্জেন্ট জো-র হাত দুটো। একটু পরই প্লেনের কাঁপুনিটা থেমে গেল। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতরটা, ঘন ঘন ঢোক গিলে কন্ট্রোল চেক করছে মেজর।

'প্রপেলারের ব্লেড ফিউজিলাজ ভেদ করে বেরিয়ে গেছে,' রিপোর্ট করল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার সার্জেন্ট জো। 'কার্গো কেবিনের দেয়ালে ছয় ফুট লম্বা একটা ফাটল দেখতে পাচ্ছি, চারদিকে শুধু কেবল্ আর হাইড্রলিক লাইন ঝুলছে।'

'বোঝা গেল ধোঁয়াটা কিভাবে বেরিয়ে গেছে,' দ্রুত বলল স্যাম উড। 'কেবিন প্রেশার কমে যাওয়ায় ফাটল গলে বেরিয়ে গেছে সব।'

'রাডার আর রেডিও অকেজো হয়ে যাবার কারণটাও জানা গেল,' বলল মেজর জনসন। 'জানা গেল উইং-টিপ কন্ট্রোল কেন কাজ করছে না। আমরা ওপরে উঠতে পারব, নিচে নামতে পারব, কিন্তু ঘুরতে, বাঁক নিতে বা কাত্ হতে পারব না।'

'এক আর চার নম্বর এঞ্জিনের ফ্ল্যাপ বারবার বন্ধ আর চালু করে দেখা যেতে পারে,' পরামর্শ দিল উড। 'বাকলীতে ল্যাণ্ড করার জন্যে নাকটা একবার ঘুরিয়ে নিতে পারলেই হবে…'

'ব্লাকলীতে ফিরে যাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি আমি,' শান্ত গলায় বলল মেজর। 'তিন নম্বর এঞ্জিন বন্ধ থাকায় প্রতি মিনিটে প্রায় একশো ফুট করে নামছি আমরা। রকি পাহাড়ের কোথাও নামতে হবে আমাদেরকে, উপায় নেই।'

পাইলটের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল সবাই। একচুল নড়ল না কেউ। একটু শব্দ করল না। মেজর তার ক্রুদের চেহারায় ভয়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছে।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত পর নিস্তব্ধতা ভাঙল র‍্যাংকিন, 'মাই গড, মেজর, তা কিভাবে সম্ভব? পাহাড়ে নামব? তার আগেই তো ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে প্লেন!'

'এখনও পাওয়ার আর খানিকটা কন্ট্রোল রয়েছে আমাদের হাতে,' বলল মেজর। 'সামনে মেঘ নেই। কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি, সেটুকু অন্তত দেখতে পাব।'

'ভাগ্যকে তবু ধন্যবাদ,' কর্কশ গলায় বলল সার্জেন্ট জো।

'কোনদিকে যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল মেজর।

'টু-টু-সেভেন সাউথওয়েস্ট,' জানাল র‍্যাংকিন। 'আমাদের নির্দিষ্ট কোর্স থেকে প্রায় আশি ডিগ্রী সরে এসেছি।'

মৃদু একটু মাথা ঝাঁকাল জনসন, আর কিছু করার নেই তার। স্ট্রাটোক্রুজারকে যথাসম্ভব সোজা রাখার জন্যে সমস্ত মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করছে সে। কিন্তু অবিরাম অধঃপতনের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় নেই। তিনটে ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তিও ওপরে ধরে রাখতে পারছে না ভারী প্লেনটাকে। বোকার মত বসে আছে সে আর উড। ওদিকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে প্লেন। মাঝখানে উপত্যকা, চারদিক থেকে সেগুলোকে ঘিরে রেখেছে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু কলোরাডো রকির শৃঙ্গমালা।

বরফ মুড়ে রেখেছে পাহাড়ের গা, সাদা বরফের বিস্তারের মাঝখানে কালো গাছ মাথা উঁচু করে রয়েছে। পনেরো হাজার ফুট ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছে ওরা ডানার দু'পাশে উঁচু-নিচু পাহাড়ের চূড়া। ল্যাণ্ডিং লাইট অন করে উইণ্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল উড, খোলামেলা একটুকরো ফাঁকা জায়গা খুঁজছে। র‍্যাংকিন আর জো স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে, অবধারিত সংঘর্ষের অপেক্ষায় টান টান হয়ে রয়েছে তাদের পেশী।

অলটিমিটারের কাঁটা দশ হাজার ফুট-এর নিচে কাঁপছে। দশ হাজার ফুট! সবিস্ময়ে ভাবছে পাইলট। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার! এত নিচে নেমে এসেছে প্লেন, অথচ পাহাড়ের একটা পাঁচিল আচমকা ওদের পথের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি এখনও। তারপর হঠাৎ, ঠিক একেবারে ওদের সোজাসুজি সামনে, গাছগুলো দু'ভাগ হয়ে গেছে দেখতে পেল পাইলট। ল্যাণ্ডিং লাইটের আলোয় বরফ মোড়া একটা সমতল জায়গা দেখা যাচ্ছে।

'একটা মাঠ!' চেঁচিয়ে উঠল উড। 'চমৎকার একটা স্বর্গীয় উদ্যান! স্টারবোর্ডের দিকে পাঁচ ডিগ্রী দূরে।'

'দেখেছি,' জানাল মেজর জনসন। কোর্স সামান্য একটু বদল করার জন্যে ইঞ্জিন ফ্ল্যাপ আর থ্রটল সেটিং ঝাঁকাতে শুরু করেছে সে।

আনুষ্ঠানিকভাবে চেকলিস্ট আওড়াবার সময় এবং সুযোগ নেই, এখন শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যাপার, তাতে হয় মৃত্যু নয়তো নতুন জীবন লাভ। একেই বলে

হুইলস্ আপ ল্যাণ্ডিং। ককপিটের নাকের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালা। ইগনিশন আর ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের যোগাযোগ কেটে দিল উড। এঞ্জিন তিনটে বন্ধ করে দিল পাইলট। প্লেনটা এখন মাটি থেকে মাত্র দশ ফুট ওপরে। বিশাল গাঢ় ছায়াটা যেন লাফ দিয়ে উঠে এল ওপর দিকে, প্লেনের ফিউজিলাজের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল মুহূর্তে।

ওরা যা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক কম লাগল ঝাঁকিটা। বরফের গায়ে ঘষা খেল প্লেনের পেট, ড্রপ খেয়ে উঠে পড়ল ওপরে, তারপর আবার ঘষা খেল, উঠে পড়ল শূন্যে, এরপর তৃতীয়বারের বার ঘষা খেতে খেতে খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল স্থির হয়ে।

গভীর নিস্তব্ধতা। চারদিকে মৃত্যুপুরীর নৈঃশব্দ। কোথাও কিছু নড়ছে না।

প্রথম সংবিৎ ফিরে পেল সার্জেন্ট জো। 'বাই গড···আমরা পেরেছি!' কাঁপা ঠোঁট জোড়ার ফাঁক থেকে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল।

উইণ্ডশীল্ডের দিকে বেকুবের মত তাকিয়ে আছে উড। রক্তশূন্য চেহারা। সাদা রঙ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। অচ্ছেদ্য একটা বরফের মোটা পর্দা উঠে এসে ঢেকে দিয়েছে গ্লাসের সবটুকু। ধীরে ধীরে পাইলটের দিকে ফিরল সে, কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারল না।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল স্ট্রাটোক্রুজার। মড়মড় করে কঠিন বরফ ভাঙার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। চারদিকের কঠিন নিষ্পেষণে বেঁকে যাচ্ছে প্লেনের শরীর। পরমুহূর্তে শোনা গেল কর্কশ ধাতব শব্দ, যেন মুচড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে ইস্পাত।

জানালার বাইরে সাদা রঙটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঝাঁকি খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে প্লেন। হিম-শীতল, নিরেট, ঘন কালো একটা অন্ধকার গ্রাস করছে ওটাকে। তারপর সব শেষ। চিহ্ন পর্যন্ত রইল না।

ওয়াশিংটন। ন্যাভাল হেডকোয়ার্টারে অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটনের অফিস কামরা।

একটা ম্যাপের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল। ম্যাপে দেখানো হয়েছে সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর ফ্লাইট রুট। যাত্রার শুরু থেকে গন্তব্যের শেষ মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাচ্ছেন তিনি। বার বার, অবিরাম। গত চার মাস তাঁর বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছেন তিনি। হঠাৎ বেজে উঠল ডেস্কের ফোনটা।

'অ্যাডমিরাল ডেনটন?' অপরপ্রান্ত থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'বলছি, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'সেক্রেটারি সেলজার আমাকে বলল, সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর সার্চ কি বন্ধ করে দিতে চান আপনি?'

'হ্যাঁ, স্যার,' শান্তভাবে বললেন অ্যাডমিরাল। 'দুঃস্বপ্নটাকে টেনে বড় করার কোন মানে খুঁজে পাচ্ছি না আমি। নেভী সারফেস ক্রাফট, এয়ারফোর্স সার্চ প্লেন এবং আর্মি গ্রাউণ্ড ইউনিট সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর নির্দিষ্ট কোর্সের দু'দিকের পঞ্চাশ

মাইল এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে।'

'আপনার কি ধারণা?'

'আমার বিশ্বাস স্ট্রাটোক্রুজারের অবশিষ্ট প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে।'

'আপনার ধারণা, পশ্চিম উপকূল ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিল ওটা?'

'হ্যাঁ।'

'প্রার্থনা করি আপনার ধারণাই যেন সত্যি হয়, অ্যাডমিরাল। কিন্তু মাটিতে কোথাও যদি পড়ে থাকে, খোদা যেন আমাদেরকে ক্ষমা করেন।'

'তা যদি পড়ত, এতদিনে আমরা জানতে পারতাম,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'হ্যাঁ—' প্রেসিডেন্ট ইতস্তত করছেন,—'অন্তত জানতে পারার কথা।' আবার থামলেন তিনি। 'সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর ফাইল বন্ধ করে দিন। পুঁতে ফেলুন ওটা, অনেক গভীর গর্ত করে তারপর মাটি চাপা দিন।'

'ব্যবস্থা করছি, মি. প্রেসিডেন্ট।'

ক্রাডলে রিসিভার রেখে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন অ্যাডমিরাল। অনেক বিজয়ের নায়ক তিনি, কিন্তু শেষ দিকের এই একটা বাজিতে হেরে গিয়ে তাঁর এতদিনের নেভী ক্যারিয়ার খতম করে বসে আছেন। আবার একবার ম্যাপটার দিকে তাকালেন। 'কোথায়?' জোর গলায় জানতে চাইলেন তিনি, প্রশ্নটা নিজেকেই করছেন, 'কোথায় তুমি? কোন্ চুলোয় গেছ? অ্যাঁ?'

উত্তরটা পাওয়া যায়নি। দুর্ভাগা স্ট্রাটোক্রুজারের কপালে কি ঘটেছে, বলতে পারেনি কেউ। নিখোঁজ প্লেনটা নিখোঁজই থেকে গেল। মেজর ভ্যান জনসন আর তার ক্রুরা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে, চিরতরে।

দুই

কলোরাডো। উনিশশো আশি সাল। নভেম্বর।

নিবিড় ঘুম থেকে জেগে মস্ত একটা হাই তুলল মাসুদ রানা। তাজা, ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। চোখ পিটপিট করে চারদিকে তাকাল। রাতের বেশির ভাগটা কাটিয়েছে এই পাহাড়ী কেবিনে, কিন্তু পরিবেশটা সম্পূর্ণ অপরিচিত রয়ে গেছে এখনও। রাত দশটার পর এখানে পৌঁচেছিল ওরা। পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন জ্বেলেছিল, আর ছিল কেরোসিন ল্যাম্পের লালচে আলো। পেঁচানো, গিঁটসর্বস্ব পাইন গাছের মোটা কাণ্ড দিয়ে তৈরি কেবিনের ভেতর দিকটা দেখতে পায়নি।

ছয় ফুট ডায়ামিটারের বিরাট দেয়াল ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়ল ওর, চোখ দুটো বড় হলো আরও একটু। চিনতে পারছে ঘড়িটাকে, গত রাতে কেবিনে ঢুকে এটাই প্রথম চোখে পড়েছিল। এরপর তাকাল মাকড়সার জাল ঘেরা প্রকাণ্ড হরিণের একটা মাথার দিকে, ধুলোয় ঢাকা কাঁচের চোখ দিয়ে সরাসরি তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

মাথাটার একটু নিচে, বাঁ দিকে, খোলা রয়েছে রঙিন কাঁচ লাগানো একটা জানালা। বাইরে দেখা যাচ্ছে সাওয়াচ মাউন্টেন রেঞ্জের পাথুরে দৃশ্যাবলী। কলোরাডো রকির গভীর অভ্যন্তরে।

ঘুমের শেষ আমেজটুকু চোখ থেকে মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে দিনের প্রথম সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হলো রানা। দিনটা আজ কিভাবে কাটাবে? মাছ ধরে? কলোরাডো রকির রুদ্ধশ্বাস সৌন্দর্য দেখে? নাকি ঘর ছেড়ে বেরুবে না, সারাদিন গান শুনবে?

দুটো দিন সাংঘাতিক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, আজ একটু বিশ্রাম নেয়া যেতে পারে। আপন মনে মুচকি একটু হাসল রানা—উঁহুঁ, তা সম্ভব নয়। খাঁচা থেকে সদ্য ছাড়া পাওয়া পাখির মত চঞ্চল হয়ে আছে লোরা, ছুটির প্রতিটি সেকেণ্ড হেসে-খেলে ছুটোছুটি করে কাটাতে চায়, ঘরে বসে থাকার কথা বললেই খেপে আগুন হয়ে যাবে।

কার্পেটের ওপর যোগ-ব্যায়াম করছে লোরা।

পদ্মাসনের ভঙ্গিতে পা দুটো ভাঁজ করে বসে আছে সে, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আছে পিঠটা, মাথা আর কনুই দুটো ঠেকে আছে কার্পেটে। আশ্চর্য নিখুঁত একটা শরীর, মনে মনে প্রশংসা করল রানা। সাওয়াচ পার্বত্য এলাকার গ্র্যানিট পাথরও লজ্জা পাবে।

চোখ বুজল রানা। আশ্চর্য মেয়ে! লোরার কথা ভাবছে ও। হঠাৎ পরিচয়, হঠাৎ ভাল লাগা, তারপর সমস্ত বাধা-বিঘ্ন টপকে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়া। আনিসের সাথে নাফাজ মোহাম্মদের মেয়ে শিরির বিয়ে, ছুটি কাটাতে ওয়াশিংটন এসে সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিল রানা, সেখানেই শিরি তার বান্ধবী লোরা স্মিথের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় ওর। কিছুক্ষণের জন্যে বিয়ের উৎসব থেকে পালিয়ে যায় ওরা। একটা বার-এ গিয়ে বসে। পরস্পরকে বুঝতে দেরি হয়নি কারও। দশ মিনিটেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে। শিরির মুখে নিশ্চয়ই রানার কথা অনেক শুনেছে লোরা, সেজন্যেই তাকে কোন প্রশ্ন করেনি সে। তবে নিজের কথা সব জানিয়েছে রানাকে। ধনী বাপের একমাত্র মেয়ে, মা নেই, কিন্তু তাই বলে লাই দিয়ে বাপ তাকে মাথায় তোলেনি। 'কড়া শাসনের স্টীম-রোলার চালানো হয় আমার ওপর।' বলেছিল লোরা। 'সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত অফিস করতে হয়, বাবা আমাকে ব্যবসা শেখাচ্ছে। গত এক বছরে একটা দিনের জন্যে ছুটি পাইনি। তোমাকে দেখে হিংসে হচ্ছে আমার।'

'কেন?'

'সেই কোন্ মুলুক থেকে দিব্যি ছুটি নিয়ে চলে এসেছ, যখন যেখানে খুশি যাচ্ছ, ঘুরে বেড়াচ্ছ মুক্ত বিহঙ্গের মত, কারও কিছু বলার নেই…।'

মেয়েটার জন্যে একটু দুঃখ হয়েছিল রানার। 'ছুটি পেলে কি করবে তুমি?'

'পাব না জানি,' লোরার মুখে ম্লান হাসি।

'যদি পাইয়ে দিই?'

'অসম্ভব! আমার বাবাকে তুমি চেনো না।'

'আহা, ধরোই না…'

'কলোরাডোর রকিতে আমার কাকার একটা কেবিন আছে, ওখানে বেড়াতে যাব তোমাকে নিয়ে।'

'তারপর?'

'পাহাড়ে চড়ব, বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটোছুটি করব, সাতার কাটব পাহাড়ী ঝর্ণায়, আর সারারাত জেগে কথা বলব তারাদের সাথে। থুড়ি, ভুল হয়ে গেল। রাতের অর্ধেকটা আলাদা করে রাখব তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে...?'

'কিন্তু লোভ করে লাভ নেই। আমার কপালে ছুটি নেই।'

হেসেছিল রানা। ছোট্ট একটা বুদ্ধি দিয়েছিল লোরাকে। আনন্দ আর বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল লোরার চেহারা। 'ডাক্তারকে পটিয়ে হাওয়া বদলের একটা প্রেসক্রিপশন? খুব যোগাড় করতে পারব! ইস্, আগে কেন মনে পড়েনি!'

পরদিন রানার হোটেলের সামনে একটা জীপ থামল। ছুটি পেয়ে তাঁবু ইত্যাদি সহ একেবারে তৈরি হয়ে চলে এসেছে লোরা।

লোরার কাকার কেবিনে পৌঁছুবার আগে পথে দুই রাত খোলা আকাশের নিচে ক্যাম্প ফেলেছে ওরা। কেউ উঁকি দিয়ে দেখতে আসেনি। এলে লজ্জা পেয়ে ছুটে পালাত। দুটো রাত যেন দুই পলকে ফুরিয়ে গেছে।

আবার লোরার দিকে তাকাল রানা। 'তোমার এই আসনের নাম কি?' জানতে চাইল ও।

'মাছ,' উত্তর দিল লোরা, কিন্তু নড়ল না। 'বুকের গঠন ভাল করার জন্যে।'

বিছানার ওপর উঠে বসল রানা, মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল।

কার্পেটের ওপর থেকে মাথা আর কনুই তুলে সিধে হয়ে বসল লোরা। 'আমি ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে যাচ্ছি,' বলল সে। উঠে দাঁড়াল। 'গ্যারেজে তুলতে গিয়ে দেখলাম, স্টার্ট নিচ্ছে না জীপ। কিছু একটা বিগড়েছে, একটু দেখবে নাকি?'

'নিশ্চয়ই,' বিছানা থেকে নামল রানা। বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

ত্রুটিটা কোথায় খুঁজে বের করতে ঘণ্টা খানেক লেগে গেল রানার, মেরামত করতে অবশ্য দশ মিনিটও লাগল না। দাড়ি কামিয়ে শাওয়ার সারল ও, পোশাক পরল। ইতিমধ্যে এগারোটার ওপর বেজে গেছে। লোরার হাঁকডাক শুনে কিচেনে ঢুকল ও। দু'ঘণ্টা ধরে রাজকীয় আয়োজন করেছে সে, তিন জনের নাস্তা একাই সাবাড় করে ফেলল রানা। কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগোল দরজার দিকে।

'কোথায় চললে?' পিছন থেকে জানতে চাইল লোরা।

'এখনও যাচ্ছি না,' বলল রানা। 'ভাবছি কোথায় পাওয়া যায়।'

এগিয়ে এসে দু'হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরল লোরা। 'তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। হাওয়া বদলের ছুটি মঞ্জুর করেছে বাবা, কিন্তু সেই সাথে কয়েকটা ফাইলও গছিয়ে দিয়েছে। কাল ডেনভারে বাজার করতে যাবার আগে কিছু চিঠিপত্র লেখার কাজ শেষ করে রাখতে হবে আমাকে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে পেরোলে মুক্তি পাচ্ছ—তুমি, একটু হেঁটে আসতে পারো। সন্ধ্যায় ভূরিভোজনের আয়োজন করব

তোমার জন্যে। তারপর রাতে পাহাড়ে উঠে চাঁদ দেখব আমরা। কেমন?'

'একা একা হেঁটে বেড়াতে যে ভাল লাগে না আমার?'

'তাহলে মাছ ধরতে যেতে পারো।'

'লেকটা কোন্ দিকে তা এখনও বলোনি।'

'কেবিনের পিছনে যে পাহাড়টা দেখতে পাবে সেটার মাথা থেকে সিকি মাইল দূরে। টেবল লেক। ওখান থেকেই ট্রাউট ধরতেন কাকা।'

'কিন্তু সাথে করে আমি ফিশিং গিয়ার আনিনি,' বলল রানা। 'তোমার কাকা কিছু রেখে গেছেন নাকি?'

'কেবিনের নিচে, গ্যারেজে। তাঁর সমস্ত যন্ত্রপাতি ওখানেই রাখতেন কাকা। ম্যান্টেলের ওপর দরজার চাবি পাবে।'

অনেকদিন ব্যবহার হয়নি, চাবি আর তালা দুটোতেই মরচে ধরে গেছে। ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে সাবধানে ঘোরাচ্ছে রানা, যাতে ভেঙে না যায়। মৃদু একটা শব্দ করে অবশেষে খুলল তালাটা। ধাক্কা দিতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল দরজাটা। ভ্যাপসা একটা গন্ধ এসে ধাক্কা খেল নাকে। চোখে অন্ধকার সয়ে আসার পর ভেতরে ঢুকল রানা। চারদিকে তাকাতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল ধুলোয় ঢাকা ওয়ার্ক-বেঞ্চ। টুলসগুলো জায়গা মত সুন্দরভাবে ঝুলছে। অনেকগুলো শেলফে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন সাইজের ক্যান। কোনটায় রঙ দেখা যাচ্ছে, কোনটায় রয়েছে পেরেক বা নানা ধরনের হার্ডঅয়্যারের সংগ্রহ।

একটু খুঁজতেই বেঞ্চের নিচে মাছ ধরার সরঞ্জাম ভর্তি একটা বাক্স পেয়ে গেল রানা। রডটা খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগল। আলো খুব কম, গ্যারেজের কোণে আবছাভাবে লম্বা মত দেখা যাচ্ছে কি একটা, বোধহয় একটা রডই। কিন্তু এগোতে গিয়ে বাধা পেল রানা। ক্যানভাস দিয়ে মোড়া বড়সড় কি একটা জিনিস পথ আগলে রেখেছে। লম্বা, সরু আকৃতিটাকে পরিষ্কার একটা রড বলে চেনা যাচ্ছে এখন। ক্যানভাস মোড়া ঢাউস জিনিসটার ওপর চড়ে হাত বাড়াল ও। কিন্তু হঠাৎ পায়ের নিচের জিনিসটা কাত হয়ে গেল একদিকে। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল রানার পিঠ, তাল সামলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, পড়ে যাচ্ছে ও। পড়ে যাবার সময় ক্যানভাসটা খামচে ধরল, সাথে সাথে ঢাউস আকারের জিনিসটা নগ্ন হয়ে পড়ল। 'ধুস শালা!' গালমন্দ করছে রানা, উঠে দাঁড়িয়েছে এরই মধ্যে, কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ছে। উন্মুক্ত জিনিসটার দিকে তাকাল ও। স্থির হয়ে গেল হাত দুটো। বিমূঢ় একটা ভাব ফুটে উঠল চেহারায়। ধীরে ধীরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ও। ক্যানভাসের আবরণ সরে যাওয়ায় একটা নয়, দুটো জিনিস দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে হাত বাড়াল রানা, স্পর্শ করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সোজা বেরিয়ে এল গ্যারেজ থেকে। চিৎকার করে ডাকল লোরাকে।

ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে রেইলিং ধরে ঝুঁকে পড়ল লোরা। 'কি হলো?'

'নিচে একবার এসো তো।'

গায়ে একটা ট্রেঞ্চ কোট চড়িয়ে নিচে নেমে এল লোরা। পথ দেখিয়ে গ্যারেজে নিয়ে এল তাকে রানা, হাত দিয়ে দেখিয়ে জানতে চাইল, 'এগুলো এখানে কোত্থেকে এল বলতে পারো?'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ভাল করে জিনিসগুলো দেখল লোরা। 'চিনতে পারছি না। কি এগুলো?'

'গোলমত হলুদ রঙের ওটা একটা প্লেনের অক্সিজেন ট্যাংক। আর ওটা একটা নোজ গিয়ার, টায়ার এবং হুইলসহ। অনেক দিনের পুরানো জিনিস, মরচে ধরে গেছে।'

'এই প্রথম দেখছি আমি।'

'এর আগে গ্যারেজে আসোনি?'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল লোরা। 'কাকা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার পর আর আসিনি। তা বছর তিনেক তো হলোই।'

'এদিকে কোন প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল বলে শুনেছ কখনও?'

'কই, না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি,' বলল লোরা। 'কাকা বেঁচে থাকার সময় যাও বা দু'একবার এসেছি, প্রতিবেশীদের সাথে বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি আমার। কোন প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট যদি ঘটেও থাকে তা আমার কানে আসার কথা নয়।'

'কোন্ দিকে?' জানতে চাইল রানা।

'মানে?'

'তোমাদের নিকটতম প্রতিবেশী?' প্রশ্ন করল রানা। 'কোথায় থাকে তারা?'

'শহরে যাবার পথে, রাস্তার ধারেই। এখান থেকে যেতে প্রথম বাঁ-দিকে যে বাঁকটা পড়বে, তার মুখেই।'

'নাম কি ওদের?'

'রেফারী। লী আর শীলা রেফারী। লী একজন রিটায়ার্ড নেভী ম্যান।' রানার একটা হাত ধরে চাপ দিল লোরা। 'ব্যাপার কি বলো তো? এত খবর দিয়ে কি দরকার তোমার?'

'আর কিছু না, স্রেফ কৌতূহল,' লোরার হাতটা তুলে তাতে চুমো খেল রানা। 'সন্ধ্যায় ভূরিভোজনের সময় দেখা হবে আবার।' ঘুরে দাঁড়াল ও, হন হন করে হাঁটতে শুরু করল রাস্তার দিকে।

'ওকি, কোথায় চললে?' পিছন থেকে বলল লোরা। 'মাছ ধরতে যাবে না?'

'না। হেঁটে আসার প্রস্তাবটা তোমারই ছিল, মনে আছে?' কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলল রানা।

লম্বা পাইন গাছের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে রানা, তার গমন পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোরা। রানা অদৃশ্য হয়ে যেতে হতাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে, তারপর ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচার জন্যে ছুটে গিয়ে ঢুকল কেবিনের ভেতর।

কাঠামোটা শীলা রেফারীর আশ্চর্য শক্তিশালী। চওড়া হাড়ের ওপর পরিমিত মাংস, চোখে স্টীল রীমের চশমা, পা গুটিয়ে বসে আছে একটা বেতের চেয়ারে। হাতে একটা থ্রিলার বই, চশমার রীমের ওপর দিয়ে নীল চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। পরনে নীল জীনস, ওপরের দুটো বোতাম খোলা আস্তিন গোটানো সাদা

শার্ট। তার স্বামী লী রেফারী দশাসই পুরুষ, কেবিনের সামনে ছোট একটা ট্রাকের পরিচর্যা করছে। সদর দরজার পাশে গাছের সাথে চেইন দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা কুকুর। দেখেই রানাকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে, আহ্লাদে লেজ নাড়ছে ঘনঘন।

রাস্তা থেকে নেমে মাঠটা পেরিয়ে আসছে রানা, দু'জনেই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'গুড আফটার নুন,' বলল ও।

দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে মাথা ঝাঁকাল লী। 'গুড আফটার নুন,' বলল সে। চট্ করে একবার তাকাল স্ত্রীর দিকে। 'আমরা একজন মেহমান পেয়েছি, শীলা।' চিকন মেয়েলি কণ্ঠস্বর।

'হাঁটার জন্যে দিনটা ভাল,' বলল শীলা। বই আর চশমার ওপর দিয়ে একদৃষ্টিতে এখনও সে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'বাতাসটাও তাজা,' হালকা সুরে বলল রানা।

স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের চেহারাতেই বন্ধুসুলভ একটা ভাব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেই সাথে অপরিচিত লোকের আগমনে একটু অপ্রতিভও বোধ করছে তারা। এই নির্জন শান্তির নীড়ে সাধারণত কেউ তাদেরকে বিরক্ত করতে আসে না, বিদেশী কোন লোক তো নয়ই। নোংরা একটা ন্যাকড়ায় হাতের ময়লা মুছে এগিয়ে এল লী। কাছ থেকে দেখে মনে হলো, স্ত্রীর তুলনায় তার বয়স একটু বেশিই। শীলার যদি পঁয়তাল্লিশ হয়, লীর হবে ষাট।

'আমাদের কোন সাহায্য আপনার দরকার?' জানতে চাইল লী।

'যদি আপনারা লী আর শীলা রেফারী হন।'

পা নামিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শীলা। 'হ্যাঁ, আমরাই।'

'মাসুদ রানা,' নিজের পরিচয় দিল ও। 'আপনাদের প্রতিবেশী লোরা স্মিথের অতিথি।'

অপ্রতিভ ভাবটা নিমেষে কেটে গিয়ে আন্তরিক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা দুটো।

'ওমা, তাই বলো! তুমি আমাদের সোনা মানিক লোরার বন্ধু!' খুশিতে চিক চিক করছে শীলার চোখ দুটো। 'কবে এসেছে সে?' স্বামীর দিকে তাকাল একবার। 'কতদিন দেখি না ওকে, তা বছর তিন-চার তো হবেই, কি বলো? এতদিন নিশ্চয়ই লোরা মানিক ধিঙ্গি হয়ে উঠেছে।' রানার দিকে ফিরল আবার।

'একটা ব্যাপারে একটু কৌতূহল হয়েছে, তাই ভাবলাম আপনারা যদি কিছু তথ্য দিতে পারেন,' বলল রানা।

'এই এলাকার সমস্ত খবর শীলার নখের ডগায়,' বলল লী। 'ও তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারবে।'

'গাছের মত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকো না ওখানে,' স্বামীকে ধমক লাগাল শীলা। 'গলা ভেজাবার জন্যে কিছু এনে দাও। দেখছ না, রোদ মাথায় করে হেঁটে এসে কেমন ক্লান্ত হয়ে গেছে বেচারা।'

'এক্ষুণি আসছি,' ব্যস্ত হয়ে উঠল লী। রানার দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'কি ভায়া, বিয়ার চলবে তো?'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা।

সদর দরজা খুলে রানার কব্জির পিছনটা খামচে ধরল শীলা, ওকে ঠেলে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে, বলল, 'আমাদের সাথে লাঞ্চ খাচ্ছ তুমি।' অনুরোধ নয়, আদেশের মত শোনাল কথাটা। অপ্রত্যাশিত স্নেহের এই আবদারটুকু কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না রানা।

লিভিং রুমটা অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে সাজানো। দেয়ালে সিল্কের পর্দা, ইলেকট্রিক ঝাড় বাতি ঝুলছে সিলিং থেকে, দেয়ালের ওপর দিকে তৈলচিত্র। ফার্নিচারগুলো যত না আধুনিক তার চেয়ে বেশি আরামদায়ক। কিচেন থেকে দুটো ঠাণ্ডা বিয়ার নিয়ে এল লী। ওদিকে টেবিল সাজাতে শুরু করেছে শীলা। প্লেট উপচানো পটেটো স্যালাড, বেক করা বীন আর ভুনা গরুর মাংস। খালি বিয়ারের বোতলগুলো আবার ভর্তি করে আনল লী।

'আপনারা অনেকদিন থেকে বসবাস করছেন এখানে?' মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'সাওয়াচে আমরা ছুটি কাটাতে আসতাম,' বলল লী। 'নেভী থেকে রিটায়ার করার পর স্থায়ী আস্তানা গেড়েছি এখানে। ডিপ-ওয়াটার ডাইভার ছিলাম আমি। বেণ্ড-এর একটা সিরিয়াস কেসে আক্রান্ত হয়ে মেয়াদ শেষ হবার আগেই অবসর নিয়েছি। সেটা বোধ হয় সত্তর সালের কথা।'

'একাত্তর,' স্বামীর ভুলটা সংশোধন করে দিল শীলা।

রানার দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপল লী। 'রক্ত-মাংসের কমপিউটর বলতে পারো শীলাকে।'

'বিধ্বস্ত কোন প্লেনের কথা বলতে পারেন?' জানতে চাইল রানা। 'দশ মাইল চৌহদ্দির মধ্যে?'

চোখ পিটপিট করে স্মরণ করার চেষ্টা করল লী। 'কই, মনে পড়ছে না।' স্ত্রীর দিকে তাকাল সে। 'হ্যালো, কমপিউটর?'

'তোমার ব্যাপারটা যে কি, আমার ছাই মাথায় ঢোকে না,' নিরাশ ভঙ্গিতে বলল শীলা। 'সব কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাও কিভাবে? ডায়মণ্ডের পিছনে বেচারা ডাক্তার আর তার বউ নিজেদের প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেল, মনে নেই? আরেকটু স্যালাড দিই, রানা?'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কাছাকাছি কোন শহর নাকি ডায়মণ্ড?'

'এককালে ছিল। এখন ওটাকে স্রেফ কয়েকটা রাস্তার মোড় বলা চলে। একটা টর্নেডো এসে সব উড়িয়ে নিয়ে যাবার পর শহরটাকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।'

'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে,' কাঁটা চামচের ডগা থেকে মাংসের টুকরো মুখের ভেতর নিয়ে চিবাচ্ছে লী। 'একটা সিঙ্গেল এঞ্জিন প্লেন ছিল ওটা। পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছিল। ওদের সাথে ছেলেমেয়েরাও ছিল, একজনও বাঁচেনি। লাশ সনাক্ত করতে এক হপ্তার ওপর সময় লেগেছিল।'

'এপ্রিল চুয়াত্তরের মর্মান্তিক ঘটনা,' বলল শীলা।

'আরও বড় প্লেন সম্পর্কে জানতে চাইছি আমি,' শান্তভাবে ব্যাখ্যা করল রানা। 'একটা এয়ারলাইনার। বিধ্বস্ত হয়েছে সম্ভবত ত্রিশ কি চল্লিশ বছর আগে।'

বড়সড় লালচে মুখটা ঘুরিয়ে সিলিংয়ের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাল শীলা।

কয়েক সেকেণ্ড কেটে যাবার পর এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে। 'উহুঁ, কারও মুখে শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না। গত একশো বছরে যা কিছু ঘটেছে এই এলাকায়, সব আমার জানা আছে। একটা এয়ারলাইনার বিধ্বস্ত হওয়ার মত রোমাঞ্চকর ঘটনা আমার কান এড়িয়ে যাবে, তা সম্ভব নয়। অন্তত এই এলাকায় বড় কোন প্লেন পড়েনি আকাশ থেকে।'

'কিন্তু তুমি জানতে চাইছ কেন বলো তো?'

উত্তরটা দেবার আগে এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল রানা। পুরানো একটা প্লেনের নোজ গিয়ার আর অক্সিজেন ট্যাংক দেখে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সেই কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে রোদ মাথায় করে কয়েক মাইল হেঁটে এসে একটা পরিবারকে বিরক্ত করা বাড়াবাড়ি বৈকি। রানা নিজেও জানে না, এই সামান্য ব্যাপারটা এত কেন অস্থির করে তুলেছে তাকে। শুধু কেন যেন মনে হচ্ছে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কি যেন আছে। কিসের সাথে যেন একটা যোগ আছে এই আবিষ্কারের, কিন্তু সেটা যে কি, মনের গভীরে ডুব দিয়েও কোন হদিস বের করতে পারছে না সে। 'লোরাদের গ্যারেজে পুরানো একটা প্লেনের কিছু পার্টস দেখলাম। নিশ্চয়ই ওর কাকা ওগুলো রেখেছিলেন ওখানে। আমার মনে হলো, আশপাশের কোন পাহাড় থেকে পেয়েছিলেন হয়তো, নিয়ে এসে গ্যারেজে রেখেছিলেন।'

'বেচারা চার্লি স্মিথ,' ম্লান গলায় বলল শীলা 'খোদা তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন। অদ্ভুত এক খ্যাপাটে মানুষ ছিলেন তিনি। কারও সাতে-পাঁচে থাকতেন না, কিন্তু সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলত। লোহা-লক্কড় ছিল তাঁর একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র সাধনা।'

'মানে?' প্রশ্ন করল রানা।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রী কেউই ওর প্রশ্নের উত্তর দিল না।

'তার মানে প্লেনের পার্টসগুলো ডেনভারের কোন সারপ্লাস স্টোর থেকে কিনে নিয়ে এসেছিল চার্লি,' বলল লী। 'নিশ্চয়ই তাই। বিদঘুটে আরও একটা কিছু আবিষ্কারের ইচ্ছে ছিল, সন্দেহ নেই।'

'আহা বেচারা!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শীলা রেফারী। 'দুনিয়ার কোন ব্যাপারে কোন খেয়াল ছিল না তার। নিজের দিকেও নজর দিত না। আধ-পাগলা ভাইকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখার জন্যে লোরার বাবা কম চেষ্টা করেছে নাকি? কিন্তু চার্লি নিজের সাধনা ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হয়নি।'

'সাধনা?'

'রাজ্যের লোহা-লক্কড় যোগাড় করে কি সব আবিষ্কার করার চেষ্টা করত সে,' রানার দিকে ফিরে বলল লী। 'কিন্তু তার কোন আবিষ্কারই কাজে লাগত না। কিন্তু তাই বলে দমবার পাত্র ছিল না সে।' ফিক করে হেসে ফেলল। 'বেচারা চার্লি একবার একটা অটোমেটিক ফিশিং-পোল কাস্টার তৈরি করল। পানি ছাড়া আর সবদিকে টোপ ছুঁড়ত সেটা।'

'আপনারা তাকে বেচারা বলছেন কেন?'

স্বামী-স্ত্রীর চেহারায় বিষাদের ছায়া ...ল।

'চার্লি কিভাবে মারা গেছে শোনোনি তুমি? তোমাকে বলেনি লোরা?' মৃদু

গলায় জানতে চাইল শীলা।
'শুধু বলেছে তিন বছর আগে মারা গেছে ওর কাকা।'
বিয়ারের খালি বোতলটা রানাকে দেখাল লী। 'আরও একটা দেব নাকি?'
'না, ধন্যবাদ,' বলল রানা।
'ঘটনাটা মর্মান্তিক। বিস্ফোরিত হয়ে মারা যায় চার্লি।'
'বিস্ফোরিত হয়ে মারা যায়?'
'আমার ধারণা, ডিনামাইট,' বলল লী। 'কিন্তু আসলে কি ঘটেছে তা কেউ জানে না। জানবে কিভাবে, কিছু পাওয়া গেলে তবে তো। শুধু একটা বুড়ো আঙুল আর একটা বুট জুতো ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি।'
'শেরিফের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, বিস্ফোরণটা চার্লির আরেকটা ব্যর্থ আবিষ্কারের পরিণতি।' কথাটা তর্কের সুরে বলল শীলা।
'ঘোড়ার ডিম!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লী। 'শেরিফের রিপোর্টের এক পয়সা দাম দিই না আমি।'
'আবার তর্ক করছ তুমি?' চোখ রাঙাল শীলা।
স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া শুরু হতে যাচ্ছে দেখে অস্বস্তি বোধ করছে রানা। তাচ্ছিল্যের সাথে স্ত্রীর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রানার দিকে তাকাল লী। 'যে যাই বলুক, কারও কথায় কান দিয়ো না তুমি। আমার ধারণাই সত্য বলে মনে করবে। বিস্ফোরক সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ছিল চার্লি। আর্মির একজন ডিমোলিসন এক্সপার্ট হিসেবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সারা দুনিয়ায় বোমা আর আর্টিলারি শেল ডিফিউজ করে বেড়িয়েছে সে। এই রকম একজন লোক বিস্ফোরক নাড়াচাড়া করার সময় ভুল করতে পারে না।'
'লীর কথায় কান দিয়ো না তুমি,' বলল শীলা। 'ওর ধারণা চার্লি খুন হয়েছে। যত্তোসব! কার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, অমন মাটির মত একজন মানুষকে খুন করে খামোকা পাপের ভাগীদার হতে যাবে? তাকে খুন করে কার কি লাভ? কেউ বলবে, তার কোন শত্রু ছিল? বেচারা মারা গেছে স্রেফ দুর্ঘটনায়।'
'প্রমাণ করতে পারব না,' বলল লী। 'কিন্তু আমার ধারণা ঠিক তার উল্টো।'
'আর দুটো ফল দিই,' জানতে চাইল শীলা।
'না, ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'পেটে আর এক তিল জায়গা নেই।'
'তোমাকে, লী?'
'আমার আর খিদে নেই,' বলল লী।
'কিছু মনে করবেন না,' বলল রানা। 'সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে আমি বোধ হয় একটু বেশি মাথা ঘামিয়ে ফেলেছি। গভীর পাহাড়ী এলাকার মাঝখানে প্লেনের পার্টস···আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কোন বিধ্বস্ত এয়ার-লাইনের অংশ হবে ওগুলো।'
এতে মনে করার কি আছে?' হাসছে লী রেফারী। 'ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে অনেকেই আমরা ছেলেমানুষির চূড়ান্ত করে থাকি।'
উষ্ণ আন্তরিকতার সাথে রানাকে বিদায় দিল রেফারী পরিবার। ওদের আতিথেয়তা অনেক দিন মনে থাকবে রানার। বিদায় নেবার আগে কুকুরটার মাথায়

হাত বুলিয়ে একটু আদর করল ও। কিন্তু মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা কমা তো দূরের কথা, কেন যেন আরও বেড়ে গেল ওর।

গভীর রাত। চারদিকে নির্জন পাহাড়ী নিস্তব্ধতা। কেবিনের ভেতরেও কোন শব্দ নেই। একটা হাত বা পা ছুঁড়ে রানাকে ধাক্কাও দেয়নি লোরা। তবু ঘুম ভেঙে গেল ওর। সাথে সাথে মনে হলো যেন অনেকক্ষণ থেকে জেগে আছে ও, সমস্ত ইন্দ্রিয় সতর্ক সজাগ। মনের ভেতর আশ্চর্য একটা অশান্তি; অদ্ভুত একটা অস্থিরতা। এর জন্যে দায়ী সেই খুঁতখুঁতে ভাবটা। এটাই ঘুমের মধ্যে জাগিয়ে রেখেছিল তাকে।

খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। দূর আকাশে মেঘের ফাঁকে পিটপিট করছে তারা, নিচে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের আবছা কাঠামো। মাথার ভেতর কতরকম ধারণা আসছে আর যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তব ধাঁধার উত্তরটা কোন মতে মেলাতে পারছে না ও।

ওর বুকে মুখ গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে লোরা, গভীর ঘুমে অচেতন। সন্তর্পণে একটা হাত বাড়িয়ে বিছানার পাশের টেবিল থেকে সিগারেট প্যাকেট আর লাইটার তুলে নিল ও।

পুব আকাশের গায়ে ক্ষীণ আলোর পোঁচ। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। তিন ঘণ্টা হলো ঘুম ভেঙেছে ওর। খোলা প্যাকেটে আর একটাও সিগারেট নেই। ঘুমের মধ্যে একটা হাত তুলে দিয়েছে তার গায়ে লোরা। সন্তর্পণে সেটাকে নামিয়ে দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও। হাফ-প্যান্ট পরে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোরার জীপ। সেটার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করল ও, তারপর সোজা গিয়ে ঢুকল গ্যারেজে।

ক্যানভাস সরিয়ে অক্সিজেন ট্যাংকটা পরীক্ষা করতে শুরু করল রানা। আকৃতিটা সিলিণ্ডারের মত, এক গজের কিছু বেশি হবে লম্বায়, আঠারো ইঞ্চি ডায়ামিটার। গায়ে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ, অনেক জায়গায় ছালও উঠে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করল ট্যাংকের ফিটিংসগুলো। কয়েক মিনিট পরীক্ষা করার পর নোজ গিয়ারটার দিকে মনোযোগ দিল ও।

হুইল দুটো একটা অ্যাক্সেলের সাথে আটকানো, অ্যাক্সেলের দুটো প্রান্ত হুইল দুটোর মাঝখানে গিয়ে ঢুকেছে, ফলে সবটা মিলিয়ে ইংরেজী টি অক্ষরের মাথার মত দাঁড়িয়েছে আকৃতিটা। টায়ারগুলোর তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। তিন ফুটের কাছাকাছি উঁচু ওগুলো। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, দুটোতেই এখনও বাতাস রয়েছে।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে প্রতিবাদ জানাল গ্যারেজের দরজা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। অন্ধকার গ্যারেজে লোরা ঢুকছে। তার ওপর টর্চের আলো ফেলল রানা। শুধু নীল একটা নাইটি পরে আছে লোরা। চুলগুলো এলোমেলো। চেহারায় ভীতি আর অনিশ্চয়তার ছাপ।

'রানা তুমি?'

'না,' অন্ধকারে হাসছে ও। 'ভূত।'

ফোঁস করে স্বস্তির একটা হাঁফ ছাড়ল লোরা, এগিয়ে এল সামনের দিকে। 'কি করছ তুমি এখানে?'

'অশান্তি বাড়াচ্ছি,' বলল রানা। 'মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা দূর করার জন্যে এসেছিলাম, তা আরও বেড়ে গেল। এখন বুঝতে পারছি, গোটা ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে।'

বোকার মত কয়েক সেকেণ্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল লোরা। ঠাণ্ডায় কাঁপছে সে। 'ফালতু একটা জিনিস নিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ, রানা। রেফারীরা যা বলেছে সেটাই ঠিক। কোন স্যালভেজ ইয়ার্ড থেকে এগুলো যোগাড় করে এনেছিল কাকা।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'কিন্তু কাকা যে পুরানো লোহা-লক্কড় কিনে আনতেন সে-কথা তো আর মিথ্যে নয়,' বলল লোরা। 'তোমার চারদিকে তাকিয়ে দেখো না। এটা সেটা দিয়ে কত কিছুই না তৈরি করেছেন তিনি, কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ নয়।'

'অসম্পূর্ণ, ঠিক বলেছ,' বলল রানা। 'কিন্তু প্রতিটি লোহা-লক্কড় দিয়ে কিছু না কিছু একটা তৈরি করেছেন তিনি। শুধু অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ারে হাত দেননি। কেন?'

'কেন আবার! ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পাননি তিনি, তাই।'

'হয়তো।'

'চুকে গেল সব,' বলল লোরা। 'এবার কেবিনে চলো। ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাচ্ছি আমি।'

'দুঃখিত, আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

'আর কি দেখার আছে?'

'এদিকে দেখো,' বলল রানা। অক্সিজেন ট্যাংকের ওপর টর্চের আলো ফেলল ও। 'ফিটিংগুলো দেখছ?'

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল লোরা। 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। ভাঙা। আর কি আশা করো তুমি?'

'কোন স্যালভেজ ইয়ার্ডের বাতিল একটা এয়ারক্রাফট থেকে এগুলো খোলা হয়ে থাকলে মাউন্টিং ব্র্যাকেট আর লাইনের সাথে ফিটিংগুলো রেঞ্চ, টর্চ অথবা হেভী শিয়ার্সের সাহায্যে খোলা হত। কিন্তু তা হয়নি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, প্রচণ্ড শক্তির টানে পড়ে আলাদা হয়েছে এগুলো। নোজ গিয়ারটারও একই অবস্থা। স্ট্রাট বাঁকা হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছে হাইড্রলিক শক অ্যাবজরবার-এর ঠিক নিচে। অদ্ভুত ব্যাপার, ভাঙনগুলো একই সময়ে ঘটেনি। ভাঙা কিনারাগুলো দেখো, অনেকটা মসৃণ হয়ে এসেছে, মরচে ধরে গেছে—কিন্তু ওপরের খানিকটা অংশ এখনও কর্কশ, ঠিক মত মরচে ধরতে পারেনি।'

'এত সব বুঝি না ছাই,' বলল লোরা। 'কি প্রমাণ হচ্ছে তাই বলো।'

'দুনিয়া-কাঁপানো কিছু নয়,' হাসল রানা। 'কিন্তু এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে এগুলো কোন স্যালভেজ ইয়ার্ড বা সারপ্লাস স্টোর থেকে আসেনি।'

'যাক, শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতলে। এবার খুশি?'
'ঠিক তার উল্টো,' বলল রানা। অক্সিজেন ট্যাংকটা দু'হাত দিয়ে ধরে তুলে ফেলল ও, বয়ে নিয়ে এল বাইরে। জীপের ওপর রাখল সেটা। 'নোজ গিয়ারটা বয়ে নিয়ে আসা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়, তোমার সাহায্য লাগবে।'
'মানে? কি করতে চাও তুমি?'
'শপিঙ করার জন্যে ডেনভারে যাবে বলেছিলে তুমি, মনে আছে?'
'তাতে কি?'
'তুমি যখন শহরটা কিনতে ব্যস্ত থাকবে, আমি তখন স্টাপলটন এয়ারপোর্টের কাউকে ধরে জানার চেষ্টা করব কোন্ এয়ারক্রাফটের অংশ এগুলো।'
'খামোকা কেন বেগার খাটতে যাচ্ছ?'
মুচকি হাসল রানা। 'কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো? বড় একঘেয়ে লাগছে, লোরা। তোমার তবু তো চিঠিপত্র লেখার কাজ আছে, সারা দিন আমি কি করি বলো তো?'
বিমূঢ় দৃষ্টিতে রানার কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছে লোরা। গ্যারেজ থেকে দুটো চওড়া কাঠের তক্তা বের করে আনছে সে। জীপের টেইলগেটের ওপর তক্তা দুটোর দুই প্রান্ত রাখল, বাকি প্রান্ত দুটো মাটিতে ঠেকে আছে। নোজ গিয়ারটা টেনে তুলতে সুবিধে হবে এখন।
'রেডি?'
'কিন্তু তোমাকে সাহায্য করতে গেলে আমার নাইটি নোংরা হয়ে...'
'খুলে ফেলো,' সহজ সমাধান জানিয়ে দিল রানা।
মন্ত্রমুগ্ধের মত একটা পেরেকের সাথে পোশাকটা লটকে রাখল লোরা। দু'জন ধরাধরি করে বের করে আনল নোজ গিয়ারটা। রানা হাফ-প্যান্ট পরে রয়েছে। লোরা স্মিথ সম্পূর্ণ নগ্না। একটুতেই হাঁপিয়ে উঠল লোরা। কিন্তু রানা হাসছে। জীপের পিছনে সহজেই তোলা গেল নোজ গিয়ারটা।
টেইলগেট বন্ধ করছে রানা। ভোরের আলোয় দাঁড়িয়ে নিজের গায়ের ধুলো ঝাড়ছে লোরা, আর ভাবছে, বড় আশ্চর্য এই পুরুষগুলো, মাথার ভেতর কি চলছে বোঝার কোন উপায় নেই।

স্টাপলটন এয়ারপোর্ট। ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিসট্রেশন-এর এয়ার ক্যারিয়ার ডিস্ট্রিক্ট অফিস। প্রিন্সিপাল মেইন্টেন্যান্স ইন্সপেক্টর কেন্ট রুথ জীপ থেকে নামাবার আগেই অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ারটা একনজর দেখে নিয়েছে। রানাকে নিয়ে হ্যাঙ্গারের ভেতর ঢুকল সে। 'পাহাড়ে পেয়েছেন ওগুলো, বলছেন?'
'লিডভিল-এর ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, সাওয়াচ রেঞ্জে,' বলল রানা। প্রায় চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে ওদেরকে। এফ-এ-এ-র হ্যাঙ্গারের প্রকাণ্ড দরজা দিয়ে অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ারটা নিয়ে সগর্জনে ভেতরে ঢুকছে একটা ফর্কলিফ্ট।
'হুঁ,' বলল কেন্ট রুথ। 'দেখে তেমন কিছু জানা গেল না।' একটা সিগারেট ধরিয়ে শুরু করল ইন্সপেক্টর, 'অক্সিজেন ট্যাংকটা সম্পর্কে এখুনি কিছু বলার নেই

আমার। দ্বিতীয়টা সম্পর্কে বলতে পারি, ওটা একটা প্লেনের সামনের দিকের ল্যাণ্ডিং গিয়ার, যে প্লেনটার ওজন হবে সত্তর কি আশি হাজার পাউণ্ড। হাই স্পীডে জেট ল্যাণ্ডিংয়ের চাপ সহ্য করার মত ক্ষমতা টায়ারগুলোর নেই, তারমানে প্লেনটা জেট নয়, ওটার প্রপেলার ছিল। তাছাড়া, স্ট্রাট-এর ডিজাইন এমন একটা টাইপের, যা উনিশশো পঞ্চান্ন সালের পর থেকে আর তৈরি করা হচ্ছে না। টায়ারগুলো গুড ইয়ার কোম্পানীর, আর হুইলগুলো শিকাগোর রানটোল এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর। কিন্তু প্লেনটা কাদের তৈরি বা কে ওটার মালিক ছিল, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বুঝব, এমন কোন সূত্র চোখে পড়েনি আমার।'

'তারমানে এখানেই এর সমাপ্তি?'

'সবুর, এখুনি নিরাশ হয়ে পড়লে চলবে কেন?' হাসল কেন্ট রুথ। কষে একটা টান দিল সিগারেটে। 'পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে এমন একটা সিরিয়াল নাম্বার রয়েছে স্ট্রাটে। এই বিশেষ ধরনের নোজ গিয়ারের ডিজাইন কোন্ ধরনের প্লেনের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল জানতে পারলেই ম্যানুফ্যাকচারারের সূত্র ধরে স্ট্রাটের সিরিয়াল নাম্বার মিলিয়ে বের করা যাবে কোন্ প্লেনের অংশ এগুলো।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কাজটা খুব সহজ?'

'এগুলো ছাড়া আর কোন পার্টস নেই?'

'নেই।'

'কি মনে করে এগুলো এখানে নিয়ে এসেছেন আপনি?' জানতে চাইল কেন্ট রুথ।

'আমার জানামতে, কেউ যদি এগুলোর পরিচয় উদ্ধার করতে পারে তো ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনই পারবে।'

'সমস্যায় ফেলে দিয়ে মজা দেখতে চান, তাই না?' হাসছে রুথ।

'না,' হাসছে না রানা। 'সমাধান নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যেতে চাই।'

'কিন্তু সূত্রের সংখ্যা বড় কম,' বলল রুথ। 'তবু দেখা যাক। ভাগ্য কখন যে প্রসন্ন হয়, কেউ তা বলতে পারে না।'

কংক্রিটের মেঝেতে লাল রঙের একটা বৃত্ত আঁকা রয়েছে, বুড়ো আঙুল বাঁকা করে জায়গাটা দেখাল রুথ। ফর্কলিফটের অপারেটর সায় দিল মাথা নেড়ে, তারপর তিন দিক রেইলিং ঘেরা ট্রেটা নামাল সেখানে। নব্বই ডিগ্রী বাঁক নিয়ে হ্যাঙ্গারের আরেক কোণে চলে গেল ফর্কলিফট।

অক্সিজেন ট্যাংকটা তুলে নিল রুথ। গভীর মনোযোগের সাথে নেড়েচেড়ে দেখছে। একটু পরই সেটাকে নামিয়ে রাখল। 'এটা কোন সূত্রই নয়,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল সে। 'এ-ধরনের ট্যাংক এখনও তৈরি করছে বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান, অন্তত বিশটা বিভিন্ন টাইপের এরোপ্লেনে ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলো।'

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে। নোজ গিয়ারটার প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। এক পর্যায়ে সেটাকে ঘুরিয়ে বসাবার জন্যে রানার সাহায্য নিল সে। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, একটা কথাও বলছে না।

রানাই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

'অনেক কিছু,' সিধে হয়ে দাঁড়াল রুথ। 'কিন্তু আসল প্রশ্নের উত্তর তাতে

পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাহলে উপায়?'

'এই ধরনের পরিস্থিতিতে এঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের টেকনিশিয়ানদেরকে ডেকে পাঠাই আমি,' বলল রুথ। 'কিন্তু এখন তা না করে একটা শর্টকাট রাস্তা ধরতে চাই। ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের মেইন্টেন্যান্স চীফ হার্ভে ডোলানের সাহায্য নেব আমি। এয়ারক্রাফটের ব্যাপারে সচল একটা এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে তাকে।'

'কে তুলেছে ফটোগুলো?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল হার্ভে ডোলান। একটা ফিলটার সিগারেট ঝুলছে তার ঠোঁটে। নোজ গিয়ারের পোলারয়েড ছবিগুলো পরীক্ষা করছে সে।

'আমি,' বলল রুথ।

'জঘন্য, জঘন্য! তুমি কোন ফটোগ্রাফারই নও,' একরাশ বিরক্তির সাথে বলল ডোলান। 'লাইটিং সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই।'

'তোমার কাছ থেকে ফটোর সমালোচনা চাইনি আমি,' বলল রুথ, তার গলাতেও তীব্র ব্যঙ্গ ফুটে উঠল। 'গিয়ারটা কোন্ এয়ারক্রাফট থেকে এসেছে বলতে পারো কিনা দেখো।'

'একটু যেন চেনা চেনা লাগছে,' বলল ডোলান। 'বি-টোয়েনটি-নাইনের একটা অংশ হওয়া বিচিত্র নয়।'

'ওতে কাজ হবে না। পরিষ্কার জানতে চাই আমরা,' বলল রুথ। 'তা নাহলে স্বীকার করো, তোমার দ্বারা হবে না।'

'ঝাপসা কয়েকটা ফটো নিয়ে এসে এর বেশি কিছু জানতে চাওয়ার অধিকার নেই তোমার।'

দু'জনে মারামারি লেগে যাবে নাকি? রানার চোখে ক্ষীণ উদ্বেগ। সেটা লক্ষ করে হেসে ফেলল রুথ। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মি. রানা। আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি আছে, কাজের সময় পরস্পরের সাথে আমরা ভদ্র আচরণ করব না। কিন্তু পাঁচটা বাজার সাথে সাথে একজন আরেকজনের কাঁধে হাত রেখে বিয়ার খেতে যাই আমরা।'

'সেই বিয়ারের দাম যদিও বরাবর আমিই দিয়ে আসছি,' বলল ডোলান।

'নোজ গিয়ার সম্পর্কে…' শুরু করল রানা।

'ও হ্যাঁ,' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল ডোলান। 'দেখা যাক, কতদূর সাহায্য করতে পারি আমি।' রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে গেল একটা বুক শেলফের দিকে। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা সেটা, মোটা মোটা বইতে ঠাসা। 'এগুলো সব পুরানো মেইন্টেন্যান্স ম্যানুয়াল,' সকৌতুকে বলল সে। 'কমার্শিয়াল এভিয়েশনে আমিই বোধহয় একমাত্র পাগল যে এগুলো সংগ্রহ করে রেখেছি।' সের পাঁচেক ওজনের একটা ম্যানুয়াল নামাল সে। এক হাতের ওপর সেটাকে রেখে দ্রুত পাতা উল্টে যাচ্ছে। মিনিট খানেকের মধ্যে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল। খোলা বইটা ধপাস করে ফেলল ডেস্কের ওপর। বইয়ের

পাতার এক জায়গায় একটা আঙুল রেখে বলল, 'চিনতে পারছেন?'

ছবিটা একটা নোজ গিয়ারের লাইন ড্রয়িং।

'হুইল কাস্টিং, পার্টস, এবং ডাইমেনশন'—বইয়ের পৃষ্ঠার ওপর আঙুল দিয়ে টোকা মারছে রুথ—'ওগুলো এক এবং সমান।'

'কোন্ প্লেনের?' জানতে চাইল রানা।

'বোয়িং স্ট্রাটোক্রুজার,' বলল ডোলান। 'বি-টোয়েনটি-নাইন অনুমানটা খুব একটা ভুল হয়নি আমার। বম্বার ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করেই স্ট্রাটোক্রুজারের ডিজাইন তৈরি করা হয়েছিল। এয়ারফোর্স এগুলোকে সি-নাইনটি-সেভেন নামে ব্যবহার করত।'

উড়ন্ত একটা স্ট্রাটোক্রুজারের ছবি দেখাল ওদেরকে ডোলান। অদ্ভুতদর্শন একটা প্লেন, জোড়া পেটওয়ালা তিমির মত দেখাচ্ছে ফিউজিলাজ।

'ছোটবেলায় উড়তে দেখেছি,' বলল রুথ। 'প্যান অ্যাম ব্যবহার করত এগুলো।'

'ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সও ব্যবহার করত,' বলল ডোলান।

'এবার?' মুখ তুলে ডোলানের দিকে তাকাল রানা।

'সীটল-এ বোয়িং-এর কাছে পাঠিয়ে দিই নোজ গিয়ারটার সিরিয়াল নাম্বার, অনুরোধ করব সিরিয়াল নাম্বার ধরে বের করে দিক প্লেনটার পরিচয়। ওয়াশিংটনে ন্যাশন্যাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ডকেও ফোন করব আমি। দেশের কোথাও কোন কমার্শিয়াল স্ট্রাটোক্রুজার নিখোঁজ হয়ে থাকলে ওদের কাছে তার রেকর্ড থাকার কথা।'

'যদি খবর আসে, হ্যাঁ, একটা প্লেন নিখোঁজ হয়েছিল?'

'রহস্য উদঘাটনের জন্যে এফ-এ-এ অফিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনের ব্যবস্থা করবে,' বলল ডোলান। 'তারপর দেখা যাবে কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।'

তিন

পরবর্তী দুটো দিন একটা চার্টার করা হেলিকপ্টারে কাটাল রানা। পাহাড়ের মাথার ওপর সারাটা দিন চক্কর দিয়ে বেড়াল 'কপ্টারটা, প্রতিবার আকারে বড় হচ্ছে বৃত্তটা। প্রথম দিনই দুর্ঘটনার দুটো জায়গা দেখতে পেল পাইলট আর ও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানা গেল দুটোই আবিষ্কৃত এবং চিহ্নিত ধ্বংসাবশেষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকায় অসাড় হয়ে গেছে রানার নিতম্ব, 'কপ্টারের কাঁপুনিতে সারা শরীর থেঁতলে গেছে। লোরার কেবিনটা দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল মনটা।

কেবিনের সামনে সবুজ ঘাসের ওপর নামল 'কপ্টার। খানিক পর সেফটি বেল্ট খুলে নেমে পড়ল রানা।

'কাল আবার ওই একই সময়, স্যার?' জানতে চাইল পাইলট।

মাথা দোলাল রানা। 'কাল আমরা দক্ষিণ দিকে যাব, উপত্যকার নিচের দিকটা

দেখতে হবে।'

কেবিনের দিকে হাঁটছে রানা, বাতাসে চুল উড়িয়ে ছুটে আসছে লোরা। 'কপ্টার নিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে পাইলট। রানার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোরা। জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ ঘষছে। দু'হাত দিয়ে ধরে তাকে একটু সরিয়ে দিল রানা। বিকেলের পড়ন্ত রোদ লেগে বেগুনি চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। এইমাত্র স্নান করেছে লোরা, শরীরটা ঠাণ্ডা বরফ। 'আবার গোসল করতে চাও নাকি?' বলল রানা। 'দেখছ না ঘামে ভিজে নোংরা হয়ে আছি?'

লোরাকে এক হাতে জড়িয়ে নিয়ে হাঁটছে রানা। 'সারাদিন খুব একা বোধ করেছ, তাই না?'

হঠাৎ নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোরা। 'ভুলেই গেছি! তাড়াতাড়ি করো, এখনও হয়তো ধরতে পারবে তাকে।'

'ধরতে পারব? কাকে?'

'কেন্ট রুথকে। খবর পাঠিয়েছে সে।'

'কিভাবে? তোমাদের তো টেলিফোন নেই।'

'একজন ফরেস্ট রেঞ্জার খবর দিয়ে গেছে। কেন্ট রুথের অফিসে ফোন করতে হবে তোমাকে। খুবই নাকি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

'কিন্তু ফোন পাব কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'কোথায় আবার, রেফারীদের ওখানে।'

লী বাড়িতে নেই, শহরে গেছে। কিন্তু শীলা ওকে আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানাল, হাত ধরে নিয়ে এল টেলিফোনের কাছে। ডায়াল করার আগে একটা সিগারেট ধরাল রানা, ইতিমধ্যে কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে শীলা।

অত্যন্ত দক্ষ অপারেটর, দশ সেকেণ্ডের মধ্যে কেন্ট রুথের সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল সে।

'চাবি ঘুরিয়ে চালু করে দিলেন আমাকে, তারপর একেবারে হাওয়া হয়ে গেলেন যে, মি. রানা?'

'আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার গাড়িতে রেডিও আছে,' বলল কেন্ট রুথ। 'পাবলিক কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে হোয়াইট রিভার ন্যাশন্যাল ফরেস্ট-এর একটা রেঞ্জার স্টেশনে সিগন্যাল পাঠিয়ে জানিয়ে দিই মেসেজটা রিলে করার জন্যে।' দ্রুত বলে গেল রুথ।

'খবরটা কি?'

'ভাল-মন্দে মেশানো খবর...'

'আগে ভালটা,' বলল রানা।

'বোয়িঙের কাছ থেকে খবর পেয়েছি, নোজ গিয়ারটা অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট হিসেবে পঁচাত্তর হাজার চারশো তিপ্পান্ন নম্বর এয়ার-ফ্রেমে লাগানো হয়েছিল। মন্দ খবর, ওই নির্দিষ্ট প্লেনটা সামরিক বাহিনীর।'

'এয়ারফোর্সের?'

'সেই রকমই মনে হচ্ছে। ন্যাশন্যাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড নিখোঁজ কোন কমার্শিয়াল স্ট্রাটোক্রুজারের কথা বলতে পারছে না।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'এ-ব্যাপারে আপনাদের বোধহয় আর কিছু করার নেই, তাই না? আমার যতদূর জানা আছে, এয়ারফোর্সের সেফটি আপনাদের মাথা ঘামাবার বিষয় নয়।'

'কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবেন।'

'দেখা যাক,' বলল রানা।

'আপনি তদন্ত চালিয়ে যাবেন ধরে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় নরটন এয়ারফোর্স বেস-এর সেফটি বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে একটু অনুরোধ করেছি আমি, আপনার নামে। পঁচাত্তর হাজার চারশো তিপ্পান্ন নম্বর বোয়িং-এর ইতিহাস জানতে চেয়েছি ওদের কাছে। একজন কর্নেল, কর্নেল রেজনিক, তথ্য পাওয়ামাত্র আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কর্নেল রেজনিকের ফাংশানটা কি বলতে পারেন?'

'একই পদ আর দায়িত্ব আমাদের, তবে তিনি সামরিক বাহিনীর স্বার্থ দেখছেন,' বলল রুথ। 'পশ্চিমে যত এয়ারফোর্স ফ্লাইং অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে তার কারণ অনুসন্ধান করাই তাঁর কাজ।'

'গুড,' বলল রানা। 'এবার তাহলে একটা উত্তর পাওয়া যাবে

'আমিও তাই আশা করি।' খানিক ইতস্তত করল রুথ, তারপর আবার বলল, 'আচ্ছা, শেষ পর্যন্ত যদি জানা যায় যে মিস লোরার গ্যারেজে অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ারটা থাকার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, তাহলে কি হবে?'

'আমার বিশ্বাস, এর রহস্য আরও গভীরে লুকিয়ে আছে।'

ধীরে ধীরে রিসিভারটা ক্রাডলে রেখে দিয়ে সেটার দিকে স্তম্ভিতদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কেন্ট রুথ। শিরদাঁড়ার কাছে আশ্চর্য একটা শিরশিরে ভাব অনুভব করছে সে। রানার গলার আওয়াজটা অস্বাভাবিক গম্ভীর লাগল তার কানে, যেন কবরের ভেতর থেকে গম গম করে উঠছে।

দু'দিন পরের ঘটনা।

কেবিনের ডাইনিং টেবিলে গম্ভীর মুখে একা বসে আছে রানা। সামনে খোলা রয়েছে একটা টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ। সন্ধ্যা উতরে যাবার পর ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে হেলান দিল ও, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো ডলছে। ছুটি কাটাতে এসে একটা এরোপ্লেনের ভূত সওয়ার হয়েছে কাঁধে, কিন্তু ভূতের চেহারা দেখার সমস্ত চেষ্টা এখন পর্যন্ত ব্যর্থ। লাভের মধ্যে মনোলোভা এক বান্ধবীকে খেপিয়ে দিয়েছে সে, আর মোটা টাকা গচ্চা দিয়েছে 'কপ্টারের ভাড়া গুনে। কিন্তু তবু হাল ছাড়েনি সে। যত দিন যাচ্ছে তত আরও বেশি করে মনে হচ্ছে তার, এই ব্যাপারটার সাথে তার নিজের কি একটা যেন যোগাযোগ আছে। নোজ গিয়ার আর অক্সিজেন ট্যাংকটা প্রথম দেখেই যেমন মনে হয়েছিল—তার আবিষ্কারের অপেক্ষাতেই যেন পড়ে আছে ওগুলো। যাই হোক, জেদ চেপে গেছে তার, মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা দূর

না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়ছে না সে। সেজন্যেই গতকাল ওয়াশিংটনে ফিরে যাবার কথা থাকলেও ফেরেনি সে, অসন্তুষ্ট হয়ে একা ফিরে যেতে হয়েছে লোরাকে।

সিগারেট ধরাচ্ছে রানা, লাইটার ধরা হাতটা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। ভুরু কুঁচকে উঠল। অস্বাভাবিক ভারী শব্দ, যেই হোক দুই মনের কম নয় ওজন। একটু পরই সামনের ব্যালকনিতে উঠে এল পায়ের আওয়াজটা। দু'সেকেণ্ড পর দরজা দিয়ে প্রকাণ্ড একটা দাড়ি কামানো মুখ উঁকি দিল, দুই চোখে শিশুর সরলতা, সারা মুখে নির্মল হাসির উদ্ভাস। তার ঠোঁটের ওপর গোঁফ জোড়া দেখার মত, যেমন ঘন তেমনি লম্বা চওড়া—চেহারায় বাঘের মত একটা ছাপ এনে দিয়েছে। প্রথম দর্শনেই তাকে ভাল লেগে গেল রানার। কিন্তু কে হতে পারে? এখানে কোত্থেকে?

'বাড়িতে কেউ আছেন নাকি?'

চেয়ার থেকে না উঠেই বলল রানা, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরের ভেতর ঢুকল লোকটা। বিশাল শরীর, ধড়টা মস্ত এক ড্রামের মত। দুশো বিশ পাউণ্ডের কম হবে না, অনুমান করল রানা। ওর দিকে একটা বাঘের থাবা বাড়িয়ে দিল সে। 'আপনি নিশ্চয়ই মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'বসুন।'

রানার সামনের একটা চেয়ারে বসল লোকটা। 'ভাগ্যকে ধন্যবাদ, প্রথম চেষ্টাতেই পেয়েছি আপনাকে। পাহাড়ী এলাকা, তার ওপর সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ভয় হচ্ছিল পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমি রেজনিক। অ্যাবি রেজনিক।'

'কর্নেল রেজনিক?'

'টাইটেল বাদ দিন। দেখছেন না, সাদা পোশাক পরে এসেছি আমি?'

'আপনি ব্যক্তিগতভাবে আসবেন তা কিন্তু আশা করিনি আমি,' বলল রানা। 'এত কষ্ট স্বীকার না করে একটা চিঠি লিখলেও হত।'

ঠোঁটের হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল কর্নেল রেজনিকের। 'আসলে এক ঢিলে দুটো পাখি মারছি আমি,' বলল সে। 'ইলিয়নয়েসে চানুট এয়ারফোর্স বেসে আগামী হপ্তায় এয়ারক্রাফট সেফটির ওপর ভাষণ দেবার কথা আমার। পথের মধ্যে আপনি পড়েন, তাই ভাবলাম আপনার মত স্বনামধন্য ব্যক্তির সাথে পরিচিত হবার এই সুযোগটা হাত ছাড়া করা উচিত হবে না। তাছাড়া, এদিকে ভাল ট্রাউট পাওয়া যায় বলে শুনেছি, ভাবলাম, ওদেরকে নিয়ে একটু খেলাও হবে।'

'তার মানে এক ঢিলে তিন পাখি মারছেন আপনি,' বলল রানা। 'এসে ভাল করেছেন। একা বসে ভেরেণ্ডা ভাজছি আমি। আপনার সাথে কথা বলে তবু সময়টা একটু কাটবে। সাথে লাগেজ আছে?'

'বাইরে, একটা ভাড়া করা গাড়িতে।'

'নিয়ে আসুন, আমি কফি চড়াচ্ছি,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

কর্নেল রেজনিকও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আসার পথে কেন্ট রুথের সাথে দেখা করে এসেছি আমি।'

'তার মানে নোজ গিয়ারটা আপনি দেখেছেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাতের লেদার ব্রীফকেসটা টেবিলের ওপর রাখল কর্নেল রেজনিক। সাইড পকেটের চেইন খুলে ভেতর থেকে একটা স্ট্যাপল পিন মারা ফোল্ডার বের করে ধরিয়ে দিল রানার হাতে। 'এয়ারফোর্সের বোয়িং সি-নাইনটি-সেভেন, নাম্বার সেভেন-ফাইভ-ফোর-ফাইভ-থ্রী-এর স্ট্যাটাস রিপোর্ট এটা। এই স্ট্রাটোক্রুজারের কমাণ্ডার ছিল মেজর ভ্যান জনসন। আমি লাগেজ নিয়ে এসে খুলছি, এই ফাঁকে রিপোর্টটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন আপনি, মি. রানা।' একটু থেমে হাসল সে। 'কোন প্রশ্ন থাকলে হুংকার ছাড়বেন, কেমন?'

দশ মিনিট পর অতিরিক্ত বেডরুমে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে ফিরে এল কর্নেল রেজনিক। টেবিলের উল্টোদিকে রানার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল সে। 'আপনার কৌতূহল মিটেছে তো?'

ফোল্ডারের ওপর দিয়ে তাকাল রানা। 'এরা বলছে, উনিশশো চুয়ান্ন সালের জানুয়ারিতে একটা রুটিন ফ্লাইটে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হাওয়াই যাবার পথে প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাও নিখোঁজ হয় স্ট্রাটোক্রুজার।'

'এয়ারফোর্সের রেকর্ডে তাই দেখা যাচ্ছে।'

'কিন্তু নোজ গিয়ারটা তাহলে এখানে কলোরাডোয় এল কি ভাবে?'

'গভীর কোন রহস্য নেই এর মধ্যে। একটা প্লেনের সার্ভিস জীবনে তার পুরানো গিয়ার বদলাবার দরকার হতে পারে, বদলানো হয়ও। অনেক সময় হার্ড ল্যাণ্ডিঙের ফলে স্ট্রাটে চিড় ধরে। অথবা টো করার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই রকম আরও অনেক কারণে গিয়ার বদলাবার দরকার হয়।'

'মেইন্টেন্যান্স রেকর্ডে তার কথা উল্লেখ থাকে না?'

'না।'

'ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত না?'

'নিয়মের লঙ্ঘন, হয়তো। কিন্তু অদ্ভুত বলা যায় না। মেকানিকরা মেকানিক্যাল পার্টস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, খাতা-পত্র লেখার কাজে তেমন পটু নয়।'

ফোল্ডারে টোকা মারল রানা। 'এতে আরও বলা হয়েছে, প্লেন বা তার ক্রুদের কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।'

'হ্যাঁ, এখানে একটু রহস্য রয়েছে বলে মনে হয়। যদিও, এর একটা পানির মত সহজ উত্তরও আছে। রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে, সার্চটা ছিল অস্বাভাবিক জোরাল। অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় তন্নতন্ন করে খোঁজা হয় প্লেনটাকে। গ্রাউণ্ড ফোর্সকেও ডাকা হয়েছিল। এয়ারফোর্স আর নেভীর যৌথ প্রচেষ্টা তো ছিলই। কোন ফল হয়নি।' মাথা নেড়ে রানাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওর হাত থেকে কফির কাপটা নিল সে। 'যাই হোক, সহজ উত্তরটা হলো, প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে শুয়ে আছে স্ট্রাটোক্রুজার। কেউ যদি এটাকে বিরাট একটা রহস্য মনে করে, আপত্তি নেই, কিন্তু সে-রহস্যের কোন সমাধান কখনও পাওয়া যাবে না। এমন ডজন ডজন প্লেনের উল্লেখ আছে আমাদের ফাইলে, যেগুলোর কোন সন্ধান করা যায়নি, স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

'হুঁ,' সিগারেট ধরিয়ে ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা।

'এয়ার সেফটির একজন ইনভেস্টিগেটরের কাছে প্রতিটি নিখোঁজ প্লেন মাংসে

বেঁধা একটা কাঁটার মত। আমাদেরকে আপনি ডাক্তারদের সাথে তুলনা করতে পারেন, অপারেটিং টেবিলে মাঝেমধ্যেই রুগী হারাতে হয় যাদেরকে। এবং একবার হারালে রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়।'

'ফাইভ-থ্রী?' জানতে চাইল রানা। 'ওটা কি আপনার রাতের ঘুম কেড়ে নেবে?'

'দুর্ঘটনাটা ঘটেছে আমার যখন চার বছর বয়স,' বলল কর্নেল রেজনিক। 'ওটার সাথে আমার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। আমি যতটুকু বুঝি, এবং এয়ারফোর্স যতটুকু বোঝে, ফাইভ-থ্রী মহাকালের অন্ধকার গহ্বরে চিরতরে হারিয়ে গেছে। সাগরের তলায় ঘুমাচ্ছে সে। এর যা কিছু রহস্য, তাও চাপা পড়ে গেছে সেই সাথে।'

কর্নেল রেজনিকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর তার কাপটা ভরে দিল আবার। বলল, 'আপনি ভুল করছেন, কর্নেল। রহস্য যখন আছে, তার উত্তরও না থেকে পারে না। এবং সেটা তিন হাজার মাইল দূরেও নয়।'

চার

ব্রেকফাস্ট শেষ করে রানা এবং রেজনিক দু'জন দু'দিকে চলে গেল। হেলিকপ্টার ঢুকতে পারে না এমন একটা গিরিখাদে ঢুঁ মারতে গেল রানা, আর রেজনিক গেল মাছ ধরতে। দিনটা শুকনো। পাহাড়ের ওপর দু'একটা মেঘের ভেলা দেখা যাচ্ছে. টেম্পারেচার লো সিক্সটির ঘরে স্থির হয়ে আছে।

দুপুরের পর গিরিখাদ থেকে উঠে এসে কেবিনের দিকে হাঁটা ধরল রা গাছের ভেতর দিয়ে সরু একটা আবছা পথ দেখা যায় কি যায় না, সেটা পে টেবল লেকের পাড়ে এসে দাঁড়াল ও। পানির কিনারা ধরে এক মাইল এগোবার প একটা ঝর্না আর কর্নেল রেজনিককে দেখতে পেল। ছিপ গুটিয়ে কেবিনে ফেরার জন্যে তৈরি হচ্ছে সে।

'এনি লাক?'

'মাত্র একটা ট্রাউট,' বলল রেজনিক। 'আপনার খবর কি? যা খুঁজছেন পেয়েছেন?'

'পাইনি,' গম্ভীর মুখে বলল রানা। 'একটু ব্যায়াম হয়েছে, সেটুকুই লাভ।'

রানাকে একটা সিগারেট অফার করল রেজনিক। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল সেটা। 'আপনি সাংঘাতিক জেদী মানুষ, মি. রানা।'

হেসে উঠল রানা।

ঠিক এই সময় ঝর্নার পানিতে বাঁক নিয়ে উদয় হলো একটা কলাগাছের ভেলা। একটা কিশোর আর কিশোরী ভেজা কাপড় পরে হাসাহাসি, পানি ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। তীরে দু'জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে কোন খেয়ালই নেই তাদের,

অঢেল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে আছে নিজেদেরকে নিয়ে। রানা আর রেজনিক নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ভাটির দিকে যতক্ষণ না তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ওরাই উপভোগ করছে জীবনটাকে,' বলল রেজনিক। 'কোন দুশ্চিন্তা নেই, দায়িত্ব নেই···ভেলায় চড়ে আমরা কি আর এখন ওদের মত মেতে উঠতে পারব?'

রেজনিকের প্রশ্নটা শুনতেই পায়নি রানা। ছেলে আর মেয়েটা যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেখানে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ও। চেহারায় গভীর চিন্তার ভাব। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা।

'কি হয়েছে বলুন তো আপনার?' জানতে চাইল রেজনিক। 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র যেন দেবতার দর্শন পেয়েছেন?'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল রানার মুখে। 'ব্যাপারটা সেই প্রথম থেকেই খোঁচা মেরে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি গ্রাহ্য করিনি।'

'কি গ্রাহ্য করেননি?'

'শক্ত সমস্যার পানির মত সহজ সমাধান, যা নিয়ম।'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মি. রানা।'

'অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ার,' বলল রানা। 'কোত্থেকে ওগুলো এসেছে এখন আমি জানি।'

রানার দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে কর্নেল রেজনিক। বোবা হয়ে গেছে যেন সে। নিজের অজান্তে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে, 'জানেন?'

'দুটো জিনিসের মধ্যে একটা ব্যাপারে মিল আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু তা আমরা দেখেও-দেখতে পাইনি।'

'মিল আছে?' ভুরু কুঁচকে বলল রেজনিক। 'দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, মিল থাকবে কোত্থেকে? একটায় আছে গ্যাস, আরেকটায় হাইড্রলিক।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এয়ারক্রাফট থেকে খুলে নেবার পর একটা বিষয়ে দুটোর প্রবণতা একই রকম দাঁড়ায়।'

'কি সেটা?'

'দুটোই পানিতে ভাসে।'

লিডভিল। লেক কাউন্টি এয়ারপোর্ট।

উড়ন্ত একটা ব্যাঙের মত মাথার ওপর ঘুরছে ক্যাটলিন-টু হ্যাগ্রেড। গতি মন্থর হলেও, এর এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা এই আকৃতির আর কোন বিমানের নেই। নিজের ওজনের দ্বিগুণ কার্গো নিয়ে অসম্ভব সব জায়গায় ল্যাণ্ড করতে পারে ক্যাটলিন।

ঝপ্ করে নেমে পড়ল প্লেনটা। রানওয়ে দু'হাজার ফুট বাকি থাকতেই হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেল, ঠিক রানা আর রেজনিকের সামনে। এঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হলো। এক মিনিট পর নিচে নামল পাইলট, সোজা এগিয়ে আসছে ওদের দু'জনের দিকে।

ভূত দেখার মত চমকে উঠল কর্নেল রেজনিক। একবার পাইলট আর একবার

রানার দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছে সে। দু'চোখে বিমূঢ় বিস্ময়। রানার সামনে দাঁড়িয়ে পাইলটও তাকিয়ে আছে কর্নেলের দিকে। তার চোখেও বিস্ময়, তবে সেটা কৌতুক মেশানো।

খুক খুক করে একটু কেশে হাসিটা চেপে রাখল রানা। বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই। কর্নেল রেজনিক, এ আমার বন্ধু বেন নেলসন, এককালে আমার সহকর্মী ছিল, বর্তমানে ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সীর মুখ উজ্জ্বল করছে, চীফ ডিরেক্টর দোর্দণ্ড প্রতাপ জর্জ হ্যামিলটনের সহকারী এবং একজন ডিরেক্টরও বটে। বেন, ইনি হলেন...' কর্নেলের বিস্তারিত পরিচয় দিল রানা।

রেজনিক আর বেন পরস্পরের হাত ধরল, ভঙ্গিটা দেখে মনে হলো দু'জন যেন পাঞ্জা লড়ছে। দু'জন দুজনের চোখে তাকিয়ে আছে, দুটো নাকে প্রায় ধাক্কা লাগার অবস্থা। চেহারায় অমিল নেই বললেই চলে। বেন নেলসনের মাথায় চুল নেই, মস্ত টাক চকচক করছে, কিন্তু রেজনিকের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, এ-টুকুই যা পার্থক্য। একনজর দেখে যে কেউ বলবে এরা যমজ ভাই। দু'জনের একই কাঠামো, সমান লম্বা, একই ওজন, এমন কি গায়ের রঙ আর গোঁফ জোড়াও হুবহু এক।

'কর্নেল,' সহাস্যে বলল বেন নেলসন, 'আশা করি পরস্পরের সাথে আমরা কখনোই ঝগড়া বিবাদ করব না।'

'আমিও বুঝতে পারছি, সেটা শুধু সময়েরই অপচয় হবে,' সকৌতুকে হেসে বলল কর্নেল রেজনিক।

'যে সব ইকুইপমেন্ট আনতে বলেছিলাম, এনেছ, বেন?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল বেন। 'সব। কিন্তু এই চুরি সম্পর্কে অ্যাডমিরাল যদি জানতে পারেন, পানিতে চুবিয়ে মারবেন আমাকে।'

'অ্যাডমিরাল?' বলল রেজনিক। 'এর মধ্যে নেভী আসছে কিভাবে?'

'নেভী আসছে না,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কথা বলছে বেন। ভদ্রলোক রিটায়ার করেছেন, তিনিই এখন ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সীর চীফ ডিরেক্টর।'

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে চোখ দুটো কপালে উঠে গেল কর্নেলের। 'তার মানে বলতে চাইছেন, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের একটা প্লেন চুরি করে এনেছেন আপনি, মি. বেন?'

'শুধু প্লেনটা নয়, সাথে ইকুইপমেন্টও রয়েছে,' হাসছে বেন।

'এ অবিশ্বাস্য,' বলল রেজনিক। 'আপনাদেরকে সহায়তা করার অপরাধে নির্ঘাত কোর্ট মার্শাল হবে আমার।'

'যদি ধরা পড়ি তবে তো?' বলল রানা। 'ব্যাপারটা জানাজানি হবার আগেই জায়গামত পৌঁছে দেয়া হবে সব। তাছাড়া, ধরা যদি পড়িও, দুটো গালমন্দ করে ক্ষমা করে দেবেন অ্যাডমিরাল। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন।' দ্রুত প্রসঙ্গ বদলে কাজের কথায় চলে এল রানা। 'তোমরা ধরাধরি করে কার্গো নামাও, বেন। আমি জীপটা নিয়ে আসি।' হন হন করে চলে গেল ও।

'আপনারা বুঝি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু?' জানতে চাইল রেজনিক।

'জানের জান।'

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না, এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন এই বিদেশী ভদ্রলোক?'

'ফাইভ-থ্রীর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'রানা যদি বলে আপনার মাথার চুলে লুকিয়ে আছে একটা বাঘ, চোখ বন্ধ করে তাই বিশ্বাস করা উচিত আপনার,' গম্ভীর মুখে বলল বেন। 'এটা আমার নয়, নুমা-র ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কথা।'

ডেকে হাঁটু রেখে একটা রো-বোটে বসে আছে রানা, অপলক চোখে তাকিয়ে আছে টিভি মনিটরের দিকে। বো-এর দিকে বসে রয়েছে কর্নেল রেজনিক, বৈঠা চালাচ্ছে। বিশ ফুট দূরে আরেকটা বোটে রয়েছে বেন, ব্যাটারি-চালিত একটা ট্র্যান্সমিটারের আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। বৈঠা চালাচ্ছে সে। একটা তারের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে, তারটা স্টার্ন টপকে নেমে গেছে পানিতে। অপর প্রান্তে রয়েছে ওয়াটারটাইট কেসে ভরা একটা টিভি ক্যামেরা।

'কিস্যু দেখা যাচ্ছে না?' চিৎকার করে জানতে চাইল বেন।

বৈঠা চালান, বৈঠা চালান,' তাগাদা দিল রেজনিক। 'মাঝখানের ফাঁক কমে আসছে, দেখছেন না?'

ওদের কথায় কান নেই রানার, টিভি স্ক্রীনের দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে ও। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বৈকালিক অলস বাতাস নেমে এসে লেকের পানির ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে, বোট দুটোকে সমান দূরত্বে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে বেন আর রেজনিকের পক্ষে।

সেই কাকভোর থেকে লেগে রয়েছে ওরা, কিন্তু এখন পর্যন্ত মনিটরের পাশ ঘেঁষে নুড়ি পাথরের স্তূপ আর মরা গাছের বনভূমি ছাড়া কিছু যেতে দেখেনি। পাতাহীন ন্যাড়া শাখায় বেশ কয়েকবার আটকে গেছে ক্যামেরাটা, ছাড়াতে প্রতিবার বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়েছে। কয়েকটা রংধনু ট্রাউট লেজের বাড়ি মেরে গেছে ক্যামেরার গায়ে। তাতে অবশ্য কোন ক্ষতি হয়নি।

'এ-ধরনের একটা সার্চের জন্যে স্কুবা ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করলে ভাল হত না?'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ক্লান্ত চোখ দুটো রগড়াচ্ছে রানা। রেজনিকের প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'টিভি ব্যবহার করার অনেক সুবিধে। তাছাড়া, কোথাও কোথাও লেকটা দুশো ফুট গভীর, অত গভীরে একজন ডাইভার কয়েক মিনিটের বেশি থাকতে পারবে না। তার ওপর, পঞ্চাশ ফুটের নিচে পানির তাপ প্রায় ফ্রিজিং পয়েন্টে রয়েছে। দশ মিনিটের বেশি অত ঠাণ্ডা কারও শরীরে সইবে না।'

'কিন্তু কিছু যদি পাই আমরা, তখন?'

'একনজর দেখার জন্যে ওয়েট স্যুট পরে নামব একবার, তার আগে নয়।'

মনিটরে কি যেন ফুটে উঠছে একটা, ভাল করে দেখার জন্যে স্ক্রীনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। কালো একটা কাপড় দিয়ে আড়াল সৃষ্টি করল ও, বাইরের আলো যাতে স্ক্রীনে না পড়ে।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ, রানা?' হাঁক ছাড়ল বেন।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ভৌতিক ছবি।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রেজনিকের।

'দেখে মনে হচ্ছে একটা লগ কেবিন,' স্ক্রীনে চোখ রেখে বলল রানা।

'লগ কেবিন?'

'এসে দেখে যান না?'

এগিয়ে এসে রানার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে টিভি স্ক্রীনের দিকে তাকাল রেজনিক। বোট থেকে একশো সত্তর ফুট নিচে রয়েছে ক্যামেরা, ভাঙাচোরা দুমড়ানো মোচড়ানো একটা কাঠামোর ছবি রিলে করে পাঠাচ্ছে ওপরে। পানির চঞ্চল গা ভেদ করে সূর্যের আলো এঁকেবেঁকে খুব সামান্যই নামতে পেরেছে অত নিচে, কাঠামোটাকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে।

হতভম্ব দেখাচ্ছে রেজনিককে। 'ওখানে ওটা এল কোত্থেকে?'

'টেবল লেক মানুষের তৈরি,' বলল রানা। 'পঞ্চাশ বছর আগে এই উপত্যকার ঝর্নার স্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকানো হয়। পুরানো স্রোতটার কাছে একটা কাঠচেরাইয়ের কারখানা ছিল, পানি ফেঁপে উঠলে ডুবে যেত সেটা। এই কেবিনটা ওই কারখানারই একটা অংশ হবে।'

'কিন্তু এখনও প্রায় অক্ষত দেখাচ্ছে!'

'ঠাণ্ডা হিম তাজা পানির কৃতিত্ব,' বলল রানা।

'এবার বাড়ি ফিরলে হয় না, রানা?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল বেন।

'আর দু'ঘণ্টা পর সন্ধ্যা হয়ে আসবে,' বলল রানা। 'বাড়ি ফিরতে ওই দু'ঘণ্টা সময় লাগবে আমাদের। ঘুরিয়ে নাও বোট।'

'ক্যামেরা?' জানতে চাইল বেন। 'রীল গুটিয়ে নেব?'

'না,' বলল রানা। 'ঝুলছে ঝুলুক। ডকে গিয়ে তুললেই হবে।'

বোট ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথে রওনা হলো ওরা। রোদের আঁচে চেহারাগুলো ঝলসে গেছে, ঠায় বসে থেকে ব্যথা ধরে গেছে শরীরে। গরম পানির গোসল, আগুনের আঁচ, গ্লাস ভর্তি হুইস্কি, মুরগীর রোস্ট আর নরম বিছানার কথা মনে পড়ে যেতে ক্লান্তি যেন আরও বেড়ে গেল ওদের। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে আছে সবাই, কথা বলার ধৈর্য নেই।

একটু পর নিস্তব্ধতা ভাঙল রেজনিক। 'লেকের মাঝখান দিয়ে দু'বার যাওয়া আসা করেছি আমরা। পাথর, গাছ আর মাছ ছাড়া কি দেখেছি? বাস্তবকে আপনার মেনে নিতে হবে, মি. রানা।'

কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে রেজনিকের দিকে নয়, বেনের দিকে তাকাল রানা। 'তোমার বাঁ দিকে এক বুড়ো অ্যাঙলার মাছ ধরছে, ওদিকে একবার চলো তো।'

ঘাড় ফিরিয়ে বাঁ দিকে তাকাল বেন, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর বোটের নাক ঘুরিয়ে নিয়ে বুড়ো অ্যাঙলারের দিকে এগোতে শুরু করল। কর্নেলের চেহারায় বিরক্তি ফুটে উঠেছে, কিন্তু কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল সে।

মাথাচাড়া দিয়ে পানির ওপর উঠে পড়েছে একটা প্রকাণ্ড পাথর, সেটার ওপর দাঁড়িয়ে টোপ ছুঁড়ছে বুড়ো লোকটা। বোটের ওপর রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাথার হ্যাট খুলে নাড়ল সে। গলা ছেড়ে কথা বললে পরস্পরের কথা শুনতে পাবে

এখন ওরা।
'এনি লাক?'
'কপাল মন্দ আজ।'
'টেবল লেকে প্রায়ই মাছ ধরেন আপনি?'
'বাইশ বছরের ওপর হলো।' প্রাচীন হাসি হাসল বুড়ো।
'বলতে পারেন, লেকের কোন্ দিকটায় সবচেয়ে বেশি বেইট খোয়া যায়?'
'ঠিক বুঝলাম না!'
'টেবল লেকে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে অ্যাঙলারদের বেইট খোয়া যায়?'
একটা হাত নেড়ে বুড়ো বলল, 'ওদিকে একটা ডুবন্ত কাঠচেরাই কারখানা আছে, ওখানে এই কাণ্ড ঘটে বটে।'
'পানির গভীরতা?'
'আট, কোথাও বারো ফুট।'
'আরও গভীর জায়গা খুঁজছি আমরা, আরও অনেক গভীর,' বলল রানা।
এক মুহূর্ত চিন্তা করল বুড়ো শিকারী। 'লেকের দক্ষিণ প্রান্তে আগাছা ভরা জায়গাটার ওপরে মস্ত একটা গর্ত আছে, গত গ্রীষ্মে ওখানে আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় দুটো স্পিনার হারিয়েছি। গরমের দিনে বড় মাছগুলো গভীর পানিতে নেমে যায়, কিন্তু আপনাকে আমি ওখানে টোপ ফেলার পরামর্শ দেব না। যতই ফেলুন, সব আটকে যাবে।'
'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা, হাত নেড়ে বিদায় নিল। 'গুড লাক।'
'গুড লাক,' উত্তরে বলল বুড়ো শিকারী। পরমুহূর্তে তার হাতের রডটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল। টোপটা বোধহয় বড় একটা মাছই গিলেছে। ছিপ-হুইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শিকারী।
'শুনলে তো, বেন?'
ঘাড় ফিরিয়ে লেকের দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে আছে বেন, অনুমান করল আগাছা ভরা গর্ত এখান থেকে সিকি মাইলের কম দূরে নয়। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সে। রানার ইচ্ছের বিরুদ্ধে মুখ খোলা স্বভাব নয় তার। লেকের মেঝের সাথে যাতে ঘষা না খায় তাই আরেকটু তুলে নিল সে ক্যামেরাটা। তারপর টেনেটুনে হাতের দস্তানা জোড়া ঠিকঠাক করে, তুলে নিল বৈঠা দুটো। গম্ভীর চেহারা নিয়ে চুপচাপ সবই লক্ষ করছে কর্নেল রেজনিক, কিন্তু রানার প্রতি বেনের আনুগত্য আর আস্থা দেখে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না।
প্রতিকূল বাতাস ঠেলে এগোচ্ছে ওরা। অসহ্য ধীর গতিতে কাটল ত্রিশটা মিনিট। বেন আর রেজনিক নিঃশব্দে তাদের শ্রম দিয়ে যাচ্ছে—বেন রানার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ, আর রেজনিক বেনের কাছে পরাজয় স্বীকার না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। টিভি স্ক্রীনের দিক থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না রানা, মাঝেমধ্যেই ক্যামেরার ডেপথ অ্যাডজাস্টমেন্ট সংশোধন করতে বলছে সে বেনকে।
পাতলা আগাছার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে এখন ক্যামেরা, সেই সাথে ক্রমশ উঁচু

হয়ে উঠছে লেকের মেঝে। রানার ভয় অমূলক প্রমাণিত হলো, কোথাও বাধা পেয়ে ক্যামেরাটা আটকে যাচ্ছে না। তারপর হঠাৎ আগাছার জঙ্গল হালকা হয়ে গেল, পানির রঙ হয়ে উঠল গাঢ়। ক্যামেরা আরও নিচে নামাবার জন্যে একবার থামল ওরা।

গভীর পানিতে পৌছে মাত্র কয়েক গজ এগিয়েছে, এই সময় একটা বাঁক খাওয়া, জিনিসের কোণ ফুটে উঠল টিভি স্ক্রীনে। অংশ বিশেষ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বৈঠা থামাও।' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রানা।

ধপ্ করে সীটের একপাশে হেলান দিল রেজনিক, বিরতি পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করছে। কিন্তু নিজের বোট থেকে তীক্ষ্ণ চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে বেন। রানার কণ্ঠস্বর চেনা আছে তার।

লেকের হিম-শীতল তলদেশে মন্থর গতিতে এগোচ্ছে ক্যামেরা, ধীরে ধীরে একটা উদ্ভট আকৃতির জিনিসের ছবি ফুটে উঠছে স্ক্রীনে। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে রানা, টিভির পর্দায় দেখছে গাঢ় নীল ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর একটু একটু করে ফুটছে মস্ত বড় একটা সাদা তারা। অধীর উত্তেজনায় শরীরের সমস্ত পেশী টান টান হয়ে গেছে ওর, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। গলার ভেতরটা কাঠ হয়ে গেছে শুকিয়ে।

বৈঠা চালিয়ে কাছে চলে এসেছে বেন, দুটো বোটকে এক করে ধরে রেখেছে সে। পরিবেশের উত্তেজনাটা টের পেয়েছে রেজনিকও, মাথা তুলল সে, সপ্রশ্ন চোখে তাকাল রানার দিকে। 'কিছু দেখতে পাচ্ছেন নাকি?'

'একটা প্লেন,' অস্বাভাবিক মৃদু গলায় বলল রানা। 'গায়ে মিলিটারি মার্কিং।' শরীরের কাঁপুনিটা ইচ্ছাশক্তির জোরে দমিয়ে রেখেছে ও

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল কর্নেল রেজনিক। স্ক্রীনের দিকে তাকিয়েই অবিশ্বাসে কপালে উঠে গেল তার চোখ জোড়া, হাঁ হয়ে গেছে মুখ, ভেতরে আলাজিভ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে প্লেনের ডানার ওপর দিয়ে ভেসে এসেছে ক্যামেরা, এখন ফিউজিলাজের পাশ ঘেঁষে পিছিয়ে যাচ্ছে। চৌকো একটা পোর্ট ধীরে ধীরে সরে আসছে দৃষ্টিসীমার মধ্যে। পোর্টের ওপর দিয়ে মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছে বড় বড় ইংরেজী অক্ষরগুলো: MILITARY AIR TRANSPORT SERVICE.

'সুইট জীসাস!' হাঁপাচ্ছে বেন।

'মিলিটারি এয়ার ট্র্যান্সপোর্ট!' জ্বরের ঘোরে কথা বলছে যেন রেজনিক। 'মডেল? মডেলটা কি বলতে পারেন?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'উঁহুঁ, এঞ্জিন আর নোজ সেকশন এড়িয়ে গেছে ক্যামেরা। বাঁ দিকের ডানার ডগা হয়ে এখন এগোচ্ছে লেজের দিকে।'

'ভার্টিক্যাল স্ট্যাবিলাইজারের ওপর সিরিয়াল নাম্বার থাকার কথা,' অস্ফুটে বলল রেজনিক, যেন প্রার্থনা করছে।

পানির নিচে উন্মোচিত হচ্ছে বিস্ময়কর এক দৃশ্য, নিঃসাড় বসে সবাই তাই দেখছে ওরা। গভীর কাদায় ডুবে বসে আছে প্লেনটা। ফিউজিলাজ ফেটে গেছে দুই ডানা পর্যন্ত, লেজটা বেঁকে গেছে এক দিকে।

হালকা ভাবে বৈঠা চালিয়ে নিচের ক্যামেরাটাকে নতুন এক পথে নিয়ে এল

বেন। পরিষ্কার ফুটে উঠল অ্যালুমিনিয়ামের গায়ের স্ক্রুগুলো। নিজেদের চোখে দেখছে, কিন্তু তবু যেন বিশ্বাস হচ্ছে না কারও। পরমুহূর্তে ভার্টিক্যাল স্ট্যাবিলাইজারের গায়ে সিরিয়াল নাম্বারের প্রথম সংখ্যাটা ফুটে উঠতে দেখল ওরা। 7-এর পর 5, তারপর 4, সবশেষে 53। এক সেকেণ্ডের জন্যে মুখ তুলে তাকাল রেজনিক, রানার চেহারাটা দেখে নিল। সামান্যতম বিকার নেই—লোকটা মানুষ না আর কিছু? ভাবছে সে।

'মাই গড!' আঁতকে উঠল সে, সর্ব শরীর থরথর করে কাঁপছে তার। 'ফাইভ-থ্রী! এটা ফাইভ-থ্রী! কিন্তু এ যে অসম্ভব!'

'উঁহুঁ, সম্ভব,' বলল বেন। 'চোখে দেখে অবিশ্বাস করব কিভাবে বলুন?' খপ্ করে রানার হাতটা ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল সে। 'জিতে রহো, দোস্ত!'

'এখন আমরা কি করব?' জানতে চাইল কর্নেল রেজনিক।

'বোট থেকে একটা মার্কার বয়া ফেলে দিয়ে আজকের মত শেষ করা যাক,' বলল রানা। 'কাল সকালে দেখব ধ্বংসস্তূপের ভেতর কি পাওয়া যায়।'

ওখানেই বসে মাথা নাড়ছে রেজনিক, আর বারবার বিড়বিড় করছে, 'অসম্ভব! হতে পারে না…ওটা ওখানে থাকতেই পারে না…কি করে!…বিশ্বাস করি না, অসম্ভব…'

'কি হলো, কর্নেল?' সহাস্যে জানতে চাইল রানা। 'নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না আপনি?'

'ব্যাপারটা তা নয়,' ফোঁড়ন কাটল বেন নেলসন, 'কর্নেল একটা সাইকোলজিক্যাল সমস্যায় পড়ে গেছেন।'

'সমস্যায় পড়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ,' বলল বেন। 'ওঁর মাথার চুলে যে একটা বাঘ লুকিয়ে আছে তা তিনি বিশ্বাস করেন না।'

হাড়-কাঁপানো ভোরের বাতাস সত্ত্বেও স্যুটের ভেতর ঘামছে রানা। ব্রিদিং রেগুলেটর চেক করে নিয়ে আকাশের দিকে বুড়ো আঙুলের ডগা তুলে বেনকে সিগন্যাল দিল ও, বোটের কিনারা টপকে ঝপাৎ করে নেমে গেল পানিতে।

হিম-শীতল পানির ধাক্কা ইলেকট্রিক শকের মত অনুভব করল রানা। কয়েক মিনিট পানির ঠিক নিচেই ভেসে থাকল, ওয়েট স্যুটের পাতলা আবরণ ভেদ করে ঠাণ্ডা ছুরি বিঁধছে গায়ে, শরীরের তাপে আবরণটাকে আবার গরম হয়ে ওঠার জন্যে সময় দিচ্ছে ও। টেম্পারেচার সহনীয় হয়ে এল একটু পরই, কান দুটো পরিষ্কার করে নিয়ে ফিন চালিয়ে নামতে শুরু করল নিচের দিকে। মার্কার বয়ার লাইনটা একটু তেরছা ভাবে লেকের গভীর দেশে নেমে গেছে, গাঢ় রঙের পানির গভীরতা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে।

দ্রুত নেমে এল রানা লেকের তলায়, নরম কাদার ভেতর ফিন চালিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে থামল ও। কাদায় ঘোলা হয়ে গেছে পানি, বেশি দূর দৃষ্টি যাচ্ছে না। চোখের সামনে কব্জি তুলে ডেপথ গজটা পরীক্ষা করল ও। একশো চল্লিশ ফুট। তার মানে ডিকমপ্রেসনের জন্য দুশ্চিন্তা না করেও দশ মিনিট এখানে থাকতে

পারবে।

সবচেয়ে বড় শত্রু পানির তাপ, সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে ওর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সংস্পর্শে শরীরের তাপ হারিয়ে ফেলছে ও। আট ফুটের ওদিকে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সেটা কোন সমস্যা হয়ে দেখা দিল না। মার্কার বয়ার লাইনটা প্লেনের একেবারে গা ঘেঁষে পড়েছে, হাত বাড়ালেই ধাতব গা ছুঁতে পারে ও। নামার আগে ভেবেছিল, কাছ থেকে প্লেনটাকে দেখে একটু ভয় ভয় করবে তার, ছুঁতে গেলে ছমছম করবে গা। কিন্তু ওসব কিছুই হলো না। আশ্চর্য একটা তৃপ্তি অনুভব করছে ও, যেন ক্লান্তিকর একটা দীর্ঘ অভিযান এইমাত্র শেষ করল।

সাঁতরে প্লেনের এঞ্জিনগুলোর ওপর চলে এল ও। প্রপেলারের ব্লেডগুলো গর্বিত ভঙ্গিতে বাঁক নিয়েছে পিছন দিকে। ফিন লাগানো সিলিণ্ডারগুলো আর কখনও কমবাস্টশনের তাপ অনুভব করবে না। ককপিটের জানালার পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে ও, কাঁচগুলো এখনও অটুট, কিন্তু ছাতা পড়ে গেছে, ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা, মূল্যবান দুটো মিনিট এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে। মেইন ফিউজিলাজের একটা জায়গা ভেঙে দু'ফাঁক হয়ে গেছে, দ্রুত সেদিকে এগোল ও। ফাটলটার কাছে একটু ইতস্তত করল, না জানি কি দেখতে পাবে ভেতরে। পরমুহূর্তে ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল, অন করল ডাইভ লাইটের বোতাম।

আবছা আলোয় প্রথমেই মেটাল ক্যানগুলো দেখতে পেল রানা। স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, কার্গো কেবিনের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে সেগুলো। সাবধানে পা ফেলে এগোচ্ছে রানা, সামনে খোলা দেখা যাচ্ছে কন্ট্রোল কেবিনের দরজা।

কন্ট্রোল কেবিনে ঢুকে দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল ও। যার যার সীটে বসে রয়েছে চারটে কঙ্কাল, নাইলনের বেল্ট এখনও সীটের সাথে আটকে রেখেছে তাদেরকে। নেভিগেটরের আঙুলের হাড়গুলো কিছু ধরার জন্যে বাঁকা হয়ে রয়েছে। প্যানেলের সামনে বসা কঙ্কালটা যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে, মাথাটা কাত হয়ে রয়েছে একদিকে।

সন্তর্পণে এগোল রানা। এয়ার রেগুলেটর থেকে বেরিয়ে বুদ্বুদগুলো দ্রুত উঠে যাচ্ছে, গায়ে গা ঠেকিয়ে ভিড় জমাচ্ছে সিলিঙের এক কোণে। কঙ্কাল হলেও, আশ্চর্য একটা প্রাণের ছোঁয়া রয়েছে ওদের মধ্যে। কালের আঁচড়ে শরীর থেকে মাংস ঝরে গেলেও, গায়ে এখনও সেঁটে রয়েছে কাপড়চোপড়। ইউনিফর্মগুলো সম্পূর্ণ অক্ষত, ঠাণ্ডা হিম পানি আড়াই দশকেও পচতে দেয়নি ওগুলোকে।

সীটের ওপর শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে রয়েছে কো-পাইলট, মস্ত একটা গহ্বরের মত দেখাচ্ছে মুখটাকে, বোঝা যায় চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেছিল শেষ মুহূর্তে। সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে পাইলট, ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে ছুঁই ছুঁই করছে মাথাটা। তার ব্রেস্ট পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা ছোট মেটাল প্লেট। দু'আঙুলে ধরে সেটা পকেট থেকে বের করে নিল রানা, গুঁজে রাখল ওয়েট স্যুটের আস্তিনে। পাইলটের সীটের পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা ফোল্ডার, সেটাও তুলে নিল ও।

অবশ হয়ে আসছে শরীর। দ্রুত রিস্টওয়াচ দেখল রানা। সময় হয়ে এসেছে। মুখ তুলতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। কঙ্কালগুলো ঘাড় ফিরিয়ে মণিহীন চোখে চেয়ে আছে সরাসরি ওর দিকে। লক্ষণ ভাল নয়, বুঝতে পারছে ও। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার প্রকোপে

রক্তপ্রবাহের গতি শ্লথ হয়ে পড়ছে, আক্রান্ত হচ্ছে ব্রেন, দৃষ্টিভ্রম ঘটছে ওর।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে এল রানা। জায়গা পেয়ে কার্গো কেবিনের ভেতর ঘুরে দাঁড়াল ও, পরমুহূর্তে আবার ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। একটা মেটাল ক্যানের আড়াল থেকে বেরিয়ে রয়েছে একটা কঙ্কালের পা। কার্গো বাঁধার কয়েকটা রিঙের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে কঙ্কালটাকে। ঠিক কঙ্কাল বলা যায় না, কারণ ককপিটে বসা ক্রুদের মত এটার শরীর থেকে এখনও মাংস ঝরে যায়নি।

লোকটার দিকে এগোচ্ছে রানা। প্রথমেই লক্ষ্য করল, পরনের ইউনিফর্মটা এয়ারফোর্সের নয়। আর সবার পরনে নীল পোশাক, কিন্তু এর পরনে খাকী রঙের কাপড়। পুরানো একটা আর্মি ইস্যু। পকেটগুলো সার্চ করল ও। খালি।

হাত-পা অসাড় লাগছে। নড়তে চড়তে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে এখন। কিছুক্ষণের মধ্যে শরীরটাকে গরম করে তুলতে না পারলে প্লেনের ভেতর লাশের সংখ্যা আরও একটা বাড়বে। ঠিক মত কাজ করছে না ব্রেন। পিছিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করল, পথ হারিয়ে ফেলেছে সে। আতঙ্কে ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে বুকের ভেতর হার্ট। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু হয়ে আসছে, ক্রমশ জ্ঞান হারাচ্ছে ও। শেষ মুহূর্তে বুদ্বুদগুলো দেখতে পেল, ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে যাচ্ছে কার্গো কেবিন থেকে। তাড়াহুড়ো করতে চাইছে রানা, কিন্তু অসাড় শরীরটা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এগোতে দিচ্ছে না ওকে। ধীর গতিতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ও। মনে পড়ছে, একশো চল্লিশ ফুট। পা ছুঁড়তে শুরু করল ও। ফিনগুলো পায়ে আছে কিনা অনুভব করছে না, শুধু কোমর থেকে নিচের দিকটা পাথরের মত ভারী লাগছে। কতক্ষণ এভাবে কেটে গেছে বলতে পারবে না রানা, খোলা চোখে ওপর দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ মাত্র দশ ফুট দূরে বোটের তলাটা দেখতে পেল। বোটের কিনারা থেকে ঝুঁকে রয়েছে বেন, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন দেখাচ্ছে তার মাথাটাকে।

হাত বাড়িয়ে একটা বৈঠা ধরবে, সে শক্তি নেই রানার। বেন আর রেজনিক পানি থেকে টেনে তুলল ওকে। ওদের হাতে নেতিয়ে পড়েছে ওর শরীরটা।

'ওর স্যুট খুলতে সাহায্য করুন আমাকে!' চেঁচিয়ে উঠল বেন। রানাকে একনজর দেখেই বিপদ টের পেয়ে গেছে সে। দ্রুত ব্যবস্থা নিতে না পারলে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবে রানা।

'মাই গড, একেবারে নীল হয়ে গেছেন!'

'আর পাঁচ মিনিট পানিতে থাকলে হাইপোথারমিয়া ছিনিয়ে নিয়ে যেত ওকে,' ছুরি দিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ওয়েট স্যুট কেটে ফেলছে বেন।

'হাইপোথারমিয়া?'

'বডি-হিট লস,' বলল বেন। 'এতে আক্রান্ত হয়ে অনেক ডাইভারকে মারা যেতে দেখেছি আমি।'

'কিন্তু আমি এখুনি মরতে চাই না, বেন,' নিচু গলায় বলল রানা। থরথর করে কাঁপছে ও।

নগ্ন রানাকে দু'জন মিলে ম্যাসেজ করছে। দশ মিনিট পর মোটা উলের কম্বল

দিয়ে মুড়ে ফেলা হলো ওকে। হাত আর পায়ে ধীরে ধীরে রক্ত চলাচল শুরু হচ্ছে, ফিরে আসছে অনুভূতি। সরে দাঁড়াল ওরা, যাতে রোদ লাগে ওর গায়ে। সরাসরি একটা থার্মোফ্লাস্ক থেকে গরম কফি ঢালছে ওর মুখে।

'তুমি শালা বোকা নাকি?' আর কোন বিপদ নেই বুঝতে পেরে বকাঝকা শুরু করেছে বেন। 'আর একটু দেরি হলেই তো পটল তুলতে। কি দরকার ছিল অতক্ষণ নিচে থাকার? ওখানের পানি নিশ্চয়ই ফ্রিজিং...'

'কি দেখলেন ওখানে?' কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করল রেজনিক।

দ্রুত কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে সিধে হয়ে বসল রানা। 'ফোল্ডার...ফোল্ডারটা কোথায়?'

চোখের সামনে তুলে ধরল সেটা বেন। 'এই যে, আমার কাছে। তোমার হাতে ছিল।'

'ছোট একটা চৌকো মেটাল প্লেটও নিয়ে এসেছি...'

'সেটাও পেয়েছি আমি,' বলল বেন। 'তোমার আস্তিন থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

বোটের গায়ে হেলান দিল রানা। বেন ফ্লাস্কটা ওর মুখের সামনে ধরতে আরেকটা চুমুক দিল ও। 'কার্গো কেবিনে অনেকগুলো বড় সাইজের মেটাল ক্যান রয়েছে। স্টেইনলেস স্টীলের তৈরি, মরচে প্রায় ধরেনি বললেই চলে। ভেতরে কি আছে বুঝতে পারিনি। ওগুলোর গায়ে কোনরকম মার্কিং নেই।'

'কি রকম দেখতে?' প্রশ্ন করল রেজনিক। 'আকৃতি?'

'সিলিণ্ডারের মত।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে কর্নেল রেজনিককে। 'স্টেইনলেস স্টীলের ক্যানে মিলিটারি কার্গো? কি হতে পারে? মাথায় কিছু ঢুকছে না আমার।' পরমুহূর্তে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে। 'ক্রু? আছে কেউ?'

'যার যার সীটে বসে আছে। এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম পরা চারটে কঙ্কাল।'

আলতোভাবে ফোল্ডারটা খুলছে বেন। 'কাগজগুলো এখনও হয়তো পড়ার মত আছে। কেবিনে নিয়ে গিয়ে আলাদা করে শুকোবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'ওটা বোধহয় ফাইভ-থ্রীর ফ্লাইট প্ল্যান,' বলল রেজনিক।

'লেখাগুলো পড়া গেলে হয়তো জানা যাবে কোর্স থেকে এতদূরে কেন এসেছিল ক্রুরা।'

'পেন্টাগনকে সমস্ত ঘটনা জানাবার আগে তথ্যগুলো গুছিয়ে নিতে হবে আমাদেরকে,' গম্ভীর মুখে বলল রেজনিক।

খুব জোরে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা। তারপর মৃদু হাসল।

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল রেজনিক। 'কিছু বলতে চান, মি. রানা?'

'গোটা ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিচ্ছেন আপনি, কর্নেল,' বলল রানা। 'সমস্ত তথ্য গুছিয়ে নেয়া কি এতই সহজ? চোখে যতটুকু দেখতে পাচ্ছি তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি রহস্য জড়িয়ে রয়েছে ফাইভ-থ্রীর সাথে।'

'বিধ্বস্ত প্লেনের পুরোটা পেয়েছি আমরা, তাই নয় কি?' অনেক কষ্টে গলাটাকে শান্ত করে রেখেছে রেজনিক। 'সমস্ত তথ্য মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে।

লেকের তলা থেকে ওটাকে উদ্ধার করলেই তো আমাদের দায়িত্ব শেষ। এর মধ্যে কঠিন কোন জিনিসটা, আর রহস্যই বা কোথায়?'

'কাহিনী নতুন একটা মোড় নিয়েছে, কর্নেল।'

'মানে?'

'বলতে ভুলে গেছি,' শান্তভাবে বলল রানা, 'আমাদের হাতে এখন একটা খুনের কেসও রয়েছে।'

'হোয়াট!' একযোগে আঁতকে উঠল বেন আর রেজনিক।

পাঁচ

কলোরাডো। চার্লি স্মিথের কেবিন।

কিচেন রুমের টেবিলে ফোল্ডারের খোলা পাতাগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে বেন নেলসন। মোট ছয়টা শীট। পাইলটের পকেট থেকে পাওয়া ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের প্লেটটা নিজের তৈরি একটা সলিউশনে ডুবিয়ে রেখেছে বেন, মরচে আর রঙের দাগ তোলার জন্যে।

পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে গরম কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা আর কর্নেল রেজনিক। গনগনে আগুনে গোটা কামরাটা গরম হয়ে উঠেছে।

'আপনি যা বলতে চাইছেন, তার তাৎপর্য কি আকার নিতে পারে ভেবে দেখেছেন, মি. রানা?' চাপা উত্তেজনার সাথে কথা বলছে রেজনিক। 'কোথাও কিছু নেই, আপনি একটা সিরিয়াস ক্রাইমের কথা বলছেন, কোন প্রমাণ ছাড়াই...'

'আরে থামুন,' হেসে উঠে বলল রানা। 'আপনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, আমি যেন গোটা ইউ. এস. এয়ারফোর্সের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছি। আমাকে ভুল বুঝবেন না, কর্নেল। এখনও কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমার। আর প্রমাণের কথা যদি বলেন, একজন ফোরেনসিক প্যাথোলজিস্ট লাশটা পরীক্ষা করেই বলে দেবে ওটা মার্ডার। কার্গো হোল্ডের কঙ্কালটা ছাব্বিশ বছর আগে প্লেনের ক্রুদের সাথে মারা যায়নি, এই কথার ওপর আমার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় বাজি রাখতে পারি আমি।'

'এতটা নিশ্চিত হবার পিছনে নিশ্চয় কিছু যুক্তি আছে আপনার?'

'কয়েকটা ব্যাপার মিলছে না,' বলল রানা 'আমাদের রহস্যময় প্যাসেঞ্জারের হাড়ে এখনও মাংস রয়েছে। অথচ আড়াই দশক আগেই ক্রুদের হাড় থেকে খসে পড়ে গেছে সমস্ত মাংস। আমার বিশ্বাস, প্লেন দুর্ঘটনার অনেক বছর পরে মারা গেছে এই লোকটা। রিঙের সাথে তার হাত-পা বাঁধা দেখে এসেছি। এরপরও সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে?'

সিগারেট ধরাল কর্নেল রেজনিক। চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার। 'বেশ! এবার দেখা যাক, বাস্তব সত্য হিসেবে কি কি পাচ্ছি আমরা। টেবল লেকে আমরা একটা প্লেন আবিষ্কার করেছি, যার সিরিয়াল নাম্বার সাত-পাঁচ-চার-পাঁচ-তিন।

এখানে এটার থাকার কথা নয়, তবু আছে।

'এবং আমরা মোটামুটি ঝুঁকি না নিয়েই ধরে নিতে পারি, ককপিট সীটে যারা বসে আছে তারা সবাই অরিজিনাল ক্রু। অতিরিক্ত লোকটা সম্পর্কে ধরে নেয়া যাক, ভুল করে তার কথা উল্লেখ করা হয়নি রিপোর্টে। প্লেনে হয়তো শেষ মুহূর্তে উঠেছিল সে। এঞ্জিনিয়ারের সাহায্যকারী বা একজন মেকানিকও হতে পারে। দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সে হয়তো নিজেকে কার্গো রিঙের সাথে বেঁধে ফেলেছিল।'

'কিন্তু দু'রকম ইউনিফর্ম কেন, এর কি ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?'

'দুর্ঘটনার অনেক পরে মারা গেছে সে, এর যেমন কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না আপনি, তেমনি দু'রকম ইউনিফর্মের ব্যাপারেও আমি কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছি না।'

'কিন্তু যদি বলি প্লেনের পঞ্চম আরোহীর পরিচয় আমি জানি?'

'হোয়াট?' দু'চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে রানার মুখে কি যেন খুঁজছে রেজনিক। 'আপনার কি মাথা খারাপ হলো, মি. রানা?'

'আমরা যার কেবিনে বসে রয়েছি,' শান্তভাবে বলল রানা, 'লোরা স্মিথের কাকা, চার্লি স্মিথ।'

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল কর্নেল রেজনিক। রানার কথাটা হজম করার চেষ্টা করছে সে। এগিয়ে এসে তার পাশের চেয়ারটায় বসল রানাও। রেজনিকের কাপটা আবার ভরে দিল ও।

'প্রমাণ?' অবশেষে অস্ফুটে জানতে চাইল কর্নেল।

'বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি, বিস্ফোরণ নাড়াচাড়া করতে গিয়ে মারা গেছেন চার্লি স্মিথ। ধ্বংসস্তূপ থেকে একটা বুট আর একটা বুড়ো আঙুল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। একটা খুন ধামা চাপা দেবার কি সুন্দর কৌশল, তাই না? একটা বিস্ফোরণের আয়োজন করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। বিস্ফোরণ ঘটার পরপরই সেখানে নিহত ব্যক্তির একটা বুড়ো আঙুল আর একটা জুতো রেখে এলাম, যা সবাই চিনতে পারবে। এর মধ্যে আমি লাশটা সরিয়ে ফেললাম, এমন একটা জায়গায়, যেখানে কারও চোখ যাবে না। সবাই জানল, লোকটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। দিব্যি গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি, জানি আমাকে ছোঁবার কারও কোন উপায় নেই।'

'আপনি বলতে চাইছেন প্লেনের ওই লোকটার পায়ের একটা বুড়ো আঙুল আর একটা জুতো নেই?'

'সত্যিই নেই,' মৃদু গলায় বলল রানা।

তৈরি হতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল বেনের। পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে সে, কথার সাথে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া।

'ফোল্ডারের কাভারটা মোটা চামড়ার বলে আড়াই দশক পানিতে ডুবে থাকার পরও প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে,' রানাকে রিপোর্ট করছে বেন। 'কিন্তু ভেতরের কাগজগুলো পচে নরম কাদা হয়ে গেছে। লেখাগুলো প্রায় সবই অদৃশ্য, দুনিয়ার কোন ল্যাবরেটরি সেগুলোকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। ছয়টার

মধ্যে তিনটে পাতার অবস্থা জঘন্য, একটা অক্ষরও অবশিষ্ট নেই। চার নম্বর পাতাটা দেখে মনে হয়, এটাতে আবহাওয়ার তথ্য ছিল। ছাড়া ছাড়া ভাবে দু'একটা জায়গায় বাতাস, অলটিচ্যুড, আর অ্যাটমোসফেরিক টেম্পারেচার, এই শব্দগুলো দেখতে পাচ্ছি। একটা মাত্র বাক্যের অংশবিশেষ ডিসাইফার করতে পেরেছি আমি, সেটা হলো: "পশ্চিম ঢালের পিছনে পরিষ্কার হয়ে আসছে আকাশ"।'

'পশ্চিম ঢাল বলতে কলোরাডো রকিকে বোঝায়,' বলল রানা।

খপ্ করে টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরল কর্নেল। 'গড! এ কথার মানে কি বুঝতে পারছেন না আপনারা?'

'মানে, এয়ারফোর্সের রিপোর্টে যাই বলা হোক, ফাইভ-থ্রীর ফ্লাইট ক্যালিফোর্নিয়া থেকে শুরু হয়নি,' বলল রানা। 'ক্রুরা কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের আবহাওয়া সম্পর্কে মাথা ঘামিয়ে থাকলে, প্লেনটা অবশ্যই পুবদিক থেকে রওনা হয়েছিল।'

'চার নম্বর ডাটা শীটে আর কিছু নেই,' বলল বেন। 'আরগুলোর তুলনায় পাঁচ নম্বর শীটটাকে তথ্যের ডিপো বলতে পারো। মাঝেমধ্যে কয়েকটা অক্ষর নেই, কিন্তু সেগুলো বুদ্ধি থাকলে পূরণ করে নেয়া সম্ভব। অক্ষত অবস্থায় দু'জন ক্রুর নাম পাচ্ছি এতে। এবার শূন্যস্থান পূরণের কাজে হাত দিতে হয়। এদিকে দেখো।'

পাঁচ নম্বর শীটের এক জায়গায় একটা আঙুল রাখল বেন, রানা আর রেজনিক সেদিকে ঝুঁকে পড়ল। লেখা রয়েছে:

A rc ft omm nd r: Ma r V n J ns n.

'শূন্যস্থানগুলো পূরণ করলে কি দাঁড়ায়?' বলল বেন। 'এয়ারক্রাফট কমাণ্ডার মেজর ভ্যান জনসন। ঠিক?'

'ঠিক,' বলল রানা। শীটের আরেক জায়গায় আঙুল রাখল ও। 'এখানে কয়েকটা অক্ষর বসিয়ে নিলে আমরা ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার-এর পদ আর নামটা পাচ্ছি।'

'মাস্টার সার্জেন্ট জো,' শূন্যস্থান পূরণ করে পড়ে গেল বেন। 'পরবর্তী লাইনগুলো পড়া যাচ্ছে না, তবে ধরে নেয়া যায়, অন্যান্য ক্রুদের পদ আর নাম ছিল ওই সব জায়গায়। তারপর আমরা কি দেখছি?' নিচের একটা লাইনের ওপর আঙুল রাখল সে।

ode n me:ext 53

'ক্লাসিফায়েড কল সাইন,' বলল রানা। 'সিকিউরিটি ফ্লাইটের প্রত্যেক এয়ারক্রাফটে থাকে একটা করে। সাধারণত একটা নাউনের সাথে প্লেনের নাম্বারের শেষ দুটো সংখ্যা যোগ করা হয়।'

নির্ভেজাল শ্রদ্ধার সাথে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কর্নেল রেজনিক। 'এসব আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

'কারও মুখে শুনেছি, ঠিক মনে পড়ছে না,' প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল রানা।

'এখানে তাহলে আমরা পাচ্ছি—কোড নেম: কিছু একটা ফাইভ-থ্রী। এই কিছু একটা, কি এটা?'

'কোন্ নাউনের মাঝখানেই এক্স এবং টি আছে?' বলল রেজনিক।

'টি-র পরের অক্ষর দুটো ও এবং এন হবার সম্ভাবনা।'

'সেক্সটন?' বলল রানা।

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রী,' উৎসাহের সাথে সায় দিয়ে বলল রেজনিক। 'ওয়াণ্ডারফুল! সেক্সটন না হয়েই যায় না।'

'পাঁচ নম্বর শীটের শেষ ধাঁধাটা হলো,' বলল বেন, 'ই-র‍্যাঙ্ক-এ, রঙ্গেলো জিরো-সিক্স-জিরো র‍্যাঙ্ক।'

'এস্টিমেটেড টাইম অব অ্যারাইভাল, সিক্স ইন দ্য মর্নিং অ্যাট রঙ্গেলো,' তর্জমা করল কর্নেল, চেহারায় এখনও বিস্ময় ফুটে রয়েছে তার। 'রঙ্গেলো? সেটা আবার কোন্ নরকে? সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর গন্তব্যস্থান ছিল হাওয়াই! অথচ এখানে দেখা...'

'আমি যা দেখতে পাচ্ছি তাই পড়ে শোনাচ্ছি আপনাকে, নিজের মন থেকে তো আর...'

বেনকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রানা, 'ছয় নম্বর শীটে কিছু নেই?'

'নেই মানে? তিন তিনটে লাইন রয়েছে। কিন্তু একটা ডেট আর নিচের দিকে একটা সিকিউরিটি ক্লাসিফিকেশন ছাড়া বোধগম্য নয় কিছু। এই যে, দেখো।'

rders d te anu ry 2 , 954
Aut or s d y: j k en on ot
TO SE R T COD 1A

অক্ষরগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়েছে কর্নেল। অর্থ উদ্ধার করতে বেগ পেতে হচ্ছে না তাকে। বলল, 'প্রথম লাইনটা এইরকম—"অর্ডারস্ ডেটেড জানুয়ারি, দিনের তারিখটা বিশ থেকে উনত্রিশ তারিখের মধ্যে যে-কোন একটা হতে পারে, নাইনটিন-ফিফটি-ফোর"।'

'দ্বিতীয় লাইনটা সম্ভবত, "অথোরাইজড্ বাই", কিন্তু অফিসারের নামটা পড়ার কোন উপায় নেই। তবে পদটা যে জেনারেল, তা বোঝা যাচ্ছে।'

'তারপর আসছে—"টপ-সিক্রেট কোড ওয়ান-এ", গুরুত্বের মাত্রা বোঝাবার জন্যে এর চেয়ে বড় কোন কোড নেই আর,' বলল বেন।

'তাহলে ধরে নিতে হয়,' বলল রানা, 'হয় পেন্টাগন নয় হোয়াইট হাউসের অথবা দু'পক্ষেরই কোন একজন কর্তাব্যক্তি সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর আসল ব্যাপার ধামাচাপা দেবার জন্যে ভুয়া একটা অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট তৈরি করেছিল।'

'এমন বিদঘুটে, সৃষ্টিছাড়া কথা আমার জীবনে আমি শুনিনি,' বলল কর্নেল রেজনিক। 'রুটিন ফ্লাইটের একটা সাধারণ এয়ারক্রাফট সম্পর্কে মিথ্যে রিপোর্ট তৈরি করার পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?'

'বাস্তবের মুখোমুখি হোন, কর্নেল,' বলল রানা। 'সেক্সটন ফাইভ-থ্রী সাধারণ কোন প্লেন ছিল না। আপনাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, সানফ্রান্সিসকোর কাছাকাছি ট্রাভিজ এয়ারফোর্স বেস থেকে রওনা হয়ে হাওয়াইয়ের হিকাম ফিল্ডে নামার কথা ফাইভ-থ্রীর। কিন্তু এখন আমরা জানি, সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর গন্তব্যস্থান ছিল রঙ্গেলো নামে একটা জায়গা।'

মাথার পিছনটা চুলকাচ্ছে বেন, বলল, 'রঙ্গেলো নামে কোন জায়গা আছে

বলে কখনও আমি শুনিনি।'

'শুনেছি বলে আমারও মনে পড়ছে না,' বলল রানা। 'তবে ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস খুললেই জানা যাবে।'

'সব মিলিয়ে কি আমরা পেলাম তাহলে?' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে জানতে চাইল কর্নেল।

'খুব বেশি কিছু না,' স্বীকার করল রানা। 'উনিশশো চুয়ান্ন সাল। জানুয়ারির শেষদিকের ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুব অথবা মধ্যপশ্চিম এলাকার কোথাও থেকে একটা সি-নাইনটি-সেভেন-এর টপ সিক্রেট ফ্লাইট শুরু হয়। কিন্তু কলোরাডোর ওপর আসার পর যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়, আর কোন উপায় না দেখে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় ল্যাণ্ড করার সিদ্ধান্ত নেয় পাইলট। ভাগ্যগুণেই হোক আর পাইলটের দক্ষতার গুণেই হোক, ফাঁকা একটা জায়গা দেখতে পেয়ে সেখানে প্লেনটাকে নামিয়ে আনে সে। মনে রাখতে হবে, সময়টা ছিল জানুয়ারি। কলোরাডো রকির সমস্ত এলাকা ছিল বরফে ঢাকা। ফাঁকা মাঠ মনে করে পাইলট মেজর ভ্যান জনসন প্লেনটাকে যেখানে নামিয়ে আনে সেটা ছিল একটা বরফ ঢাকা লেক।'

'কাজেই প্লেনটা স্থির হয়ে দাঁড়াবার পর তার ওজন যখন চেপে বসল, দু'ফাঁক হয়ে গেল বরফ, সেই ফাঁক গলে নিচে নেমে গেল স্ট্রাটোক্রুজার,' বলল কর্নেল রেজনিক।

'ঠিক তাই। বিধ্বস্ত প্লেনের ভেতর হুড়হুড় করে ঠাণ্ডা হিম পানি ঢুকে পড়ে, ক্রুরা নড়াচড়ার সময়ও পায়নি, যে যার সীটে বসে মারা যায়। দুর্ঘটনাটা কেউ দেখতে পায়নি, লেকের ওপরের ফাটলটা খানিক পরই আবার জোড়া লেগে যায়। সেজন্যেই ব্যাপক তল্লাশী চালিয়েও প্লেনের কোন সন্ধান করা সম্ভব হয়নি। পরে ভুয়া একটা অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট তৈরি করে সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর গোটা ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়া হয়। এবং সবাই তার কথা ভুলে যায়।'

'চমৎকার!' বলল বেন। 'সাথে বাস্তব প্রমাণ ইত্যাদি না থাকলে গাঁজা বলে হেসেই উড়িয়ে দিতাম আমি। কিন্তু এর মধ্যে চার্লি স্মিথ আসছেন কোন্‌খানে? কিভাবে?'

'মাছ ধরার সময় নিশ্চয়ই তার বড়শিতে অক্সিজেন ট্যাংকটা আটকে যায়,' বলল রানা। 'তার রক্ত-মাংসের সাথে মিশে ছিল আবিষ্কারের নেশা, অক্সিজেন ট্যাংকটা বড়শির সাথে উঠে আসার পর সাংঘাতিক কৌতূহলী হয়ে লেকের পানিতে ডুব দেয় সে। এবং আগেই ভেঙে থাকা নোজ গিয়ারটা কেটে ওপরে তুলে আনে।'

'চার্লি স্মিথ খুন হয়েছে এ-কথা যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই,' বলল কর্নেল, 'কোন মোটিভ আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

মুখ তুলে কর্নেলের দিকে তাকাল রানা। 'একজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নেবার পিছনে কোন উদ্দেশ্য না থেকে পারে না। আপনি কার্গোর কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

'ঠিক!' চেঁচিয়ে উঠল বেন। 'কার্গো একটা মোটিভ হতে পারে। হাইলি

ক্লাসিফায়েড ফ্লাইট ছিল ওটা। কি কার্গো বহন করছিল সে তা আমরা জানি না, কিন্তু সেটা যে সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ সে-ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। অন্তত মার্ডার করার জন্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।'

এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে কর্নেল। 'এতই যদি মূল্যবান হবে কার্গো, সেটা তাহলে চার্লি স্মিথ বা তার খুনী উদ্ধার করেনি কেন? মি. রানা আগেই বলেছেন, সমস্ত কার্গো এখনও প্লেনের সাথে রয়েছে।'

'কার্গো আছে বলেছি,' মৃদু গলায় বলল রানা, 'সবটা আছে তা বলিনি। কতটুকু কি ছিল তা না জেনে কিভাবে বলব সবটা আছে কি নেই!'

'পরবর্তী প্রশ্ন?' গলা পরিষ্কার করে জানতে চাইল বেন।

'বলো।'

'কি আছে মেটাল ক্যানগুলোয়?'

'তারিখটা মনে রাখতে হবে,' বলল রানা। 'উনিশশো চুয়ান্ন সাল। গোপন একটা মিশন নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে যাচ্ছিল সেক্সটন ফাইভ-থ্রী। তার কার্গো ছিল বড় সিলিণ্ডার আকৃতির অনেকগুলো মেটাল ক্যান। ওই সময়...'

'হ্যাঁ, তুমি কি বলতে চাইছ বুঝতে পেরেছি আমি,' রানাকে বাধা দিয়ে দ্রুত বলল বেন, 'ওই সময় বিকিনিতে নিউক্লিয়ার বোমা টেস্ট করা হচ্ছিল।'

চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল কর্নেল রেজনিক। কয়েক সেকেণ্ড পাথরের মত স্থির হয়ে বসে থাকল সে। তারপর জানতে চাইল, 'আপনারা কি বলতে চাইছেন সেক্সটন ফাইভ-থ্রী নিউক্লিয়ার ওয়র হেড বহন করছিল?'

অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে রানাকে। কর্নেলের প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু দেরি করল ও। 'জোর করে কিছু আমি বলতে চাইছি না, কর্নেল। আমি শুধু সম্ভাবনার কথা বলছি। সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর সন্ধান পাবার পর কয়েকটা প্রশ্ন না জেগে পারে না। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের এয়ারফোর্স তাদের একটা হারিয়ে যাওয়া প্লেনের সমস্ত তথ্য গোপন করার জন্যে ভুয়া একটা রিপোর্ট কেন পরিবেশন করল? প্লেনের ক্রুরা কেন নিয়েছিল মৃত্যুর ঝুঁকি? প্যারাস্যুট ব্যবহার করে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা না করে কেন তারা প্লেন নিয়ে দুর্গম লোকবসতিহীন এলাকায় নামল?'

'কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মি. রানা,' বলল কর্নেল, 'কার্গোটা নিউক্লিয়ার ওয়রহেড হলে সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা কখনোই ত্যাগ করত না সরকার।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'ওখানেই রহস্য জট পাকাচ্ছে। দেশের অর্ধেকটা ধ্বংস করতে পারে এমন একটা কার্গোকে আবহাওয়া দূষিত করতে দেবার জন্যে ফেলে রাখতে পারে না কেউ। কিন্তু সেই সাথে এ-কথাও মনে রাখতে হবে, প্লেনটা খুঁজে বের করার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়নি। তবে সার্চ বন্ধ করাটা সত্যিই অদ্ভুত।'

হঠাৎ নাক টেনে কি যেন শুঁকল কর্নেল। 'কিসের গন্ধ পাচ্ছি?'

ব্যস্ততার সাথে উঠে দাঁড়াল বেন, ছুটে গেল স্টোভটার দিকে। 'মেটাল প্লেটটা বোধহয় পুড়ে যাচ্ছে।'

'কি দিয়ে ফোটাচ্ছিলেন ওটা?' জানতে চাইল কর্নেল।

'ভিনিগার আর বেকিং সোডা। হাতের কাছে আর কিছু ছিল না...'

'মরচে আর রঙের দাগ তাতে উঠবে?'

'বলতে পারি না। আমি কেমিস্ট নাকি? তবে কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।'

হতাশায় একটা হাত ছুঁড়ে রানার দিকে ফিরল কর্নেল, বলল, 'ভুলটা আমারই। প্রফেশনাল ল্যাব টেকনিশিয়ানদের জন্যে প্লেটটা নিজের কাছে রেখে দেয়া উচিত ছিল আমার।'

কর্নেলের মন্তব্য শান্তভাবে অগ্রাহ্য করে একটা চিমটে দিয়ে ফুটন্ত পানি থেকে মেটাল প্লেটটা তুলে ফেলল বেন। তোয়ালে দিয়ে মুছে আলোর সামনে তুলল সেটাকে। নানাভাবে ঘুরিয়ে দেখছে।

'কি দেখছ?' জানতে চাইল রানা।

ওদের সামনে টেবিলের ওপর মেটাল প্লেটটা রাখল বেন। বুক ভরে শ্বাস নিল, চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে। 'একটা লক্ষণ,' উত্তেজিতভাবে বলল সে। 'রেডিও অ্যাক্টিভিটির লক্ষণ।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল ওরা।

ছয়

চেসাপীক বে। ইউ.এস.এ.। নভেম্বর, উনিশশো আশি।

ভোর হতে আর দু'ঘণ্টা বাকি। ফর্বস্ মেরিন স্ক্র্যাপ অ্যাণ্ড স্যালভেজ কোম্পানী। আলোকিত গেটের সামনে প্রকাণ্ড নীল ডিমের মত একটা ক্যাডিলাক এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে প্রিন্সের মত চেহারা নিয়ে নামল এক লোক। শরীরটা বিশাল, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল। আয়ত দুই চোখে ক্ষুরধার বুদ্ধির ঝিলিক। অন্ধকারে অদ্ভুত একটা জ্যোতি ছড়াচ্ছে যেন চেহারাটা। কাঠের পা, কিন্তু কোন জড়তা বা আড়ষ্ট ভাব নেই হাঁটার মধ্যে, সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে গেটের দিকে হেঁটে আসছে সে।

পোর্টেবল টিভি সেট দেখছে ইউনিফর্ম পরা গার্ড। মস্ত একটা হাই তুলে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করল সে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। গেট হাউজের খিলান-আকৃতির জানালা দিয়ে ছোট একটা ফোল্ডার ঢুকিয়ে দিল বিশালদেহী আগন্তুক। হাত বাড়িয়ে নিয়ে সেটার ওপর চোখ বুলাল গার্ড। এক নিমেষে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার, চেহারায় শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। পরিচয়পত্রটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল সে, 'ওয়েলকাম টু আমেরিকা, ক্যাপ্টেন। আমাদের ডিরেক্টর আপনাকে আশা করছেন।'

'জাহাজটা এখানে?' ভারী, গম্ভীর গলায় জানতে চাইল আগন্তুক। 'দেখতে পাব?'

'জ্বী, স্যার। পুব ডকে নোঙর করা আছে,' সমীহের সাথে বলল গার্ড। জানালা দিয়ে স্যালভেজ এলাকার একটা ম্যাপ গলিয়ে দিল সে। 'দেখেশুনে পা ফেলবেন,

স্যার। এনার্জি রেশনিং-এর জন্যে ইয়ার্ডের আলো নিভিয়ে রাখা হয়েছে।'

উত্তর না দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল আগন্তুক।

প্রকাণ্ড ডেরিক-এর নিচে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে সে। বাতাসে টার, তেল আর লবণের গন্ধ। ডকে পৌঁছে মানুষজনের খোঁজে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে সে। নাইট ক্রুরা অনেক আগেই যে যার বাড়ি ফিরে গেছে। শুধু একটা বুড়ো সী-গাল কাঠের পিলারের মাথায় বসে গলাটাকে লম্বা করে দিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

আরও একশো গজ এগিয়ে থামল সে। জেটির পাশে প্রকাণ্ড একটা কালো পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে জাহাজটা। গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে ওপরে উঠল সে। ডেক ধরে হাঁটছে। অস্বাভাবিক লম্বা ডেক, শেষ হতে চায় না। সামনে ব্রিজ।

একসময় বে-র পুব দিক থেকে সূর্য উঠল। বিশাল জাহাজটার আসল চেহারা ফুটে উঠল দিনের আলোয়। রঙ চটে গেছে, জায়গায় জায়গায় মরচে আর ঝালাইয়ের উৎকট দাগ। কিন্তু এসব কিছুই চোখে পড়ল না আগন্তুকের, বা চোখে পড়লেও গ্রাহ্য করল না। জাহাজটা তার উদ্দেশ্য পূরণ করবে, এটুকু বুঝতে পেরেই সন্তুষ্ট সে। ব্রিজে দাঁড়িয়ে রেইলিংয়ের গায়ে হালকা ভাবে হাত বুলাচ্ছে কবীর চৌধুরী, নির্জন ডেকের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করছে, 'ঠিক তোমাকেই আমার দরকার।'

ওয়াশিংটন ডি. সি.। নভেম্বর।

পেন্টাগন। কর্নেল রেজনিক সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর আবিষ্কার সম্পর্কে রিপোর্ট করার পর পুরো একটা হপ্তা কেটে গেছে। কর্তৃপক্ষ অবহেলা আর উদাসীনতার সাথে সাতটা দিন কাটিয়ে দিয়ে আজ ডেকে পাঠিয়েছে কর্নেলকে, তাও ব্যাপারটা গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে নয়, আনুষ্ঠানিকভাবে হেসে উড়িয়ে দেবার জন্যে। কর্মকর্তাদের সামনে বসে নিষ্ফল রাগে মনে মনে ফুঁসছে রেজনিক, সেই সাথে নিরাশায় কালো হয়ে যাচ্ছে তার চেহারা।

কনফারেন্স রুমে মাত্র তিনজন লোক উপস্থিত। চীফ অব-এয়ারফোর্স সেফটি, জেনারেল হোমার। জয়েন্ট চীফ অব-স্টাফ-এর সহকারী জেনারেল জন করিডন। এদের সামনে আসামীর চেহারা নিয়ে বসে আছে কর্নেল রেজনিক। জেনারেলদের সামনে ভিডিওটেপের মধ্যে সমস্ত প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু তবু তাঁরা নিমজ্জিত প্লেনের কোন গুরুত্ব আছে বলে স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁরা বলতে চাইছেন, ফাইভ-থ্রীকে উদ্ধার করলে খবরের কাগজগুলোকে মহা হৈ-চৈ শুরু করার একটা সুযোগ দেয়া হবে শুধু, আর কোন লাভ হবে না। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে কর্নেল রেজনিক।

'কিন্তু স্যার, ওদের পরিবার-পরিজন?' অবশেষে প্রতিবাদ জানাল কর্নেল। 'লাশগুলো পাওয়া গেছে এ-কথা তাদেরকে না জানানো একটা ক্রাইম।'

'মাথা ঠাণ্ডা করুন, কর্নেল। পুরানো ক্ষত খুঁচিয়ে দিয়ে কি উপকার করতে চান আপনি তাদের? ক্রুদের মা-বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, ধরে নেয়া যায়। স্ত্রীদের বিয়ে হয়েছে আবার। ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়েছে নতুন বাবার কাছে। তাদের বর্তমান জীবনটা শান্তিতে কাটুক, সেটাই কি কাম্য হওয়া উচিত নয় আমাদের?'

'কিন্তু কার্গোর ব্যাপারটা কি হবে?' কর্নেল বলল, 'সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর কার্গো নিউক্লিয়ার ওয়রহেড কিনা…'

'সমস্ত ব্যাপারটা আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে দেখেছি,' তীক্ষ্ণ গলায় বললেন জেনারেল জন করিডন। সমস্ত মিলিটারি স্টোরহাউজ রেকর্ড কমপিউটরের সাহায্যে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে, কোথাও থেকে কোন ওয়রহেড হারায়নি, বা সংখ্যায় কমে যায়নি। হিরোশিমায় ফেলা বোমাটা থেকে ধরে আজ পর্যন্ত যত আণবিক বোমা তৈরি হয়েছে, প্রত্যেকটির হিসাব আছে আমাদের। সেই হিসেবে কোন গরমিল নেই।'

'কিন্তু স্যার, আমরা সবাই জানি, নিউক্লিয়ার ওয়রহেড কোথাও পাঠাবার সময় স্টেইন-লেস স্টীলের ক্যানে ভরে পাঠানো হত, আজও তাই হয়…'

'কিন্তু কর্নেল, আপনি কি একথা একবারও ভেবেছেন, যে-ক্যানগুলোর কথা আপনি বলছেন সেগুলো খালিও হতে পারে?'

মাথাটা ঝুঁকে পড়ল কর্নেলের, হতাশায় কালো হয়ে গেছে চেহারা, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। প্রধান একজন ইনভেস্টিগেটর নয়, কর্মকর্তারা তাকে মায়ের কোলের শিশু বলে মনে করছে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা কর্নেলের। এই রকম আচরণ আশা করেনি সে।

'তাছাড়া, প্রশান্ত মহাসাগরে নিখোঁজ হয়ে গেছে যে প্লেনটা, টেবল লেকের ওটা যদি সেটাই হয়ে থাকে,' বললেন জেনারেল হোমার, 'তাহলে গোটা ব্যাপারটাকে চেপে যাওয়াই সবদিক থেকে ভাল হবে।'

'স্যার?'

'প্লেনের কোর্স। রিপোর্টের সাথে বাস্তবের আকাশপাতাল তফাৎ। নিশ্চয়ই এর পিছনে গুরুতর কোন কারণ আছে। যা হয়তো এয়ারফোর্স প্রকাশ করতে চায় না। ভেবে দেখুন, নির্ধারিত কোর্স থেকে উল্টোদিকে একহাজার মাইল সরে যাওয়ার কি মানে হতে পারে? হয় ক্রুরা প্লেনটাকে চুরি করার মতলব ফেঁদেছিল, নাহয়…গড নোজ!'

'কিন্তু ফ্লাইট অর্ডার নিশ্চয়ই কেউ অথোরাইজ করেছিল,' হতভম্ব দেখাচ্ছে কর্নেলকে।

'তা করেছিল,' বললেন জেনারেল জন করিডন। 'ক্যালিফোর্নিয়া, ট্রাভিজ এয়ারফোর্স বেস থেকে একজন কর্নেল, কর্নেল ফচেট অরিজিনাল অর্ডারটা ইস্যু করেছিল।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রেজনিক। 'ফ্লাইট অর্ডার সাধারণত কয়েকমাসের বেশি ফাইলে রাখা হয় না, এটা ছাব্বিশ বছর ধরে রেখে দেয়া হয়েছে কেন?'

জেনারেল জন করিডন তাঁর মস্ত একটা কাঁধ ঝাঁকালেন। 'কেন, তা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, কর্নেল। কিন্তু কথাটা সত্যি। ট্রাভিজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসে পুরানো ফাইলে সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর শেষ ফ্লাইট অর্ডার পাওয়া গেছে।'

'আর ফাইভ-থ্রীর ধ্বংসাবশেষ থেকে যে অর্ডারটা পাওয়া গেছে?'

'বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কোন লাভ নেই, কর্নেল,' বললেন জেনারেল হোমার। তাঁর ক্লিনশেভড মুখে রাগের ভাব। ঘনঘন পাইপে টান দিয়ে মুখের সামনে

ধোঁয়ার একটা মেঘ সৃষ্টি করলেন তিনি। কলোরাডো লেক থেকে যে কাগজগুলো উদ্ধার করেছেন আপনি, তা ডিসাইফার করার উপযুক্ত নয়। অনুমান করে একটা মনগড়া অর্থ দাঁড় করালেই তো আর হলো না। ওখানে যা লেখা নেই, আপনি তাই পড়ছেন।'

'আমি যতটুকু বুঝি,' জেনারেল জন করিডন চকচকে টাকে হাত বুলাচ্ছেন, 'সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর কোর্স সম্পর্কে যে রহস্য রয়েছে তা একটা মৃত বিষয়।' জেনারেল হোমারের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনি আমার সাথে একমত, জেনারেল?'

'সম্পূর্ণ।'

জেনারেল জন করিডন তীব্র দৃষ্টি হানলেন কর্নেল রেজনিকের দিকে। 'আমাদের সামনে দাখিল করার মত আর কিছু আছে আপনার, কর্নেল?'

কর্মকর্তারা বসে আছেন, অপেক্ষা করছেন একটা উত্তরের জন্যে। কর্নেল জানে, এঁদেরকে কিছু বলা না বলা সমান। সে তার শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আছে, মাথার ওপর ধারাল তলোয়ারের মত ঝুলছে অবাধ্যতার অভিযোগ। এদের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে সব ঠিক থাকবে, তা নাহলে মাথার ওপর নেমে আসবে তলোয়ারটা। এঁরা তাকে সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর সব কথা ভুলে যেতে বলছেন। এয়ারফোর্সে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে, তার প্রতি একটুও যদি মায়া থাকে, সব কথা ভুলে যেতে হবে তাকে।

ওয়াশিংটন ডি. সি.। হোয়াইট হাউস।

পিছনের মাঠে এক ডজন বল নিয়ে খেলছেন প্রেসিডেন্ট। মাত্র পাঁচ ফুট দূরে একটা কাপ, কিন্তু একটা বলও তাতে ফেলতে পারছেন না। আপন মনে মনে হাসছেন তিনি, ভাবছেন গলফ তাঁর খেলা নয়। টেনিস কিংবা হ্যাণ্ডবলের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক চ্যালেঞ্জ তিনি বুঝতে পারেন, কিন্তু নিজের নৈপুণ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মধ্যে কৃতিত্বটা কোথায়, ভেবে পান না তিনি।

'এখন আমি তৃপ্তির সাথে মরতে পারি, কারণ সবই আমার দেখা হয়েছে।'

সিধে হয়ে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স চার্লস উইলসনের দিকে তাকালেন। হাসছেন উইলসন।

একহারা চেহারার ছোটখাট মানুষ সেক্রেটারি উইলসন, সদা প্রফুল্ল, সবার প্রিয়।

'বুঝলে উইলসন,' বিষণ্ণ একটু হেসে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'আমার হাতে এই যে প্রচুর সময় দেখতে পাচ্ছ, এ থেকেই প্রমাণ হয় প্রেসিডেন্ট হবার পর কাজ করার সুযোগ নেই আমার।'

'আজ আপনাকে একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, স্যার,' বললেন সেক্রেটারি অব ডিফেন্স। 'আপনার তো খুশি হবার কথা, ইলেকশনে আপনার পার্টি আর আপনার লোকেরা জিতেছে।'

'ইলেকশনে কেউ আসলে জেতে না কখনও,' প্রেসিডেন্ট একটু গম্ভীর হলেন। 'কি ভাবছ তুমি, উইলসন?'

'রকিতে যে পুরানো প্লেনটা পাওয়া গেছে,' উইলসন বললেন, 'ওটার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে নিষেধ করে দিয়েছি আমি সবাইকে।'

'বোধহয় ভালই করেছ।'

'অদ্ভুত একটা ব্যাপার,' বললেন উইলসন। 'এয়ারফোর্স ফাইলের ওই বানোয়াট ফ্লাইট প্ল্যান ছাড়া ক্রুদের সত্যিকার মিশন সম্পর্কে কোথাও কোন তথ্য বা সূত্র নেই।'

'হুঁ,' অবশেষে কাপে একটা বল ফেলতে পেরেছেন প্রেসিডেন্ট। 'লেকের তলায় পড়ে ঘুমাতে দাও ওটাকে। নিজের শাসনকালে আইসেনহাওয়ার যদি উত্তরটা মাটি চাপা দিয়ে রাখতে বাধ্য হয়ে থাকেন, আমি কোন্ সাহসে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করতে যাব?'

'আমার ইচ্ছে, লাশগুলো উদ্ধার করে সামরিক মর্যাদায় দাফন করি। এইটুকু ওদের প্রাপ্য।'

'বেশ। কিন্তু কোনরকম পাবলিসিটি নয়।'

'এয়ারফোর্সের যে লোকটা চার্জে আছে তাকে আমি এ-ব্যাপারে সাবধান করে দেব।'

প্রেসিডেন্ট ঘুরে দাঁড়ালেন। রুমাল দিয়ে হাত মুছছেন তিনি। ধীরে ধীরে হাঁটছেন তাঁর একজিকিউটিভ অফিসের দিকে। 'কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি, অনুমান করতে পারো কিছু, উইলসন? উনিশশো চুয়ান্ন সালে কি গোপন করার চেষ্টা করেছিলেন আইসেনহাওয়ার?'

'গত কয়েক দিন ধরে সারারাত জেগে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি আমি,' সেক্রেটারি অব ডিফেন্স চার্লস উইলসন বললেন, 'পাইনি।'

লাঞ্চের সময়। কটনউড ইনে প্রচণ্ড ভিড়। খালি টেবিলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন। ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে কর্নেল রেজনিক। তাকে দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল রানা।

'এই ভিড়ে আপনাকে খুঁজে পাব কিনা ভাবছিলাম,' রানার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল রেজনিক।

একজন ওয়েট্রেস এসে দাঁড়াল টেবিলের পাশে, ভি-কাট ব্লাউজের ভেতর বুকের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। 'এ মার্টিনি অন দি রক,' বলল রেজনিক। 'না, ডবল বানাও ওটাকে।'

ওয়েট্রেস চলে গেল।

রেজনিকের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'ব্যাপার কি? পেন্টাগন কর্মকর্তারা ধমকে দিয়েছে নাকি?'

ধীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রেজনিক। 'আমার রিপোর্টের প্রতিটি শব্দ অর্থহীন বলে রায় দিয়েছে ওরা।'

'আপনি সিরিয়াস?'

'ন্যাংটো করে মারতে বাকি রেখেছে শুধু।'

'সে কি! তা কিভাবে সম্ভব? পাঁচ নম্বর লাশ আর মেটাল ক্যানগুলোর ব্যাপারে

গুরুত্ব না দিয়ে পারে কিভাবে?'

'ক্যানগুলো নাকি খালি। আর চার্লি স্মিথের কথা তুলিনি আমি। তুললে কোন ফল হত না। ওরা আমার কোন কথা শুনতে রাজি নয়।'

'আপনি তাহলে ইনভেস্টিগেশন থেকে সরে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, যদি একজন জেনারেল হিসেবে অবসর নিতে চাই,' গম্ভীর গলায় বলল রেজনিক।

'ওরা আপনাকে হুমকি দিয়েছে নাকি?'

'মুখ ফুটে উচ্চারণ করার দরকার হয়নি,' বলল রেজনিক। 'ওদের চোখেই তা ফুটে উঠেছিল।'

'এখন তাহলে কি হবে?' জানতে চাইল রানা। নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও। কপালে চিন্তার রেখা।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে রেজনিক। 'আশা করি আপনি একাই চালিয়ে যেতে পারবেন।'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে নিঃশব্দে।

কয়েক মুহূর্ত পর রানাই প্রথম কথা বলল, 'আপনি চান প্লেনটাকে আমি টেবল লেক থেকে তুলি?'

'কেন নয়!'

'কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, সেক্সটন ফাইভ-থ্রীকে তোলার জন্যে বিশজন ক্রু, কয়েক ট্রাক ভর্তি ইকুইপমেন্ট, কমপক্ষে দু'হপ্তা সময় আর প্রায় চার লাখ মার্কিন ডলার লাগবে। এতসব যোগাড় করা এখুনি আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নুমা-র ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে বলে হয়তো দেখতে পারি, কিন্তু তিনি আমাকে এত বড় একটা প্রজেক্টে সাহায্য করতে পারবেন কিনা বলা মুশকিল। বাজেটের প্রশ্ন আছে।'

'কিন্তু তাই বলে এতদূর এসে হাল ছেড়ে দেবেন আপনি?'

'হাল ছেড়ে দিচ্ছি তা তো আমি বলিনি,' হাসল রানা। 'সরকারের তরফ থেকে তোলা হলে আমার কাজটা সহজ হয়ে যেত, এই আর কি। তবে, তার আগে আরও কয়েকটা ব্যাপারে তদন্ত চালাতে হবে আমাকে।'

'তার মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রেজনিকের।

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর সাথে আরও গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে, কর্নেল,' বলল রানা। 'তা নাহলে ওটাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কোন দরকার ছিল না। তবে যত তাড়াতাড়ি পারি কলোরাডোয় ফিরে যাব আমি। ক্রুদের লাশগুলো...'

'তোলা হবে। সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হবে ওদেরকে। কিন্তু তোলার দায়িত্ব এখনও কাউকে দেয়া হয়নি। সম্ভবত আমাকেই দেয়া হবে। আমি আপনার সাথে যোগাযোগ রাখব।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'ভাল কথা, সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর ফ্লাইট প্ল্যান-এর ব্যাপারটা আপনার কর্তারা কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা কিন্তু বলেননি আমাকে।'

'অরিজিনালটা পেয়েছেন জেনারেল জন করিডন। প্লেন থেকে আমরা যেটা উদ্ধার করেছি তার সাথে ওটার কোন মিল নেই।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, অন্যমনস্ক ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর জানতে চাইল, 'আপনার কাছে জেরোক্স কপির একটা আছে নাকি? আমাকে ধার দেবেন?'
'ফ্লাইট প্ল্যানের?'
'শুধু ছয় নম্বর শীটটা।'
'বাইরে, আমার গাড়িতে আছে। কেন?'
'অন্ধকারে একটা ঢিল ছুঁড়ে দেখতে চাই,' বলল রানা। 'আমার এক বন্ধু আছে এফ. বি.আই.-এ, ধাঁধার উত্তর বের করতে জুড়ি নেই তার।'

সাত

ন্যাশন্যাল আণ্ডার ওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সী-র জাহাজ ভিজালিয়ার কনফারেন্স রূমে বসে মারটিন প্যানজারের সাথে কথা বলছে রানা। নুমার স্যালভেজ মাস্টার মারটিন, প্রকাণ্ড গরিলার মত চেহারা, ক্লিনশেভড, কিন্তু লম্বা কালো চুলে সারা শরীর ঢাকা, সারাক্ষণ চুইংগাম চিবাচ্ছে। নুমার একজন ডিরেক্টর, বেন নেলসন, টেলিফোনে তাকে রানার পরিচয় জানিয়ে নির্দেশ দিয়েছে, ওর সাথে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা করতে হবে। রানাকে অভ্যর্থনা জানাবার সময় একটু গাম্ভীর্য দেখিয়েছিল মারটিন, কিন্তু একটু পরই রানার মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব আর মানুষকে আপন করে নেবার সহজাত গুণ লক্ষ করে কখন যে গাম্ভীর্যের খোলস ছেড়ে শিশুর মত সরল হয়ে উঠেছে, তা নিজেও বলতে পারবে না সে।
'একটা পদ্ধতি হলো ডলিঙ্গার ভ্যারিয়েবল এয়ার ট্যাংক,' রানার প্রশ্নের উত্তরে উৎসাহের সাথে কথা বলে যাচ্ছে মারটিন। 'গভীর পানি থেকে ডোবা জাহাজ তুলতে এর জুড়ি নেই। খোলের পাশে একজোড়া এয়ার ট্যাংক ডুবিয়ে দিন, তারপর ভাল করে বেঁধে নিয়ে বাতাস ভরে ফুলিয়ে নিন। সহজ কৌশল, উনিশশো পনেরো সালে হাওয়াইয়ের কাছে পুরানো সাবমেরিন এফ-ফোরকে এই একই বেসিক প্রিন্সিপালের সাহায্যে তোলা হয়েছিল।'
'কিন্তু বালি সরাবার জন্যে আপনাকে সাকশন পাম্প ব্যবহার করতে হবে না?' জানতে চাইল রানা। 'যত হালকা হবে, ভেঙে যাবার আশঙ্কা তত কমবে, তাই নয় কি? মোটা আয়রন প্লেটগুলো টিকে যাবে বলে মনে হয়, কিন্তু ভারী ওক প্যানেলিংগুলো দীর্ঘদিন পানির নিচে থেকে নিশ্চয়ই পচে যায়।'
'হ্যাঁ, সাকশন পাম্প ব্যবহার করতে হবে,' রানাকে সমর্থন করে বলল মারটিন। 'পুরানো জাহাজ যদি হয়, তাতে কামান ইত্যাদিও থাকে। সেগুলো আমরা সরিয়ে দিয়ে হালকা করে নিই জাহাজটাকে।'
এতক্ষণে নিজের প্রসঙ্গটা পাড়ছে রানা। 'ডলিঙ্গার এয়ার ট্যাংক,' সিগারেট ধরিয়ে বলল ও। 'ডোবা একটা প্লেন তোলার জন্যে কতটুকু উপযুক্ত ওটা?'
চুইংগাম চিবানো বন্ধ হয়ে গেল মারটিনের, ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, 'কত বড়?'

'একশো সত্তর কি আশি হাজার পাউণ্ড, কার্গোসহ।'
'কত গভীর?'
'একশো চল্লিশ ফুট।'
রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে স্যালভেজ মাস্টার, কিন্তু দেখছে যেন বহুদূরের জিনিস। কয়েক মুহূর্ত পর আবার চুইংগাম চিবাতে শুরু করল সে। বলল, 'এক্ষেত্রে আমি ডেরিক ব্যবহার করতে বলব।'
'ডেরিক?'
'স্থির প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো দুটো ডেরিক ওই পরিমাণ বোঝা অনায়াসে তুলতে পারবে,' বলল মারটিন। 'তাছাড়া, প্লেন মানেই ভঙ্গুর জিনিস। আপনি যদি ডলিঙ্গার ট্যাংক ব্যবহার করেন, আর তোলার সময় যদি দুটো ট্যাংক মুহূর্তের জন্যেও একটু উঁচু-নিচু হয় বা নিজেদের পথ থেকে কোনদিকে সরে যায়, প্লেনটা দু'টুকরো হয়ে যেতে পারে।' একটু থেমে প্রশ্ন করল সে, 'কিন্তু এরোপ্লেন আবার ডুবল কোথায়, মি. রানা?'
'কত প্লেনই তো এখানে সেখানে ডুবে আছে,' বলল রানা। 'কে জানে কবে কোন্‌টা তোলার দরকার হতে পারে।'
ঠিক এই সময় একজন ক্রু দরজা খুলে উঁকি দিল, ইঙ্গিতে ওয়ালফোনটা রানাকে দেখিয়ে বলল, 'আপনার একটা শোর-টু-শিপ কল, স্যার।'
উঠে গিয়ে ওয়ালফোনের রিসিভার তুলে নিল রানা। 'হ্যালো?'
'তুমি শালা তুষারমানব হয়ে গেছ নাকি?' অপরপ্রান্ত থেকে ঘড় ঘড়ে একটা গলা ভেসে এল। 'খুঁজে পাই না কেন?'
'কার সাথে কথা বলছি, প্লীজ?'
'লে বাবা,' কৃত্রিম নৈরাশ্যে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা অপরপ্রান্ত থেকে। 'শালার উপকার করার জন্যে সারাটা রাত জেগে কাটালাম, এখন উনি চিনতেই পারছেন না আমাকে!'
'দুঃখিত, পিট,' বলল রানা, হাসছে এখন ও। 'কিন্তু রেডিওফোনে তোমার গলাটা হুবহু সোফিয়া লরেনের মত শোনাচ্ছে, আমার কি দোষ বলো।'
ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন-এর একজন এজেন্ট ডার্ক পিট, রানার অনেক দিনের পুরানো বন্ধু। গতকাল ওর সাথে যোগাযোগ করেছিল রানা।
'তুমি শালা নিশ্চয়ই কোন মিস বিউটিকে নিয়ে পড়ে আছ...' শুরু করল পিট।
তাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রানা, 'আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ?'
'যা জানতে চেয়েছিলে তার চেয়ে আরও কিছু বেশি জানাতে পারব বলে আশা করি।'
'শুনছি।'
'সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর ফ্লাইট অর্ডার অথোরাইজ করেছিল...'
'একজন জেনারেল।'
'ওখানেই ভুল করেছ,' বলল পিট। 'তিনি জেনারেল ছিলেন না।'
'কিন্তু একমাত্র জেনারেল টাইটেলই ফিট করে ওখানে!'
'মোটেই তা নয়। জেনারেল লিখতে ইংরেজিতে সাতটা অক্ষর লাগে, কিন্তু

তোমার দেয়া কাগজে শুধু পঞ্চম অক্ষরটা পড়া যাচ্ছে, একটা আর, ঠিক?'
'হ্যাঁ।'
'সেক্সটন ফাইভ-থ্রী যেহেতু এয়ারফোর্সের একটা প্লেন, তার পাইলটও একজন এয়ারফোর্সের লোক, তাই আমিও ধরে নিয়েছিলোম ওটার ফ্লাইট অর্ডার একজন এয়ারফোর্স অফিসারই অথোরাইজ করবে।'
'আরও সংক্ষেপে বলা যায় না?'
'কিন্তু এয়ারফোর্সের ফাইল ঘেঁটে এমন কোন নাম পেলাম না যার সাথে তোমার কাগজে পাওয়া অফিসারের নামের ছাড়াছাড়া অক্ষরগুলো মেলে। এই সময় আমার মনে হলো, অ্যাডমিরাল-ও তো একটা সাত অক্ষরের পদ, এই শব্দেরও তো পঞ্চম চরিত্র একটা আর।'
হঠাৎ তলপেটে একটা সুড়সুড়ি অনুভব করল যেন রানা। আয়হায়, সম্ভাবনাটা মুহূর্তের জন্যেও তার মনে উঁকি দেয়নি। অ্যাডমিরাল শব্দটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার মনের ভেতর। কারও মাথায় ঢোকেনি এয়ারফোর্সের একটা প্লেন নেভীর কার্গো বহন করতে পারে!
'কোন নাম?' উত্তরটা কি হবে ভেবে রীতিমত ভয় পাচ্ছে রানা। 'নেভীর ফাইল ঘেঁটে কোন নাম পেয়েছ তুমি, পিট?'
'নামের প্রথম অংশটা সহজ, জে-র পরে দুটো অক্ষর নেই, তারপর একটা কে। তারমানে জ্যাক। মাঝখানের অক্ষর দুটো হবে এ এবং সি। নামের দ্বিতীয় অংশটা—প্রথম অক্ষরটা নেই, তারপর আছে একটা ই, একটা এন। এর পরের অক্ষরটা নেই, তারপর রয়েছে একটা ও, একটা এন। ডেনটন? মেলে না?'
'মেলে।'
'এরপর নামের শেষ অংশ,' বলল পিট। 'শেষের দুটো অক্ষর আছে, একটা ও, এবং একটা টি। প্রথম দিকে সম্ভবত দুটো অক্ষর ছিল। এই দুটো অক্ষর যদি এস এবং সি হয়, কি দাঁড়ায়?'
'স্কট।'
'হ্যাঁ,' বলল পিট। 'পুরো নামটা তাহলে কি দাঁড়াল?'
'জ্যাক ডেনটন স্কট,' বলল রানা।
'অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কট,' হাসছে ডার্কপিট। 'কমপিউটরের সাহায্য নিয়ে নেভী রেকর্ড ঘাঁটতে গিয়ে দেখলাম, দিব্যি রয়েছে নামটা।'
'কিন্তু সেটা উনিশশো চুয়ান্ন সালের কথা,' বলল রানা। 'জ্যাক ডেনটন তখনই যদি অ্যাডমিরাল হয়ে থাকেন, এখন তিনি হয় আশি বছরের বুড়ো, নয়তো মারা গেছেন—সম্ভবত মারাই গেছেন।'
'আন্দাজে বাঘ মেরো না,' ধমকের সুরে বলল পিট। 'জ্যাক ডেনটনের ফাইল পড়েছি আমি। সাংঘাতিক মেধাবী অফিসার ছিলেন। তাঁর পদোন্নতির গতি দেখে মনে হয়েছিল, ন্যাভাল চীফ অব স্টাফের পদটা তাঁর কপালেই ঝুলছে। কিন্তু তারপরই হঠাৎ করে তাঁকে বদলি করে দেয়া হয় ভারত মহাসাগরের একটা ফ্লিটে, যেখানে যোগ্যতা দেখাবার কোন অবকাশই ছিল না। রহস্যময় একটা ব্যাপার! কে জানে, হয়তো বড় কর্তার সাথে মতের মিল হয়নি, তাই অবিচারের শিকার হন

তিনি। সে যাই হোক, উনিশশো বাষট্টি সালে অবসর নিয়েছেন তিনি। আগামী ডিসেম্বরে উনআশিতে পড়বেন।'

'তুমি বলতে চাইছ জ্যাক ডেনটন বেঁচে আছেন?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'নেভীর পেনশন গ্রহিতাদের তালিকায় নাম আছে তাঁর,' তথ্যগুলো একটা একটা করে ছাড়ছে পিট, রানাকে অধৈর্য করে তুলে মজা পাচ্ছে সে।

'ঠিকানা, পিট?' জানতে চাইল রানা। 'কোন ঠিকানা পাওনি?'

'একটা সরাইখানা। নাম অ্যাংকোরেজ হাউজ। ভার্জিনিয়া লেক্সিনটনের ঠিক দক্ষিণে। ওখানের নিয়মকানুন জানা থাকার কথা তোমার—পোষা কুকুর-বিড়াল আর বাচ্চা নিয়ে ওঠা নিষেধ। ষোলোটা কামরা, প্রাচীন অ্যান্টিকস দিয়ে সাজানো।'

'তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, দোস্ত।'

'এর মধ্যে আমাকে নেবে নাকি?' সাগ্রহে জানতে চাইল পিট। 'তোমার সাথে কাজ করা মানেই তো ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চ।'

'তোমাকে হয়তো দরকার হবে আমার,' বলল রানা। 'কিন্তু এখনই নয়, পিট।'

'এফ. বি. আই আগ্রহী হতে পারে এমন কোন ব্যাপার নয় তো?'

'না, তোমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না ব্যাপারটা।'

'তাহলে ঠিক আছে,' বলল পিট। 'কিন্তু দরকার হলে ডেকো আমাকে, কেমন?'

'প্রমিজ।' রিসিভার রেখে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। দেখল ওর দিকে ঘন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে স্যালভেজ মাস্টার মারটিন প্যানজার।

'অনধিকার চর্চা না হয়ে গেলে জানতে পারি, ব্যাপারটা কি?' প্রশ্ন করল সে।

'ছাব্বিশ বছরের পুরানো একটা রহস্য,' বলল রানা। 'মীমাংসার জন্যে আপনার সাহায্যও হয়তো লাগবে। এখুনি নয়, তার আগে আরও কিছু কাজ বাকি আছে আমার।'

'যখনই সাহায্য লাগবে, খবর পাঠাবেন, স্যার,' বলল মারটিন। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হব আমি।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আবার দেখা হবে।'

সকালের ফ্লাইটে রিচমণ্ড পৌঁছুল রানা। ট্যাক্সিতে বসে ভার্জিনিয়ার গ্রামীন সৌন্দর্য দেখছে ও। পাইনগাছের বনভূমি, ছোট ছোট জলপ্রপাত, ঢালু খেত-খামার, ছবির মত ঘর-বাড়ি। ইন্টারস্টেট এইট্টি ওয়ান পেরিয়েই বাঁক নিল ট্যাক্সি, ঢুকে পড়ল লেক্সিনটনে। শহরের আর্কিটেকচারের নমুনাগুলো দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখার মত, কিন্তু হাতে সময় নেই রানার। একটু পরই দক্ষিণ দিকে মোড় নিল ট্যাক্সি। রঙচঙে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়েছে আগেই। অ্যাংকোরেজ হাউস আর মাত্র মাইলখানেক দূরে।

নুড়ি বিছানো পথের শেষ মাথায় সরাইখানাটা। রিসেপশনে কাউকে দেখতে

না পেয়ে একটু অবাক হলো রানা। কলিংবেলের বোতামে চাপ দিতে যাবে, এই সময় দরজা দিয়ে বিশ-বাইশ বছরের একটা মেয়ে হাতে একটা চেয়ার নিয়ে ভেতরে ঢুকল। পরনে জীনস আর ডেনিম ব্লাউজ, ছাই রঙের চুলের সাথে বাঁধা রয়েছে একটা লাল ব্যানডানা। পায়ে রাইডিং বুট। গায়ের রঙটা আশ্চর্য চকচকে আর মসৃণ। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। একনজর দেখেই বুঝল রানা, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না চরিত্র, ভূমিকম্পই হোক বা অগ্নিকাণ্ড, কোন কিছুতেই টলার পাত্রী নয়।

সুন্দর একটা পায়াওয়ালা ঝাড়বাতির সামনে চেয়ারটা রাখল মেয়েটা। বলল, 'দুঃখিত। আমি আপনার গাড়ির শব্দ শুনতে পাইনি।'

চেয়ারটা দেখিয়ে বলল রানা, 'খুব সুন্দর জিনিস। নিশ্চয়ই একটা অ্যান্টিকস?'

'হ্যাঁ,' বলল মেয়েটা। 'ক্যান্টারবেরীর হেনরি ব্রিনের তৈরি।'

'আপনাদের এখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ আছে বলে শুনেছি।'

'সমস্ত কৃতিত্ব সরাইখানার মালিক অ্যাডমিরাল স্কটের,' বলল মেয়েটা। ডেস্কের পিছন দিকে চলে গেল সে। 'সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ, এটা তাঁর একটা নেশাও বটে।'

'আচ্ছা!'

'আপনার একটা কামরা দরকার?'

'হ্যাঁ, শুধু আজ রাতটার জন্যে।'

রেজিস্টার খাতাটা উল্টো করে ডেস্কের ওপর রাখল মেয়েটা। সই করল রানা।

'তেরো নম্বর কামরা। দোতলায় উঠে বাঁ দিকের তিনটে দরজা পেরিয়ে। আশা করি লাগেজ বয়ে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হবে না, মি. রানা?' সই করার সময় উল্টোদিক থেকে নামটা পড়ে নিয়েছে মেয়েটা। 'আমি হিলি মিলিগান। কিছু দরকার হলে দরজার পাশের বোতাম চাপ দেবেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল আছেন, নাকি বাইরে গেছেন?' জানতে চাইল ও। 'তাঁর সাথে একটু আলাপ করতাম—অ্যান্টিকস্ সম্পর্কে।'

লবির শেষ মাথার জোড়া পর্দা লাগানো দরজাটা দেখিয়ে মেয়েটা বলল, 'ওখান দিয়ে বেরিয়েই একটা পুকুর দেখতে পাবেন। অ্যাডমিরাল কচুরিপানা সাফ করছেন।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে চওড়া একটা ফুটপাথ দেখতে পেল রানা, দু'পাশে বুনো ফুল আর পাইন গাছ। ফুটপাথের শেষ দিকে একটা পুকুরের কিনারা দেখা যাচ্ছে, তারপরই ক্রমশ উঠতে শুরু করেছে পাহাড়ের গা।

একজন বুড়ো লোককে দেখতে পেল রানা, পায়ে গামবুট, হাতে একটা লম্বা আঁকশি, সেটা দিয়ে একগাদা কচুরিপানা তুলে আনছেন। দশাসই পুরুষ অ্যাডমিরাল, মাথায় হ্যাট নেই, দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, আরও ত্রিশ বছর কম হবে তাঁর বয়স। টাক মাথা থেকে দরদর করে ঘাম নেমে আসছে।

'অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন?'

মাঝপথে স্থির হয়ে গেল আঁকশিটা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দাঁড়ানো রানাকে

দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি জ্যাক ডেনটন।' কথা শেষ করে পুকুরের দিকে তাকালেন তিনি আবার, আঁকশি দিয়ে কচুরিপানা তুলতে থাকলেন।

'আমার নাম মাসুদ রানা, একটু যদি সময় দেন, আপনার সাথে দুটো কথা বলতে চাই আমি।'

'অবশ্যই, শুরু করুন,' বললেন অ্যাডমিরাল, আঁকশি দিয়ে একগাদা কচুরিপানা টেনে এনে ফেললেন একপাশে। 'কিছু মনে করবেন না, কাজটা আজকেই শেষ করতে হবে আমাকে।'

পরিস্থিতিটা অস্বস্তিকর লাগছে রানার কাছে, প্রসঙ্গটা কিভাবে তুলবে বুঝতে পারছে না। খানিকক্ষণ ইতস্তত করল ও। অ্যাডমিরাল আর কিছু বলছেন না বা ওর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না।

মৃদু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল ও, তারপর বলল, 'আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। একটা এয়ারক্রাফটের ব্যাপারে। ওটার কোড ডেজিগনেশন ছিল সেক্সটন ফাইভ-থ্রী।'

কিছুই ঘটল না। অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন নিজের কাজে পুরোদমে ব্যস্ত। কিন্তু তাঁর আঁকশি ধরা হাতের নখের ডগাগুলো রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে, দৃষ্টি এড়াল না রানার।

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রী,' বললেন তিনি, তারপর কাঁধ ঝাঁকালেন। 'কই, মনে পড়ছে না কিছু।'

'ওটা একটা মিলিটারি এয়ার ট্র্যান্সপোর্ট সার্ভিস প্লেন ছিল। উনিশশো চুয়ান্ন সালে গায়েব হয়ে যায়।'

'আচ্ছা? সে তো অনেক যুগ আগের কথা,' শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল পানির দিকে। 'উঁহুঁ, কোন মিলিটারি এয়ারট্র্যান্সপোর্ট এয়ারক্রাফটের কথা মনে পড়ছে না আমার।' একটু পর আবার বললেন, 'মোটেও আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। আমার ত্রিশ বছরের নেভী জীবনে পুরোটা সময় আমি সারফেস অফিসার ছিলাম। আমার দায়িত্ব ছিল হেভী অর্ডন্যান্স।'

'এয়ারফোর্সের মেজর ভ্যান জনসন নামে কোন পাইলটের কথা মনে পড়ে?'

'জনসন? মেজর ভ্যান জনসন?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ছেন অ্যাডমিরাল। 'কই, মনে পড়ছে না।' এতক্ষণে আবার একবার তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন রানার দিকে। 'আপনার নামটা আরেকবার বলবেন? এসব প্রশ্ন আপনি আমাকে কেন করছেন?'

'আমার নাম মাসুদ রানা,' আবার বলল রানা। 'ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সীর সাথে একটা কণ্ট্রাক্টে কাজ করছি। ওটা একটা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, একটা ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশন করার জন্যে ওরা আমাকে ভাড়া করেছে। কিছু পুরানো কাগজপত্র পেয়েছি আমি, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেক্সটন ফাইভ-থ্রী ফ্লাইট অর্ডার আপনি অথোরাইজ করেছিলেন।'

'নিশ্চয়ই কেউ কোথাও কোন ভুল করেছে।'

'বোধহয়,' বলল রানা। 'হয়তো সমস্ত রহস্যের সমাধান পাওয়া যাবে প্লেনটার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করার পর।'

'কিন্তু আপনি যেন বললেন, গায়েব হয়ে গেছে সেটা?'
'গায়েব হয়ে গিয়েছিল, আমি সেটাকে আবিষ্কার করেছি।'
তীক্ষ্ণ চোখে অ্যাডমিরালের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, কিন্তু পাশ থেকে দেখে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে না। অ্যাডমিরালকে একা রেখে সরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল ও। ভদ্রলোককে চিন্তাভাবনা করার সময় দেয়া দরকার।
'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। 'আমার সূত্রগুলো নিশ্চয়ই ভুল। কিছু মনে করবেন না।' ঘুরে দাঁড়াল রানা, ফুটপাথ ধরে ফিরে আসছে। প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মত এগিয়ে এসেছে ও, এই সময় বাধা পেল।
'মি. রানা!'
ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'ইয়েস?'
'আপনি কি সরাইখানায় উঠেছেন?'
'কাল সকাল পর্যন্ত। তারপর ফিরে যেতে হবে আমাকে।'
কথা বললেন না অ্যাডমিরাল, একবার শুধু মাথা ঝাঁকালেন।
ফুটপাথ ধরে সরাইখানার দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, এই সময় ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল পুকুরের দিকে। আপন মনে আঁকশি দিয়ে কচুরিপানা টেনে তুলছেন অ্যাডমিরাল। দুশ্চিন্তা বা উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই তাঁর ভাবভঙ্গিতে। রানা যেন এইমাত্র তাঁর সাথে খোশ গল্প করে এসেছে।

আর সব বোর্ডারদের সাথে বসে রাজকীয় ডিনার সারল রানা। ডাইনিং রুমটা আঠারো শতকের একটা কাউন্টি সরাইখানার খাবার ঘরের ঢঙে সাজানো। দেয়ালে হাতে তৈরি রাইফেল আর হরিণের মাথা ঝুলছে। সমস্ত তৈজসপত্র পুরানো আমলের, প্রত্যেকটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। যা কিছু পরিবেশন করা হলো, ঘরে তৈরি খাবারের মত স্বাদ সেগুলোর।
এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যাচ্ছে হিলি, কফি পরিবেশনের সুযোগে দু'একটা কথা বলছে বোর্ডারদের সাথে। আইরিশ কফি শেষ করে পোর্চে বেরিয়ে এল রানা। পুব দিকে আস্ত একটা চাঁদ উঠেছে, তার আলোয় রূপোর মত চক চক করছে পাইন গাছের মাথাগুলো। এগিয়ে গিয়ে রেইলিঙের সামনে দাঁড়াল ও, একটা সিগারেট ধরাল। পরবর্তী চালটা অ্যাডমিরাল দেবেন, আশা করছে ও।
খানিক পর মৃদু পায়ের আওয়াজ ঢুকল কানে, পিছন দিকে না তাকিয়েও কে আসছে বুঝতে পারল রানা। রানার পিছনে কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল সে।
'ভার্জিনিয়া চাঁদের মত এত উজ্জ্বল চাঁদ আপনি আর কোথাও পাবেন না।'
'তাই বুঝি?' বলল রানা।
'ডিনারটা উপভোগ করছেন?' জানতে চাইল হিলি। রানার পিছন থেকে এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল সে। একটা হাত রাখল রেইলিঙে।
'অনেকদিন এমন উপভোগ করিনি। আপনাদের রাঁধুনীর তুলনা হয় না। খাবারগুলো যেন প্লেটের ওপর কবিতা।'
বন্ধুত্বপূর্ণ হাসিটা অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল হিলির মুখে। ছোট্ট একটা

লাফ দিয়ে রেইলিঙের ওপর গুরু-নিতম্ব তুলে বসল সে। হঠাৎ তার চেহারা কেমন যেন সিরিয়াস হয়ে উঠল। 'বলুন, মি. রানা, আমাদের অ্যাংকোরেজ হাউজে কেন এসেছেন আপনি?'

হিলির চোখে চোখ রাখল রানা। 'স্রেফ কৌতূহল, নাকি আর কিছু?'

'দুঃখিত,' বলল হিলি। 'আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাইনি আমি, কিন্তু আপনি আসার পর থেকে বাবাকে কেমন যেন অস্থির আর উদ্বিগ্ন দেখছি। আমি ভাবলাম...'

'অ্যাডমিরাল আপনার বাবা?'

'আমি তাঁর পালক-কন্যা।' এরপর গলার আওয়াজ আরও নিচু করে নিজের জীবনের ইতিহাস শুরু করল হিলি। বলার কথা তার একটাই, অ্যাডমিরালকে সে ভালবাসে, কারণ তিনি তাকে মানুষ করেছেন। কথার মাঝখানে হঠাৎ সে রিস্টওয়াচ দেখল। 'ইস্, আর সব গেস্টরা না জানি কি মনে করছে। আমি যাই। সরাইখানার পাশে ছোট একটা পাহাড় আছে, ওখান থেকে লেক্সিনটন শহরটা পুরো দেখা যায়। বড় সুন্দর দৃশ্য। জায়গাটা রেইলিং দিয়ে ঘেরা, ইচ্ছে হলে যেতে পারেন ওখানে।' বলে আর দাঁড়াল না হিলি।

ভুরু কুঁচকে হিলির গমনপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। হিলির শেষ কথাগুলোর সুরে পরামর্শ বা অনুরোধ ছিল না, ছিল আদেশের কাঠিন্য।

অনেক কমিয়ে বলেছে হিলি। ঢালের মাথা থেকে দৃশ্যটা শুধু সুন্দর নয়, শ্বাসরুদ্ধকর। গোটা উপত্যকাটাকে রূপালী আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে চাঁদটা, আর শহরের আলোগুলো বহুদূরের গ্রহের মত পিট পিট করছে। এখানে এসেছে এক মিনিটও হয়নি, এমনি সময় পিছনে কারও উপস্থিতি অনুভব করল রানা।

'অ্যাডমিরাল ডেনটন?' শান্তভাবে জানতে চাইল ও।

'প্লীজ, মাথার ওপর হাত তুলুন, আর এদিকে ঘোরার চেষ্টা করবেন না,' রুক্ষ কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল।

কথা মত কাজ করল রানা। ওর গায়ে হাত পড়ল, অ্যাডমিরাল সম্পূর্ণ বডি সার্চ করলেন না, শুধু পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করে নিয়ে তাতে টর্চের আলো ফেললেন। কয়েক মুহূর্ত পর আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ওয়ালেটটা আবার ভরে দিলেন রানার পকেটে। 'হাত দুটো নামিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ান, মি. রানা।'

তাই করল রানা। দেখল, অ্যাডমিরালের বাঁ হাতে একটা রিভলভার ধরা রয়েছে। ওর পেটের দিকে তাক করা। 'এসবের কোন দরকার আছে কি?' মৃদু গলায় বলল ও।

'নিষিদ্ধ তথ্য জানেন আপনি। সেটা এমন একটা ব্যাপার, যার সমাপ্তি টানা হয়ে গেছে বহুযুগ আগে। আপনার পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।'

'নিজের যে পরিচয় দিয়েছি, সেটা যে সত্যি, এখন আপনার বিশ্বাস হয়েছে তো?'

'নুমার চীফ ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে টেলিফোন করেছিলাম আমি,' জ্যাক ডেনটন বললেন। 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্যাসিফিকে আমার কমাণ্ডে

কাজ করেছিলেন তিনি। ওদের একজন ডিরেক্টরের সাথে আপনার একটা কন্ট্রাক্ট হয়েছে বটে, কিন্তু সে-ব্যাপারে হ্যামিলটন বিশেষ কিছু জানেন না। কিন্তু আপনার আসল পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে সে আমাকে। সেই সাথে আপনার একগাদা প্রশংসাও করেছে, যার কোন দরকার ছিল না।'

'আমি ঠিক বুঝলাম না...'

'আপনি রানা এজেন্সির চীফ, অনেক সফল অভিযানের নায়ক, মুসোলিনীর সোনা উদ্ধার করেছেন...'

বয়ঃবৃদ্ধ একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভদ্রলোকের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনে কুণ্ঠাবোধ করছে রানা। 'আমার আবিষ্কারের কথা এখনও আমি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে জানাইনি।'

'আপনার আবিষ্কার। সেক্সটন ফাইভ-থ্রী?'

'ওটার অস্তিত্ব আছে, অ্যাডমিরাল। হাত দিয়ে ছুঁয়েছি আমি প্লেনটাকে।'

অ্যাডমিরালের বুকটা ফুটে উঠল, যেন সমস্ত বাতাস টেনে নিচ্ছেন তিনি। 'মি. রানা, আপনার মত একজন স্বনামধন্য মানুষের কাছ থেকে এই আচরণ আমি আশা করি না। আপনি যে শুধু ধোঁকা দিচ্ছেন তাই নয়, মিথ্যে কথাও বলছেন। আমি জানতে চাই, কেন?'

'প্রমাণ চান, অ্যাডমিরাল? নিজেদের পেশায় প্রচুর সুনাম আছে, এমন দুজন লোককে সাক্ষী হিসেবে আপনার সামনে হাজির করতে পারি। ভিডিওটেপ করা ছবিও আছে।'

হতচকিত একটা ভাব ফুটে উঠল অ্যাডমিরালের চেহারায়। 'অসম্ভব! মহাসাগরে ডুবে গেছে সে। মাসের পর মাস তন্নতন্ন করে খুঁজেছি আমরা, তার কোন চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়নি কোথাও। কোত্থেকে, কিভাবে...অসম্ভব!'

'ভুল জায়গায় খুঁজেছিলেন আপনারা, অ্যাডমিরাল। সেক্সটন ফাইভ-থ্রী কলোরাডোর একটা পাহাড়ী লেকে ডুবে আছে।'

অ্যাডমিরালের প্রকাণ্ড মুখ থেকে সমস্ত কাঠিন্য এক নিমেষে ঝরে পড়ল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। মুহূর্তের মধ্যে একজন লোকের চেহারা এতটা বদলে যেতে পারে, ভাবতেও পারেনি রানা। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, রুগ্ন দেখাচ্ছে তাঁকে। রিভলভার ধরা হাতটা ঝুলে পড়ল শরীরের পাশে, টলতে টলতে একটা কাঠের বেঞ্চের দিকে এগোলেন তিনি। একটা হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরে সোজা করে রাখল রানা।

মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানালেন অ্যাডমিরাল, ধীরে ধীরে বসে পড়লেন বেঞ্চের ওপর। 'আমি জানতাম...' হাঁপাচ্ছেন তিনি। '...আমি জানতাম, একদিন ব্যাপারটা বিস্ফোরণ ঘটাবে! এ বিপদ চিরকাল মুখ লুকিয়ে থাকার নয়।' একটা কাঁপা হাত বাড়িয়ে রানার কব্জিটা চেপে ধরলেন তিনি। 'কার্গো? মাই গড, কার্গোর কথা কিছু বলছেন না কেন?' আতঙ্কে গলাটা বুজে এল অ্যাডমিরালের।

'স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে মেটাল ক্যানগুলো, তাছাড়া ওগুলোর আর কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয় এখুনি।'

'প্রার্থনা করি সব যেন ঠিক থাকে,' বিড়বিড় করে বললেন অ্যাডমিরাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। 'কলোরাডো? রকি পর্বতমালা। তার মানে মেজর ভ্যান জনসন আর তার ক্রুরা ওটাকে রাজ্যের বাইরে বের করে নিয়ে যেতে পারেনি!'

'ফ্লাইটটা কলোরাডো থেকে শুরু হয়েছিল?'

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর অরজিন পয়েন্ট ছিল বাকলী ফিল্ড।' একটা হাতে মাথার ভার চাপালেন অ্যাডমিরাল। 'এত তাড়াতাড়ি কি গণ্ডগোল দেখা দিল? টেকঅফ করার একটু পরই নেমে এসেছিল ওরা...'

'নিশ্চয়ই মেকানিক্যাল কোন গোলযোগ দেখা দিয়েছিল,' বলল রানা। 'একমাত্র যে ফাঁকা জায়গা দেখতে পায় ওরা, সেখানেই নামার চেষ্টা করেছিল। শীতকাল, লেকটা নিরেট বরফে মোড়া ছিল, একটা মাঠ বলে ভুল করেছিল ওটাকে। প্লেনের ভর সামলাতে না পেরে ডেবে যায় বরফ, লেকের তলায় নেমে যায় সেটা। ঠিক ওই জায়গাটায় লেকটা খুব বেশি গভীর, তাই গ্রীষ্মে বরফ গলার পরও প্লেনের আউটলাইন দেখা যায়নি আকাশ থেকে।'

'আর এদিকে আমরা ধরে নিয়েছিলাম...' ক্রমশ অ্যাডমিরালের কণ্ঠস্বর নিচু হতে হতে মিলিয়ে গেল। খানিক পর নরম গলায় তিনি বললেন, 'কার্গো...ওই মেটাল ক্যানগুলো যে-কোন মূল্যে উদ্ধার করতে হবে।'

'ওগুলো কি নিউক্লিয়ার ওয়রহেড?' প্রশ্ন করল রানা।

'নিউক্লিয়ার ওয়রহেড...' রানার কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন অ্যাডমিরাল, ফিসফিস করে কথা বলছেন তিনি। 'আপনার কি তাই ধারণা?'

'সেক্সটন থ্রী-র ফ্লাইট প্ল্যানে যে তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ওই সময় সাউথ প্যাসিফিকের বিকিনিতে এইচ-বম্ব টেস্টের তোড়জোর চলছিল। তাছাড়া, একজন ক্রুর পকেট থেকে একটা মেটাল ট্যাগ পেয়েছি আমি, তাতে রেডিও অ্যাকটিভিটির লক্ষণ দেখা গেছে।'

'ভুল বুঝেছেন আপনি, মি. রানা। হ্যাঁ, নিউক্লিয়ার ন্যাভাল শেল রাখার জন্যেই ওই মেটাল ক্যানগুলোর ডিজাইন তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু মেটাল ক্যান অন্য কাজে লাগানো হয়।'

'কারও কারও ধারণা, ক্যানগুলো খালি।'

মোমের তৈরি মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে আছেন অ্যাডমিরাল। 'তাই যদি হত, আইসেনহাওয়ারের আত্মা কষ্ট পেত না,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'আমি হলফ করে বলতে পারি, তাঁর আত্মা এখনও অস্থিরতায় ভুগছে। না, মি. রানা। ক্যানগুলো খালি নয়। আপনি তো জানেন, নিউক্লিয়ার ছাড়াও মারণাস্ত্র আছে। বলা যেতে পারে সেক্সটন ফাইভ-থ্রী মৃত্যুর বীজ বহন করছিল।'

'মৃত্যুর বীজ?'

'মহামারীর বীজ,' বললেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কট। 'ওই মেটাল ক্যানগুলোয় লুকিয়ে আছে লক্ষ কোটি মানুষের অনিবার্য ধ্বংস।'

আট

'লক্ষ-কোটি মানুষের অনিবার্য ধ্বংস!' মনে মনে কথাটা আওড়াল রানা।

'শিউরে উঠলেন, মি. রানা?' একটু অবাক হয়ে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'এখনও তো ওটার পরিচয় পাননি।'

'লক্ষ-কোটি মানুষের অনিবার্য ধ্বংস,' বলল রানা। 'শুনলেই কেমন গা ছমছম করে। সবকথা খুলে বলুন, অ্যাডমিরাল।'

'এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে আর কোন ভাষা জানা নেই আমার,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'এর একটা বায়োকেমিক নাম আছে, ত্রিশটা অক্ষরের বিদঘুটে উচ্চারণ। কিন্তু মিলিটারি কোডটা সহজ আর মিষ্টি। আমরা স্রেফ কিউ-ডি বলে ডাকতাম ওটাকে। কুইক-ডেথ-এর সংক্ষেপ।'

'তাৎক্ষণিক মৃত্যু!' বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল রানা। 'কিন্তু ওটাকে আপনি অতীত কালে ফেলে উচ্চারণ করছেন কেন?'

অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন অ্যাডমিরাল। 'অভ্যাস। আপনি সেক্সটন ফাইভ-থ্রী আবিষ্কার করেছেন, এ-কথা শোনার আগে পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল, কিউ-ডি-র আর কোন অস্তিত্ব নেই।'

'আসলে জিনিসটা কি?'

'সামরিক মারণাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ বলা যেতে পারে কিউ-ডি-কে। সাতাশ বছর আগে একজন মাইক্রো-বায়োলজিস্ট, নাম ড. জন ভেটারলি, রাসায়নিক ভাবে তৈরি করেছিলেন কৃত্রিম এক ধরনের প্রাণ, যেটা মানবদেহে বা অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদেহে অজানা একটা রোগ সৃষ্টি করতে পারে, যার চিকিৎসার কোন পদ্ধতি আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি। খুব সহজ করে বলতে চাইছি—একটা অজ্ঞাত পরিচয়, অদৃশ্য ব্যাকটেরিয়োলজিক্যাল এজেন্ট মানবদেহে বা যে কোন প্রাণীদেহে সংক্রমিত হবার তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভাইটাল বডি ফাংশন থামিয়ে দিতে পারে। কোন সময় দেয় না, মৃত্যু হয় তৎক্ষণাৎ।'

'নার্ভ গ্যাসের বৈশিষ্ট্যও কি এই একই রকম নয়?'

'অনুকূল পরিবেশে তাই। কিন্তু মিটিয়োরোলজিক্যাল ডিসটার্ব্যান্স দেখা দিলে, যেমন বাতাস বা ঝড়, অথবা প্রচণ্ড গরমের সময় বিপজ্জনক ডোজের নার্ভ বা টক্সিক এজেন্ট বড় একটা এলাকায় ফেলা হলে তার শক্তি কমে যায়, অনেক সময় কোন কাজেই করে না। কিউ-ডি সমস্ত বাধাবিঘ্ন জয় করেছে। কোন কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। তার শক্তির কোন ক্ষয় নেই। মৃত্যুহীন প্রাণ বলা যেতে পারে একে। যে-কোন আবহাওয়ায় মহামারী সৃষ্টি করতে পারে সে। মৃত্যুর হার শতকরা একশো জন।'

'কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে একটা মহামারীকে দমন করা সম্ভব নয়, তা কিভাবে হয়?'

'মাইক্রোঅরগানিজমগুলোকে দেখা এবং চেনা গেলে তা সম্ভব। ডিকনটামিনেশন প্রসিডিওর আর অ্যান্টি-বায়োটিকের সাহায্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এমন একটা মহামারীর গতি মন্থর করে দেয়া যায়, অথবা থামিয়েও দেয়া যায়। কিন্তু একটা শহরে যখন ঢোকে কিউ-ডি, দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যে তাকে থামায়। গোটা শহর উজাড় করার পরও পূর্ণ শক্তি নিয়ে সেখানে আস্তানা গেড়ে বসে থাকবে সে।'

'তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাঝখানে কিউ-ডি-কে প্লেনে টেনে তোলা সম্ভব হলো কিভাবে?'

'ওর জন্ম এবং ক্যানে ভরার ঘটনা একই জায়গায় ঘটে। ডেনভারের বাইরে রকি মাউন্টেন অ্যারসেন্যাল এ-দেশের প্রধান কেমিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল মারণাস্ত্র তৈরির কারখানা ছিল তখন, গত বিশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছিল ওরা। বলা বাহুল্য, সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চালু ছিল ওখানে।'

চুপ করে আছে রানা, বলে যেতে দিচ্ছে বৃদ্ধকে।

ঘাড় ফিরিয়ে দূরের আলোকিত শহরের দিকে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল, কিন্তু দু'চোখে তাঁর শূন্য দৃষ্টি। 'চুয়ান্ন সালের জানুয়ারি,' অতীতে ফিরে গেছেন তিনি, অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে যেন তাঁর কণ্ঠস্বর। 'বিকিনিতে বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্যে হাইড্রোজেন বোমা সেট করা হয়েছে। কিউ-ডি টেস্ট প্রোগ্রামের দায়িত্ব দেয়া হলো আমাকে, তার কারণ ড. ভিটেলিকে নেভি আবিষ্কার করেছিল, এবং আমি ছিলাম ন্যাভাল অর্ডন্যান্সে একজন এক্সপার্ট। হাইড্রোজেন বিস্ফোরণের ডামাডোলে আমার টেস্টটাকে আড়াল করার সুযোগটা আমি হাতছাড়া করতে চাইনি। ভেবেছিলাম, দুনিয়ার সবাই যখন বিকিনির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে, আমরা তখন চুপিসাড়ে রঙ্গেলো আইল্যাণ্ডে সেরে নেব টেস্টটা। চারশো মাইল উত্তর-পুবে ওটা, বাইরের দুনিয়ার কাছে অচেনা একটা ছোট্ট দ্বীপ।'

'রঙ্গেলো,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর গন্তব্য স্থান।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন অ্যাডমিরাল। 'মহাসাগরের মাঝখানে কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এই একটা ছোট্ট প্রবালের টুকরো মাথা তুলে আছে পানির ওপর, একা। পাখিরাও দূরে সরে থাকে ওটার কাছ থেকে।' বসার ভঙ্গি বদল করার জন্যে একটু থামলেন অ্যাডমিরাল। 'দু'ধরনের টেস্ট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিই আমি। প্রথম টেস্টের অধীনে একটা অ্যারোসোল ডিভাইসের সাহায্য নেয়া হয়, ওটার কাজ ছিল দ্বীপে সামান্য একটু কিউ-ডি ছড়িয়ে দেয়া। দ্বিতীয় টেস্টে যুদ্ধ জাহাজ উইসকনসিন-এর সাহায্য নেয়ার ব্যবস্থা হয়। ঠিক হয় বিশ মাইল দূর থেকে কিউ-ডি ভরা একটা ওয়রহেড তার মেইন ব্যাটারি থেকে ছুঁড়বে সে। কিন্তু টেস্টটা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।'

'মেজর ভ্যান জনসন কিউ-ডি ডেলিভারি দিতে ব্যর্থ হন।'

'হ্যাঁ। ওই মেটাল ক্যানগুলোর ভেতর কুইক-ডেথ ভর্তি ন্যাভাল শেল আছে...'

'কিন্তু আপনি তো আরেক দফা সাপ্লাইয়ের অর্ডার দিতে পারতেন?'

'পারতাম,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু তার আগেই সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে

টেস্ট প্রোগ্রামের গোটা প্ল্যানটাই বাতিল করে দিতে হয় আমাকে। দ্বীপে অ্যারোসোল ফেলার পর যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল, তা দেখে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।' এত বছর পরও সেই রোমহর্ষক দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠলেন তিনি।

'কি ঘটেছিল?'

'এমনিতে কিছুই বদলায়নি,' বললেন অ্যাডমিরাল, একেবারে খাদে নেমে গেছে তাঁর গলা। 'সৈকতের সাদা বালি, পাম গাছ, সবই আগের মত ছিল। টেস্ট অ্যানিমেল, যেগুলোকে আমরা দ্বীপে রেখে এসেছিলাম, সেগুলো অবশ্যই মারা গিয়েছিল। দু'হপ্তা অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি বিজ্ঞানীদেরকে। ঠিক চোদ্দদিন পর ড. ভিটেলির নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী টেস্টের ফলাফল জানার জন্যে রঙ্গেলো দ্বীপে গেল। মোট চারজন। পুরোদস্তুর প্রটেকটিভ পোশাক পরে ছিল ওরা, ব্রিদিং অ্যাপারেটাসও ছিল। দ্বীপে নামার ঠিক সতেরো মিনিট পর ওরা সবাই মারা যায়।'

চমকে উঠল রানা। 'তা কিভাবে সম্ভব?'

'কি ভয়ঙ্কর জিনিস আবিষ্কার করেছেন, ড. ভিটেলি নিজেই তা বুঝতে পারেননি। অন্যান্য আর সব লেথাল এজেন্টের শক্তি সময়ের সাথে সাথে কমে যায়, কোন কোনটার ক্ষেত্রে সেটা একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়। ঠিক উল্টোভাবে, কিউ-ডি সময়ের সাথে সাথে শক্তি সঞ্চয় করে। বিজ্ঞানীদের প্রটেকটিভ পোশাক ভেদ করে কিভাবে কিউ-ডি আক্রমণ করল, অনেক গবেষণা করেও তা আমরা জানতে পারিনি।'

'লাশগুলো উদ্ধার করেছিলেন?'

'আজও সেখানে পড়ে আছে ওদের লাশ,' চোখে বিষাদের ছায়া নিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল। 'এবার বুঝতে পারছেন, মি. রানা, কুইক-ডেথের শক্তি কতটুকু? কিন্তু মনে রাখবেন, শক্তির চেয়ে তার ক্ষতি করার ক্ষমতা অনেক বেশি, আরও অনেক বেশি। কুইক-ডেথের সবচেয়ে ভীতিকর বৈশিষ্ট্য হলো, মরতে সে রাজি নয়। পরে আমরা জানতে পেরেছি, কঠিন আবরণ ভেদ করার আশ্চর্য একটা শক্তি আছে তার। মাটি, প্রবাল, পাথর ইত্যাদির ভেতর দিয়ে অনায়াসে ছড়িয়ে পড়তে পারে সে, এবং বেঁচে থাকতে পারে বিস্ময়কর একটা দীর্ঘ আয়ু নিয়ে।'

'কিন্তু ড. ভিটেলি আর তাঁর সঙ্গীরা মারা গেছেন ছাব্বিশ বছর আগে, তাঁদের লাশের অবশিষ্ট আজও উদ্ধার করা হয়নি কেন? আপনি কি বলতে চান, রঙ্গেলোয় যাওয়া এখনও নিরাপদ নয়? এত বছর পরও...'

'রঙ্গেলো দ্বীপে কবে মানুষ পা ফেলতে পারবে তা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়,' তিক্ত গলায় বললেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কট। 'তবে আমাদের একটা রক্ষণশীল হিসাব হলো, আগামী তিনশো বছরের আগে নয়।'

জাহাজের চার্ট-টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে কবির চৌধুরী। বাঁ হাতের চুরুটটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অর্ধেকের বেশি, কিন্তু ছাইটুকু ঝেড়ে ফেলার কথা মনে নেই তার। গভীর মনোযোগের সাথে এক সেট ব্লু-প্রিন্ট দেখছে সে, সেই সাথে

একটা পেন্সিল দিয়ে নোট করছে। তার সাথে তিনজন লোক রয়েছে ব্রিজে, একজন তার নিজের লোক, বাকি দু'জন শিপইয়ার্ডের।

পারকার একজন নিগ্রো, পাগলা বিজ্ঞানীর অন্ধ ভক্ত সে। ছয় ফুট এক ইঞ্চি, সারা শরীরে চামড়ার ওপর ফুটে আছে মোটা শিরা। চোয়ালের হাড় বের হওয়া প্রকাণ্ড মুখ, কপালের দু'পাশে গভীর দুটো গর্ত, মার্বেল পাথরের মত চকচকে দুটো চোখ। দাঁড়িয়ে আছে প্রভুর ঠিক পিছনে। ট্রাউজারের একটা পকেট ফুলে রয়েছে তার, শোল্ডার হোলস্টার ব্যবহার করার অভ্যাস নেই।

কবীর চৌধুরীর দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিপইয়ার্ডের দু'জন লোক। শক্তিশালী কঠোর চেহারা, মাথায় তোবড়ানো হ্যাট, দু'জনেরই ভুরু কুঁচকে রয়েছে।

'আমার কথা তোমরা বুঝতে পেরেছ?' ব্লু-প্রিন্টগুলো থেকে মুখ তুলে গমগমে ভারী গলায় বলল কবীর চৌধুরী। 'জাহাজটাকে হালকা করতে চাই আমি। প্রতিটি কমপার্টমেন্ট, প্রতিটি অপ্রয়োজনীয় টিউবিং, ভারী মেশিনপত্র, ডেরিকস, এমন কি বাল্কহেডগুলোও ভেঙে ফেলে দিতে হবে।'

কবীর চৌধুরীর বাঁ দিকে দাঁড়ানো লোকটা অবাক বিস্ময়ে কবীর চৌধুরীর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'এসব আপনি কি বলছেন, ক্যাপ্টেন! বাল্কহেড ভেঙে ফেললে শান্ত পানিতেও স্থির রাখা দায় হয়ে পড়বে জাহাজটাকে।'

'ডুগান ঠিক বলছে, ক্যাপ্টেন,' অপর লোকটা বলল। 'ওজন কমালে স্ট্রাকচারাল রেজিস্ট্যান্স বিপন্ন হয়ে পড়বে।'

'তোমাদের আপত্তির কারণগুলো জানা থাকল আমার,' গম্ভীর গলায় বলল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু জাহাজটাকে পানির আরও ওপরে তোলার জন্যে ওজন যেভাবেই হোক চল্লিশ ভাগ কমাতে হবে।'

'বাপের কালেও এমন কথা শুনিনি!' ব্যাপারটাকে মেনে নেবার কোন যুক্তি দেখতে পাচ্ছে না ডুগান। 'শুধু ওয়াটার লাইন ওপরে তোলার জন্যে কেউ একটা চমৎকার জাহাজকে ভেঙে ক্ষতবিক্ষত করে?'

সিধে হয়ে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ডুগানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু তা না, ডুগানের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে, কঠিন সুরে বলল, 'ফের যদি আমার সাথে বেয়াদবী করো, পানিতে চুবিয়ে মারব তোমাকে।' আবার সিধে হলো সে। 'আমি যা বলছি, তাই হবে। অকুজিলিয়ারী মেশিনারী আর আর্মারও ভেঙে ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।' দ্বিতীয় লোকটার দিকে তাকাল সে। 'ডুগান যখন এসব কাজ সারবে, তুমি তখন টাওয়ার মাস্ট ভাঙার আয়োজন শেষ করবে। ঠিক আছে?' প্রশ্নটা হুমকির মত শোনাল।

কিন্তু শিপইয়ার্ডের সুপারিনটেনডেন্ট ডেল জারভিস এত সহজে দমবার পাত্র নয়। 'কিন্তু ক্যাপ্টেন, আপনি আসলে চাইছেনটা কি? এত সুন্দর একটা জাহাজ, কেন শুধু শুধু ভেঙে নষ্ট করতে যাবেন? একে হালকা করার দরকারটা কি, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন দয়া করে?'

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল কবীর চৌধুরী। তার পিছনে স্থির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে পারকার। ডুগান আর ডেল জারভিসের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে সে। হাসি থামিয়ে কবীর চৌধুরী বলল, 'একটা কথা ঠিক বলেছ তুমি,

সুপারিনটেনডেন্ট। এটা একটা সুন্দর জাহাজ। কিন্তু একটা কথা তোমার জানা নেই—এটাকে ভেঙে হালকা করার পরও আমার চোখে এটা সুন্দর থাকবে। সে যাই হোক, এত খবর দিয়ে দরকার কি তোমাদের? এর দিন ফুরিয়েছে বলেই তোমাদের সরকার বিক্রি করে দিয়েছে এটাকে। এ.এ.আর. না কিনলে তোমরা এটাকে নিয়ে কি করতে?' হাসল কবীর চৌধুরী। 'নিশ্চয়ই ভাঙতে। তারপর লোহা-লক্কড় হিসেবে মন দরে বিক্রি করতে। কিন্তু এ.এ.আর. তা করছে না, এই জাহাজের সাহায্যে একটা বিরাট উদ্দেশ্য পূরণ করতে যাচ্ছে তারা। জাহাজটার প্রতি এতটুকু মায়া থাকলে, এজন্যে কৃতজ্ঞবোধ করা উচিত তোমাদের।'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন, আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন,' প্রতিবাদের সুরে বলল সুপারিনটেনডেন্ট ডেল জারভিস। 'আফ্রিকান আর্মি অব রেভলিউশন জাহাজটাকে মেরামত করে কাজে লাগাবে জানার পরই তাদের সাথে কন্ট্রাক্ট সই করেছে আমার কোম্পানী। তারা এটাকে ভেঙে বাতিল করবে জানলে হয়তো ডিরেক্টররা...'

'তুমি প্রলাপ বকছ, ডেল,' বলল কবীর চৌধুরী। 'তোমাদের শিপইয়ার্ড থেকে জাহাজটা নিয়ে চলে যাবার পর এ.এ.আর. এটাকে নিয়ে কি করবে না করবে সে তাদের ব্যাপার, তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার কোন অধিকার নেই। তারা আমাকে বিস্তর টাকা বেতন দিচ্ছে, কাজেই আমি তাদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে যাচ্ছি। জাহাজের দাম আগেই পেয়ে গেছ তোমরা। শুধু তাই নয়, তোমাদের একশো সত্তর জন লেবারকে অগ্রিম টাকা দিয়ে ভাড়া করেছে তারা। যাই হোক, তোমরা যদি আমার নির্দেশ মত কাজ না করো, আমি বাধ্য হয়েই এ.এ.আর. এর ট্রেজারীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে পরবর্তী পেমেন্ট বন্ধ রাখার জন্যে অনুরোধ করব। সেটার তাৎপর্য কি, নিশ্চয়ই তা তোমাকে বুঝিয়ে দেয়ার দরকার করে না? একশো সত্তর জন লেবার, ওদেরকে তোমরা এই মুহূর্তে কোন কাজ দিতে পারছ না। এখন যদি আমরা অন্য কোন শিপাইয়ার্ডের সাহায্য নিই, ওরা সবাই বেকার হয়ে যাবে। তাই চাও নাকি?'

ডুগান আর ডেল জারভিস দৃষ্টি বিনিময় করল, তাদের কঠোর চেহারায় পরাজয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। কাঁধ ঝাঁকাল ডেল, বলল, 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। আপনার কথাই শিরোধার্য।'

'গুড। ধন্যবাদ। ভুল বোঝাবুঝির আর কোন অবকাশ নেই যখন, এবার আমরা কাজের কথা শুরু করতে পারি,' ঠোঁটে এক টুকরো আত্মবিশ্বাস ভরা হাসি নিয়ে বলল কবীর চৌধুরী।

এক ঘন্টা পরের কথা। শিপইয়ার্ডের লোক দু'জন ব্রিজ থেকে নেমে জাহাজের মেইন ডেকের দিকে যাচ্ছে। 'আচ্ছা, শুনতে ভুল করিনি তো আমরা, ডুগান?' চাপা গলায় বলল সুপারিনটেনডেন্ট ডেল জারভিস, 'ভাবছি, লোকটার মাথায় মগজ আছে নাকি সীসা? অর্ধেক সুপারস্ট্রাকচার, ফানেল, সামনের আর পিছনের গান টাওয়ার সব ভেঙে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় প্লাইউডের নকল জিনিস সাজাতে হবে!'

'ভুল শোনেননি,' বলল ডুগান। 'ক্যাপ্টেন লোকটা বদ্ধ উন্মাদ। ওর ধারণা,

এসব বাদ দিলে জাহাজের ওজন পনেরোশো টন কমানো সম্ভব।'

'কিন্তু আসল জিনিস সরিয়ে সে-জায়গায় নকল ডামি কেন?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, সুপারিনটেনডেন্ট। অনেক মাথা ঘামিয়েছি, কোন উত্তর পাইনি।'

'আফ্রিকায় নিয়ে যাবার পর এই জাহাজটাকে কি কাজে লাগাবে এ.এ. আর. কিছু অনুমান করতে পারো?'

'আফ্রিকায় নিয়ে যাবে বলেছে, না? কেন যেন, বিশ্বাস হয় না আমার। তাছাড়া, ভেঙেচুরে ওজন কমাবার পর এমন টালমাটাল অবস্থা হবে জাহাজটার, চেসাপীক ছাড়িয়ে খুব বেশি দূর যেতে পারবে বলে মনে করি না।'

'অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে লোকটার···'

'সেটা কি জানতে পারলে হত,' বলল ডুগান। 'চেষ্টা করে দেখব নাকি? আড়ি পেতে শুনব ওদের কথা?'

'লোকটা ভয়ঙ্কর, ডুগান,' দ্রুত বলল ডেল জারভিস। 'ওর সাথে চালাকি করতে যাওয়া উচিত হবে না।'

'থাক তাহলে,' বলল ডুগান। জানে, কারও ব্যাপারে অহেতুক নাক গলানো বা কোন অন্যায় কাজ পছন্দ করে না সুপারিনটেনডেন্ট। একটু পর আবার বলল সে, 'আজ সন্ধ্যার পর কিন্তু আমাকে দু'ঘণ্টার জন্যে ছুটি দিতে হবে। ওই যে মেয়েটার কথা বলেছি আপনাকে, আজ সে আমাকে শেষ কথা জানাবে।'

মৃদু হেসে সুপারিনটেনডেন্ট বলল, 'ঠিক আছে, কিন্তু রাত দশটার মধ্যে ফিরে এসো, এদিকে কাজের চাপ কেমন তা তো বুঝতেই পারছ। আর শোনো, একটু সাবধানে থেকো। তুমি কোন গোলমালে জড়িয়ে পড়ো আমি তা চাই না। শুনেছি, মেয়েটার নাকি আরও প্রেমিক আছে। যা করার ভেবেচিন্তে কোরো।'

হাতে জ্বলন্ত চুরুট, নেভিগেশনাল চার্টের ভাঁজ খুলে গভীর মনোযোগের সাথে মার্কিংগুলো পরীক্ষা করছে কবীর চৌধুরী। প্রথমে স্রোতের সামগ্রিক প্রচণ্ডতা, সাময়িক তীব্রতা আর আকস্মিক গতিহীনতার হিসাব কষল সে। তারপর পরীক্ষা করল জোয়ার-ভাটার অবস্থা। চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠল। ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল চুরুটে, তারপর কি মনে করে নিঃশব্দে তাকাল একবার পিছন দিকে।

স্থির পাথরের মূর্তির মত ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে পারকার। 'স্যার!' প্রভু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে মৃদু গলায় বলল সে। শুধু ঠোঁট জোড়া নড়ল তার।

উত্তরে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না কবীর চৌধুরী। ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আবার চার্টের দিকে মন দিল সে। এবার আলাদাভাবে তার গন্তব্যের প্রতিটি মাইলকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শুরু করল। মনে গেঁথে নিচ্ছে প্রতিটি বয়া, লাইটহাউসের আওতা, এবং চ্যানেল মার্কার। খানিক পর চোখ বুজল সে, না দেখে স্মরণ করছে প্রতিটি খুঁটিনাটি।

কঠিন, প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। এমন কি প্রতিটি বাধা বিশ্লেষণ করে সেগুলোকে সাফল্যের সাথে টপকে যাবার পরও নানা ধরনের উটকো বিপদ দেখা

দিতে পারে। নির্দিষ্ট দিনটা এখনও দূরে রয়েছে, সেদিন আবহাওয়া কেমন থাকবে বলা মুশকিল। পথে আসা-যাওয়া করবে অন্যান্য জাহাজ, তাদের সাথে সংঘর্ষ ঘটার ভয় আছে। কিন্তু এসব ছোটখাট বিষয় হালকাভাবে গ্রহণ করেনি কবীর চৌধুরী। নির্দিষ্ট দিনের আগে ধরা পড়ে যেতে পারে সে, শুধু এই চিন্তাটা মাথায় ঢোকেনি তার।

রাত ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ক্লান্ত চোখ দুটো হাত দিয়ে রগড়াচ্ছে কবীর চৌধুরী। তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। চোখ বুজল। খানিক পর বলল, 'তোমার কি মনে হয়, পারকার? অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ সফল হলে কবীর চৌধুরীকে ভয় করবে দুনিয়ার মানুষ?'

গুঙিয়ে উঠল পারকার। ভোঁতা একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে। আনন্দ প্রকাশের এটা একটা নিজস্ব ধরন তার। গলার আওয়াজটা ঘড়ঘড়ে, যেন গলার ভেতর একরাশ কফ জমে আছে, 'কয়েক লাখ মরছে তো, স্যার?'

'কমপক্ষে।'

'আপনার তুলনায় শয়তানকে ফেরেশতা বলে মনে করবে ওরা…' মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেল পারকার, পরমুহূর্তে হুংকার ছাড়ল, 'কে ওখানে?'

এক ছুটে রেইলিংয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ব্রিজের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছে একজন লোক। আশ্চর্য একটা নির্দয় হাসি ফুটে উঠল পারকারের ঠোঁটে। ইতিমধ্যে তার হাতে বেরিয়ে এসেছে রিভলভারটা। ডেকের ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে লোকটা। ধীর ভঙ্গিতে রিভলভারটা তুলে লক্ষ্য স্থির করল পারকার। লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না তার। ট্রিগার টিপতে যাবে, এই সময় পিছনে শান্ত গলা শোনা গেল কবীর চৌধুরীর, 'বোকামি করতে যাচ্ছ, পারকার।'

'আমাদের কথা শুনে ফেলেছে, স্যার!'

'জানি,' গম্ভীর গলায় বলল কবীর চৌধুরী। 'এও জানি, বাঁচার অধিকার হারিয়েছে ও। কিন্তু এখানে নয়, পারকার। রক্তপাতটা অন্য কোথাও হওয়া চাই। যাও।'

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে প্রভুকে সমর্থন করল পারকার, তারপর তরতর করে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

ওদিকে ডেকের কিনারায় পৌঁছে গেছে লোকটা, লাফ দিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিশ সেকেণ্ড পর সেই একই জায়গা থেকে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ল পারকার।

ইচ্ছে করলে আরও আগে ধরতে পারত লোকটাকে পারকার, কিন্তু সুবিধে মত একটা জায়গায় ধরার জন্যে পনেরো মিনিট তাকে ধাওয়া করে বেড়াল সে। পারকারের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে এ-গলি সে-গলি করছে ডুগান। কল্পনাও করতে পারেনি যে ধরতে পারলে তাকে মেরে ফেলা হবে।

অন্ধকার নির্জন একটা গলিতে কাজটা সারল পারকার। অনায়াস ভঙ্গিতে পিছন থেকে ডুগানের মাথার চুল মুঠো করে ধরে তাকে থামাল সে, বলল, 'থামো, কথা আছে।' গলার আওয়াজটা বিদঘুটে হলেও শান্ত। তেমন ভয় পেল না ডুগান,

দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ফেরো আমার দিকে,' মৃদু গলায় বলল পারকার।

দু'কোমরে হাত রেখে রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল ডুগান।

ডুগানের বুকের খাঁচার ঠিক নিচে ঘ্যাচ্ করে ছুরির তিন ইঞ্চির ফলা ঢুকিয়ে দিল পারকার, হাতলের কিনারা পর্যন্ত পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাবার পর হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে আনল সে ছুরিটাকে। বুকের নিচে থেকে নাভি পর্যন্ত ফাঁক হয়ে গেল। ছুরিটা টেনে বের করে নিয়ে ডুগানের কাঁধে একটা হাত রাখল সে। পড়ে যাচ্ছিল শরীরটা, কাঁধে হাত পড়তে স্থির হয়ে গেল। ডুগানের শার্টে ছুরির ফলাটা ঘষে রক্তটুকু মুছে নিয়ে নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল পারকার। হন হন করে হাঁটছে। খানিক পর শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এল গলি থেকে মেইন রোডে।

আধ ঘণ্টা পর একজন টহল পুলিস আবিষ্কার করল ডুগানকে। তখনও সে বেঁচে আছে। কিন্তু হাসপাতালে যাবার পথে মারা গেল। মারা যাবার আগে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করে গেল সে—"ব্যাটলশিপ···অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ··· কবীর চৌধুরী···"।

নয়

প্রায় ষাট বছর বয়েস, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর দুর্ধর্ষ কাউবয়ের মত চেহারা অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের। ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা, ক্লিনশেভ, দু'চোখে ক্ষুরধার বুদ্ধির ঝিলিক, চলাফেরার ঋজু ভঙ্গিতে গম্ভীর থমথমে একটা ব্যক্তিত্ব। ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সী একটা আধা-সরকারী সংস্থা, শুরু থেকেই তিনি এই সংস্থার চীফ ডিরেক্টর। সবাই জানে, সিসমোলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট আর ওসেনোগ্রাফী নিয়ে গবেষণা করে নুমা। কিন্তু নুমা যে আসলে গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে তা কেউ জানে না, কারও জানার কথা নয়। এই সংস্থার সমস্ত তৎপরতা সতর্কতার সাথে গোপন রাখা হয়, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন একমাত্র প্রেসিডেন্টকেই শুধু এই সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে থাকেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে দু'জনের মধ্যে। অ্যাডমিরালের ওপর অগাধ আস্থা রাখেন প্রেসিডেন্ট, তাই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন দেশের নিরাপত্তা অটুট রাখার বিরাট একটা দায়িত্ব। কাজের সুবিধের জন্যে প্রেসিডেন্ট তাঁকে প্রায় সীমাহীন ক্ষমতা দিয়েছেন, যোগ্য পরিচালকের হাতে পড়ে সেই ক্ষমতা দেশের মঙ্গলের কাজে সার্থকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু এসবই ভেতরের ব্যাপার, এমন কি প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ মহলেরও অনেকে জানেন না নুমার আসল কাজ কি, বা অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন কি প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী।

সেভেন আপের বোতল থেকে শেষ পানীয়টুকু স্ট্র দিয়ে টেনে নিয়ে কালো রঙের প্রকাণ্ড চুরুটে লম্বা একটা টান দিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। তারপর

একে একে তাকালেন গম্ভীর থমথমে চারটে মুখের দিকে। ডেস্কের সামনে বসে আছে ওরা চারজন—অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কট, কর্নেল রেজনিক, বেন নেলসন এবং মাসুদ রানা।

'পেন্টাগনের ভূমিকাটা অবিশ্বাস্য,' আবার শুরু করলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'এমন একটা আবিষ্কারের খবর পেয়ে পিলে পর্যন্ত চমকে ওঠার কথা, তা না, গোটা ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব তো দেয়ইনি, বরং ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করেছে। কারণ?'

'কারণ আর কিছু নয়,' বললেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন, 'সেক্সটন ফাইভ-থ্রী আর কিউ-ডি প্রজেক্টের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক আছে তা জানা নেই ওদের।'

'তা কি করে হয়?'

'ড. ভিটেলি আর তাঁর সঙ্গীদের মৃত্যুর পর আমরা যারা প্রজেক্টের সাথে জড়িত ছিলাম তারা সাংঘাতিক ভয় পেয়ে যাই। অল্প কয়েকজন ছিলাম আমরা, সবাই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিই, কুইক-ডেথের চিহ্নমাত্র রাখা চলবে না। সিদ্ধান্তটা অনুমোদন পাবার পর কুইক-ডেথের সমস্ত স্মৃতি চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়।'

'আপনি বলতে চান,' ভুরু কুঁচকে উঠেছে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের, 'চীফস্ অব স্টাফকে কিছুই না জানিয়ে গোটা একটা ডিফেন্স প্রজেক্ট ধ্বংস করে দেন আপনারা?'

'হ্যাঁ। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সরাসরি নির্দেশ পেয়ে জয়েন্ট চীফস্ অব স্টাফকে আমি রিপোর্ট করি, ড. ভিটেলি-র মৃত্যুর সাথে সাথে কুইক-ডেথ এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হয়ে গেছে।'

'আর সবাই তা মেনেও নিল?'

'আসল ব্যাপার ক'জনই বা জানত যে কারও মনে সন্দেহ দেখা দেবে?' বললেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। 'প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ডেভিড সেলজার, আমি, আর কয়েকজন মাত্র বিজ্ঞানী ছাড়া কেউ সঠিকভাবে জানত না ড. ভিটেলি ঠিক কি আবিষ্কার করেছেন। জয়েন্ট চীফস্ অব স্টাফ শুধু জানতেন, এটা আরেকটা স্বল্প বাজেটের কেমিক্যাল-বায়োলজিক্যাল ওয়রফেয়ার সংক্রান্ত এক্সপেরিমেন্ট। আসল ব্যাপার কেউ জানত না বলেই কোন জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি আমাদেরকে। ব্যর্থতাটাকে সবাই স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে।'

'কিন্তু সামরিক কর্মকর্তাদের কাছে ব্যাপারটা গোপন করে যাওয়া হলো কেন?'

'বুড়ো সৈনিক আইসেনহাওয়ার পাইকারী হত্যাযজ্ঞের বিরোধী ছিলেন, মাস-কিল উইপন দু'চোখের বিষ ছিল তাঁর।' চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। গভীর চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে তাঁকে। 'কুইক-ডেথ টীমের আমিই একমাত্র জীবিত সদস্য,' ধীরে ধীরে কথা বলছেন তিনি। 'দুঃখ এই যে আমার মৃত্যুর সাথে সাথে রহস্যটার মৃত্যু হবে না। এতদিন তাই আশা করে এসেছি। কিন্তু,' রানার দিকে তাকালেন তিনি, 'মি. রানা সেই ভয়ঙ্কর মহামারীর বীজকে এতদিন পর আবার আবিষ্কার করেছেন। এতদিন মুখ খুলিনি আমি, পেন্টাগনকে কিছু জানাইনি। আজও জানাতে চাই না। কারণ, আমার ভয় হয়, সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর কার্গো

উদ্ধার করে জাতীয় প্রতিরক্ষার নামে সেটাকে মওজুদ রাখবে ওরা। এবং যুদ্ধের সময় ব্যবহারও করবে।'

'তাতে আপনার আপত্তির কি আছে?' অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন জানতে চাইলেন, 'দেশকে রক্ষার প্রশ্নে...'

হতাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। 'কুইক-ডেথের ভয়ঙ্করত্ব আপনি অনুধাবন করতে পারেননি, অ্যাডমিরাল,' নিচু গলায় বললেন তিনি। 'পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। একটা উদাহরণ দিই—ম্যানহাটন আইল্যাণ্ডে মাত্র এক আউন্স কিউ-ডি ফেলা হলে, চার ঘণ্টার মধ্যে শতকরা আটানব্বুই জন লোক মারা যাবে। এবং কেউ, আমি আবার বলছি, কেউ, কোন মানব সন্তান আগামী তিন শতাব্দী ওই দ্বীপে পা ফেলতে পারবে না। ভবিষ্যৎ বংশধররা নিউজার্সির কিনারায় দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে শুধু দেখতে পাবে, তাদের পূর্ব-পুরুষদের কঙ্কালের ওপর আকাশ-ছোঁয়া পুরানো ভবনগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে।'

কয়েক মুহূর্ত কারও মুখে কথা নেই। অস্বস্তিকর একটা নীরবতা। সবাই কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে, একটা শহরে ছড়িয়ে রয়েছে ত্রিশ লাখ মৃতদেহ। তারপর প্রথম কথা বলল রানা, 'ব্রুকলিন আর ব্রুনক্স-এর লোকজন তাতে আক্রান্ত হবে না?'

'কুইক-ডেথ দল বেঁধে বিচরণ করে। আশ্চর্যের ব্যাপার, মানুষের ছোঁয়াছুঁয়িতে বা বাতাসে ভর করে ছড়ায় না। পানির বাধা পেলে থেমে যায়, তা নাহলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কিভাবে ছড়ায়, জানা যায়নি। রকেট বা বিমানের সাহায্যে কিউ-ডি যদি উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে দেয়া যায়, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ডে পরিণত হবে গোটা মহাদেশ। দু'হাজার তিনশো খ্রিস্টাব্দের আগে এখানে কেউ আর পা ফেলতে পারবে না।'

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সবাই।

'কিউ-ডি-কে মারতে পারে এমন কিছু নেই?' অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভাঙলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

'এইচ-টু-ওহ্,' বললেন জ্যাক ডেনটন। 'প্রচুর অক্সিজেন আছে, শুধু এইরকম আবহাওয়ায় বেঁচে থাকতে পারে কুইক-ডেথ। বলতে পারেন, পানিতে ডোবালে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায় ওরা, ঠিক আমাদের মত।'

'একমাত্র ড. ভিটেলিই কুইক-ডেথ তৈরি করতে পারতেন?' জানতে চাইল কর্নেল রেজনিক।

এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসি দেখা দিল জ্যাক ডেনটনের ঠোঁটে। 'এমন ভয়ঙ্কর একটা ডাটা একজন মাত্র লোকের কাছে থাকবে, তা আমি হতে দিই কিভাবে?'

'তার মানে ড. ভিটেলির সমস্ত রেকর্ড নষ্ট করে ফেলেছিলেন আপনি?'

'শুধু তাই নয়, প্রজেক্টের সমস্ত অর্ডার, পেপারওয়র্ক, যখন যেটা আমার চোখে পড়েছে সব আমি হয় পুড়িয়ে ফেলেছি, নয়তো ভুয়া তথ্য ভরে সম্পূর্ণ চেহারাই বদলে দিয়েছি। যেমন সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর অরিজিনাল ফ্লাইট প্ল্যান।'

কর্নেল রেজনিক স্বস্তির একটা হাঁফ ছেড়ে হেলান দিল চেয়ারে। 'যাক, একটা

ধাঁধার অন্তত উত্তর পাওয়া গেল।'

'কিন্তু কোথাও কোন সূত্র নিশ্চয়ই রয়ে গেছে,' বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। নতুন একটা কালো চুরুট ধরালেন তিনি। 'সব সময়ই তা থেকে যায়।'

'রঙ্গেলো দ্বীপে কঙ্কালগুলো রয়েছে,' বলল রানা। 'জেলেরা সেখানে গেলে কে তাদেরকে নিষেধ করছে?'

'সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত নটিক্যাল চার্টে রঙ্গেলো দ্বীপকে হাইড্রোজেন সায়ানাইড ফেলার ডাস্টবিন হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর গোটা তীরটাকে সতর্কবাণী লেখা বয়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।'

'হাইড্রোজেন সায়ানাইড,' অবাক হয়ে বলল বেন নেলসন, 'খারাপ কোন ওষুধের মত শোনাচ্ছে।'

'হ্যাঁ। ওটা একটা ব্লাড এজেন্ট, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্ত কলকজার কাজে বাধার সৃষ্টি করে। ডোজ বেশি হলে, সাথে সাথে মৃত্যু। এসব তথ্য চার্টে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আর প্রতিটি বয়াতে ছয়টা ভাষায় লেখা আছে।' জ্যাক ডেনটন রুমাল বের করে ঘামে ভর্তি টাক মাথাটা মুছলেন। 'তবে কিউ-ডি-র কিছু কিছু তথ্য লোকচক্ষুর আড়ালে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে, যা চেষ্টা করলেও কেউ কিছুতেই উদ্ধার করতে পারবে না।'

'মানে?' জানতে চাইল রানা।

'পেন্টাগনের হাই-সিকিউরিটি ভল্ট, যার নাম এফ.ই.ও., তার ভেতর আজও কুইক-ডেথ প্রজেক্টের কিছু প্রমাণপত্র আছে।'

'এফ.ই.ও.?'

'ফিউচার আইজ ওনলি,' ব্যাখ্যা দিলেন জ্যাক ডেনটন। 'শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ চোখের জন্যে। প্রতিটি ফাইল সীল করা, প্রতিটির গায়ে নির্দিষ্ট একটা তারিখ লেখা আছে, তার আগে কেউ ওটা খুলতে পারবে না। নির্দিষ্ট তারিখের আগে এমন কি স্বয়ং প্রেসিডেন্টও কোন ফাইল খুলে ভেতরে কি আছে দেখতে পারবেন না। ওই ভল্টে জাতির কঙ্কাল রেখে দেয়া হয়েছে। আন-আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট, প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যু, সতেরো শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় যে ফ্লু দেখা দিয়েছিল সে-ব্যাপারে সরকারের রহস্যময় ভূমিকা, রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি, ইত্যাদি আরও অসংখ্য বিষয়ের ওপর ফাইল রয়েছে ওখানে। কিউ-ডি প্রজেক্টের ফাইলের গায়ে তারিখ লেখা আছে দু'হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ। ততদিনের মধ্যে, আইসেনহাওয়ার ধারণা করেছিলেন, আমাদের উত্তরপুরুষরা কুইক-ডেথের প্রয়োজন আছে বলে মনে করবে না।'

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ফিউচার আইজ ওনলি-র কথা জানেন, কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করলেন না।

'আপনি তাহলে আমাদেরকে কিভাবে বিশ্বাস করে সব কথা বলে ফেলছেন, অ্যাডমিরাল?' প্রশ্নটা এল রানার তরফ থেকে।

'অনেক চিন্তাভাবনা করে এই বৈঠকের জন্যে অনুরোধ করেছি আমি, মি. রানা,' বললেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। 'কাউকে বিশ্বাস না করে উপায় কি

আমার? আমি চাই কুইক-ডেথ উদ্ধার করে তা ধ্বংস করে ফেলা হোক। আপনাদেরকে বিশ্বাস করা যায় কিনা, আমি জানি না। কিন্তু আমি জানি, পেন্টাগনকে বিশ্বাস করা যায় না।'

'কিন্তু এর মধ্যে আমাদের জন্যে যে ঝুঁকিটা রয়েছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি?' ভারী গলায় বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'পেন্টাগন জানতে পারলে, আমাদের সবার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হতে পারে।'

'ঝুঁকি আছে তা আমি অস্বীকার করি না,' বললেন জ্যাক ডেনটন। 'কিন্তু বিবেক এবং জন সমর্থন আমাদের পক্ষে থাকবে।'

'মানব জাতির ত্রাতা হিসেবে নিজেকে কল্পনা করতে ভালই লাগে আমার,' বাঁকা একটু হেসে বলল বেন নেলসন। 'কিন্তু এত বড় ঝুঁকি নেবার কথা মনে হলেই কলজে শুকিয়ে যাচ্ছে।'

অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কর্নেল রেজনিক। 'অপরাধে সহায়তা করার জন্যে আপনি আমাকে বেছে নিয়ে ভুল করছেন, অ্যাডমিরাল। সেক্সটন ফাইভ-থ্রী উদ্ধার করার ব্যাপারে আমার কোন ভূমিকা আছে বলে তো মনে হয় না।'

রহস্যময় হাসি হাসলেন জ্যাক ডেনটন। 'বিশ্বাস করুন, কর্নেল, টীমের মধ্যে আপনার ভূমিকাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কঠিন। আপনার রিপোর্ট থেকেই সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছে এয়ারফোর্স। সৌভাগ্যই বলতে হবে, সরকারের উঁচু পর্যায় থেকে কেউ একজন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানো হবে না। আপনার কাজ হবে পেন্টাগন যাতে তাদের সিদ্ধান্ত না বদলায় সেদিকটা দেখা। ওরা আগ্রহী হয়ে উঠতে শুরু করেছে বলে মনে হলেই, আপনি ওদেরকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করবেন। তাছাড়া, ক্রুদের লাশগুলো তোলার দায়িত্ব পেয়েছেন আপনি, তাই না? লাশ তোলার ফাঁকে একটু সময় দেবেন, ওরই মধ্যে লেক থেকে প্লেনটা তুলে ফেলার ব্যবস্থা করবেন মি. রানা।'

'এ-ব্যাপারে তোমার মতামত কি, আমি জানতে চাই, রানা।' চুরুটের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছিল রানা, অ্যাডমিরালের কথায় নড়েচড়ে উঠল সে। 'আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, কিউ-ডি অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে,' এক সেকেণ্ড একটু ইতস্তত করল ও, তারপর আবার বলল, 'পেন্টাগনকে ভয় করার পাত্র আপনি নন, অতীতে তা বহুবার প্রমাণ করছেন, কাজেই আমাদের সামনে আর কোন বাধা নেই। অবশ্য আপনাদের বাজেটের কি অবস্থা তা আমার জানা নেই...'

'মানি ইজ নো প্রবলেম,' রানাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'কিন্তু রানা, তোমার কাছ থেকে পরিষ্কারভাবে একটা কথা জানতে চাই আমি।'

'বলুন, অ্যাডমিরাল।'

'গোটা অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। রাজি?'

'সেক্ষেত্রে আমার অন্তর্ভুক্তিটা আইনসম্মত হওয়া চাই,' বলল রানা। 'দায়িত্বটা দিয়ে নুমা আমার সাথে একটা এগ্রিমেন্টে সই করুক। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ

থাকবে, কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকব না আমি, এবং প্রয়োজনে যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারব।'

'গুড। তাই হবে।' স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের চেহারায়। রানাকে তিনি অনেকদিন থেকে চেনেন এবং বিশ্বাস করেন, তাই এই শর্ত নিয়ে কোনরকম মাথা ঘামালেন না। বন্ধু রাহাত খানের কাছ থেকে শুনেছেন, এবং তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাও বলে, নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করার জন্যে কিছু শর্ত সব সময়ই থাকে মাসুদ রানার।

বৃদ্ধ জ্যাক ডেনটনের দিকে তাকাল রানা। 'আমি আর বেন স্যালভেজ অপারেশনটা সামলাব। মেটাল ক্যানগুলো উদ্ধারের পর কুইক-ডেথ কিভাবে ধ্বংস করা যায় সে-ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন আপনি?'

'ওয়রহেডগুলো আমরা গভীর সমুদ্রে ফেলে দেব,' সাথে সাথে উত্তর দিলেন জ্যাক ডেনটন। 'যথাসময়ে, ওপরের আবরণ যখন ক্ষয়ে যাবে, পানির সংস্পর্শে আপনাআপনি মারা যাবে মহামারীর বীজ।'

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের দিকে ফিরল রানা। 'অ্যাডমিরাল, আপনাদের স্যালভেজ মাস্টার মারটিন প্যানজারকে দরকার হবে আমার। প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টসহ ওকে আমি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে টেবল লেকে চাই।'

'পাবে। আর কিছু?'

'আপাতত নয়।'

'এইমাত্র একটা চিন্তা ঢুকল মাথায়,' বলল বেন। 'পানিই যদি কিউ-ডি-র একমাত্র শত্রু হয়, টেবল লেক থেকে তাকে তোলার দরকারটা কি?'

'আপনাদের চোখে পড়েছে ওটা, কাজেই অন্য কারও চোখেও পড়তে পারে,' বললেন জ্যাক ডেনটন। 'ওখান থেকে তুলে এমন জায়গায় ফেলতে হবে ওটাকে, যেখানে কোন মানুষের চোখ যাবে না। যীশুকে এই জন্যে ধন্যবাদ দিই যে এত বছর ধরে লেকের তলায় পড়ে থাকলেও কেউ এর সন্ধান পায়নি।'

'এ থেকে আরেকটা প্রসঙ্গ উঠছে,' বলল রানা। লক্ষ করল, বেন আর রেজনিকের দু'জোড়া চোখে হঠাৎ অস্বস্তির ছায়া পড়ল।

ভুরু কুঁচকে উঠেছে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের। রানার গলার সুর শুনে সতর্ক হয়ে গেছেন তিনি। 'কি ব্যাপার, রানা?'

'অরিজিনাল ফ্লাইট প্ল্যানে বলা হয়েছে, সেক্সটন ফাইভ-থ্রী বাকলী ফিল্ড ত্যাগ করেছিল চারজন ক্রু নিয়ে। ঠিক, অ্যাডমিরাল ডেনটন?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে জ্যাক ডেনটন। 'হ্যাঁ, চারজন।'

'প্রসঙ্গটা সম্ভবত আরও আগে তোলা উচিত ছিল আমার,' বলল রানা। 'কিন্তু ব্যাপারটাকে আমি জটিল করে তুলতে চাইনি...'

'ভণিতা করা তোমার স্বভাব নয়,' একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ দিতে যাচ্ছ, রানা?'

'আমি পাঁচ নম্বর কঙ্কালের কথা বলতে চাইছি, অ্যাডমিরাল।'

'পাঁচ নম্বর কি?'

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর কার্গো সেকশনের মেঝেতে একটা লোকের হাড়গোড়,

স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখে এসেছি আমি।'

ঝট করে জ্যাক ডেনটনের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'কাঁর কথা বলছে রানা, আপনার কোন ধারণা আছে?'

স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন জ্যাক ডেনটন, কষে যেন কেউ চড় মেরেছে তাঁর মুখে। 'গ্রাউণ্ড মেইন্টেন্যান্সের কোন লোক,' বিড় বিড় করে বললেন তিনি, যেন নিজের সাথে কথা বলছেন। 'প্লেন টেক-অফ করার সময় নিশ্চয়ই রয়ে গিয়েছিল ভেতরে...'

'না, তা নয়,' বলল রানা। 'তা হতে পারে না। এই কঙ্কালের গায়ে এখনও মাংস রয়েছে। কিন্তু ক্রুদের গায়ে নেই।'

'কিন্তু আপনি বলেছেন,' কাঁপা গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন জ্যাক ডেনটন, 'মেটাল ক্যানগুলোর কোন ক্ষতি হয়নি!'

'বলেছি। ক্যানগুলো খোলার চেষ্টা করা হয়েছে এমন কোন লক্ষণ আমার চোখে পড়েনি।'

'মাই গড, মাই গড,' দু'হাতে মুখ ঢাকলেন জ্যাক ডেনটন। 'প্লেনটার কথা আরও কেউ জানে!'

'তা নিশ্চয় করে জানি না আমরা,' বলল কর্নেল।

মুখ থেকে হাত নামিয়ে রানার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন জ্যাক ডেনটন। 'তুলে আনুন ওকে, মি. রানা! প্লীজ! মানব সভ্যতার স্বার্থে সেক্সটন ফাইভ-থ্রীকে তুলে আনুন লেকের তলা থেকে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

ওয়াশিংটন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর ডিরেক্টর ডেভিড মরগানের বাড়ি। রাত এগারোটা।

বিছানায় শুয়ে পড়াশোনা করছেন ডেভিড মরগান। এটা তাঁর রোজকার অভ্যাস। অফিসের ডেস্কে জমে ওঠা হালকা ফাইলগুলো বগলদাবা করে বাড়িতে নিয়ে আসেন, প্রতিটিতে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর ঘুমুতে যান। তাঁর এই বাতিকের জন্যে বিরক্ত হয়ে আরেকটা বেডরূমের ব্যবস্থা করেছেন মিসেস মরগান, আলো জ্বালা থাকলে ঘুমাতে পারেন না তিনি।

দুটো বালিশে পিঠ দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে আছেন ডেভিড মরগান, পাশ থেকে একটা করে ফাইল তুলে নিয়ে বুকের ওপর রেখে খুলছেন। বিছানার ওপরই অ্যাশট্রে, মদের সাজ-সরঞ্জাম, চুরুটের প্যাকেট, লাইটার, আরেক জোড়া অপটিকাল গ্লাস, টেলিফোন সেট ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চশমাটা নাকের ডগায় নেমে এসেছে তাঁর। নতুন একটা ফাইল খুলেই পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে তুলেছেন। ফাইলের গায়ের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা বিষয়টা আরেকবার দেখে নিলেন—'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ'।

'ব্যাপার কি!' আনমনে বিড়বিড় করছেন ডেভিড মরগান। 'ব্যাটলশিপ! অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ...কবীর চৌধুরী?' ফাইলে লিপিবদ্ধ সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া আরেকবার পড়ে গেলেন তিনি। ডুগান নামে একজন লোক, পুলিসের ধারণা, সে তার প্রেমিকার সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল, পথে কে বা কারা তাকে ছুরি মারে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে মারা যায় সে। লোকটা ফর্বস্ মেরিন

স্ক্র্যাপ অ্যাণ্ড স্যালভেজ কোম্পানীর একজন ঠিকাদার, লেবার যোগান দিত। পুলিস তার প্রেমিকাকে গ্রেফতার করেছে। মেয়েটার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ডুগানের মত আরও অনেক পুরুষকে বিয়ে করার আশা দিয়ে টাকা-পয়সা আদায় করত। পুলিসের সন্দেহ ডুগান বিয়ে করার জন্যে জেদ ধরায় লোক দিয়ে তাকে খুন করিয়েছে মেয়েটা। মারা যাবার আগে ডুগান বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা কথা উচ্চারণ করে গেছে, যার কোন অর্থ করতে পারেনি পুলিস। ব্যস, রিপোর্ট বলতে এইটুকু।

ফাইলটা বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন যুক্তরাষ্ট্রের এন.এস.এ. চীফ। হত্যারহস্য নিয়ে মাথা ঘামানো ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর কাজ নয়। কাজেই ডুগানের প্রেমিকাকে গ্রেফতার করে পুলিস ঠিক করেছে নাকি ভুল করেছে তা ভেবে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তবে ডুগানের শেষ কথাগুলোর নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে। কবীর চৌধুরী, সেই প্রতিভাবান উন্মাদটা তবে কি আবার কোন অনর্থ ঘটাবার মতলব ফেঁদেছে? অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ, এরই বা মানে কি? ব্যাটলশিপ…কবীর চৌধুরীর সাথে ব্যাটলশিপের কি সম্পর্ক?

ফাইলটা একপাশে নামিয়ে রেখে টেলিফোন সেটটা কাছে টেনে নিলেন এন. এস.এ. চীফ। ডায়াল করে বললেন, 'আমি ডেভিড মরগান। সমস্ত মার্কিন এবং বিদেশী ব্যাটলশিপের বর্তমান স্ট্যাটাস সম্পর্কে রিপোর্ট চাই।…হ্যাঁ, তাই,—ব্যাটলশিপ। কাল কোন এক সময় আমার টেবিলে।…ধন্যবাদ। গুড নাইট।'

পরদিন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সী। হেডকোয়ার্টার।

চেম্বারে বসে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত চীফ ডেভিড মরগান, অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ-এর কথা মনেই নেই তাঁর। সেক্রেটারি বারবারা ঢুকল ভেতরে। 'আমাকে ডেকেছেন, স্যার?'

'বসো,' বললেন মরগান। হাতের ফাইলটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখলেন তিনি। 'নোট নাও।'

ঝাড়া পনেরো মিনিট বলে গেলেন মরগান, তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে ডেস্কের ওপর উঁচু হয়ে থাকা হাইলি ক্লাসিফায়েড রিপোর্টগুলো ঘাঁটতে শুরু করলেন।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর বারবারা মৃদু গলায় বলল, 'আমি সাহায্য করতে পারি, স্যার?'

'সমস্ত ব্যাটলশিপের একটা স্ট্যাটাস চেক। আজই ডেলিভারি পাবার কথা।'

ডেস্কের এক কোণ থেকে নীল কাগজের একটা এনভেলাপ তুলে নিল বারবারা। চীফের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সেই আটটা থেকে পড়ে রয়েছে এখানে, স্যার।'

'পড়েছ?' জানতে চাইলেন মরগান।

'জ্বী, স্যার।'

'কি আছে ওতে?'

'মানে, স্যার, আপনি ঠিক কি জানতে চান…'

'ধরো একটা ব্যাটলশিপ কিনতে চাই আমি। কে বিক্রি করবে?'

সাথে সাথে উত্তর দিল বারবারা, 'বিক্রি করার মত ব্যাটলশিপ বাজারে একটাও

নেই, স্যার। সোভিয়েট ইউনিয়ন আর ফ্রান্স তাদের ব্যাটলশিপগুলোকে মেরামত করে যুদ্ধের প্রয়োজনে রেখে দিয়েছে। কিছু বাতিল ব্যাটলশিপও আছে এদের, কিন্তু পুরোপুরি বাতিল নয় একটাও, সেগুলো ওরা ন্যাভাল ক্যাডেটদের ট্রেনিং দেবার কাজে ব্যবহার করছে।'

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র?'

'একই অবস্থা,' বলল বারবারা। 'তবে, কয়েকটা ব্যাটলশিপ আছে আমাদের, যেগুলোকে আমরা এই মুহূর্তে কোন কাজে লাগাচ্ছি না। পুরানো স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে ওগুলোকে। মোট পাঁচটা।'

'পাঁচটা? কোথায় আছে ওগুলো?' চুরুট ধরাচ্ছেন মরগান।

'রাজ্যের নামে নাম ওগুলোর, প্রত্যেকটা যার যার রাজ্যে আছে—নর্থ ক্যারোলিনা, টেক্সাস, আলাবামা এবং ম্যাসাচুসেটস্।'

'পাঁচটা হলো না।'

'মিসোরীকে নেভী নিয়ে রেখেছে। ওয়াশিংটন, ব্রিমারটনে আছে ওটা,' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে থমকে গেল বারবারা। তাড়াতাড়ি বলল, 'দুঃখিত, স্যার। আরেকটা ব্যাটলশিপ আছে। অ্যারিজোনা। নেভীর খরচে একটা কমিশনড শিপ হিসেবে রাখা হয়েছে ওটাকে।'

চেয়ারে হেলান দিলেন মরগান। হাত দুটো মাথার পিছনে রেখে তাকিয়ে আছেন সিলিঙের দিকে। 'দুটো ব্যাটলওয়াগন-এর কথা মনে পড়ছে আমার। উইসকনসিন আর আইওয়া। কয়েক বছর আগে ফিলাডেলফিয়ার নেভী ইয়ার্ডে নোঙর ফেলা অবস্থায় দেখেছিলাম বলে মনে হচ্ছে।'

চীফের স্মরণ শক্তি লক্ষ করে অবাক হয়ে গেছে বারবারা। 'রিপোর্টে বলা হয়েছে, পুরানো লোহা বিক্রেতাদের কাছে বেচে দেয়া হয়েছে উইসকনসিন, তিন বছর আগে।'

'আইওয়া?'

'সেটাও।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মরগান। ধীর পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। খানিক পর বললেন, 'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ বলতে কি বোঝায়, তোমার কোন ধারণা আছে, বারবারা?'

'হ্যাঁ, মানে, না…গতকাল একটা রিপোর্ট দেখেছি যাতে…'

'কবীর চৌধুরীর নামটা নিশ্চয় দেখেছ তাহলে?'

'দেখেছি, স্যার।'

'কবীর চৌধুরীর নামটা দেখার পর আরেকটা নাম মনে পড়েনি তোমার?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বারবারা। পিছন থেকে চীফের মাথার দিকে তাকিয়ে আছে। 'আরেকটা নাম, স্যার? কই, না…' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বারবারার মুখ। 'আপনি মাসুদ রানার কথা বলছেন, স্যার?'

'এই জন্যেই তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় সেক্রেটারি, বারবারা,' মৃদু হেসে বললেন মরগান। 'হ্যাঁ, মাসুদ রানা। কবীর চৌধুরী যদি দুষ্ট ক্ষত হয়, মাসুদ রানা তাহলে অপারেশন টেবিলের ছুরি।' একটু পর আবার তিনি বললেন, 'কিন্তু এখনও

তার সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়নি আমার।'

'কবীর চৌধুরী আবার কোন মতলব ফেঁদেছে, স্যার?'

'সরকার তার দশ বিলিয়ন ডলারের চেকটা আটকে দেয়ায় সে নাকি সাংঘাতিক খেপে গেছে,' বললেন মরগান। 'শুনেছি তার ব্যাপারে মাসুদ রানা নাকি সি.আই.এ-কে সাবধান করে দিয়েছে।'

'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ সম্পর্কে সি.আই.এ কিছু জানে?'

'কেউ কিছু জানে না,' বললেন মরগান। 'জানলে আমি খবর পেতাম।'

'আমরাও তো তেমন কিছু জানি না, স্যার।'

'জানতে হবে,' ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন এন.এস.এ. চীফ। 'সবচেয়ে আগে খবর নাও, মাসুদ রানা এখন কোথায়।'

ঠিক ওই সময় ভার্জিনিয়া, ওয়ালনাট পয়েন্ট থেকে একশো গজ দূরে ছোট একটা হোয়েলবোট নোঙর ফেলল। ডেক চেয়ারের ভাঁজ খুলে সরু স্টার্ন ডেকে দাঁড় করাল সেটাকে কবীর চৌধুরী। তারপর একটা ফিশিং রড তুলে নিয়ে বড়শি বা টোপ ছাড়াই পানিতে ফেলল লাইনটা। মাছ ধরার কোন ইচ্ছে নেই তার, কিন্তু লোকের সন্দিহান চোখের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে অভিনয়টা না করেও উপায় নেই।

খানিক পর পিকনিক বাস্কেট খুলে খাবারের প্যাকেটগুলো নামাতে যাচ্ছে, এই সময় তীক্ষ্ণ হুইসেলের শব্দে মুখ তুলে তাকাল কবীর চৌধুরী। তিনটে আবর্জনা ভর্তি বোটকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা টাগ। তাকে লক্ষ্য করেই হুইসেল বাজাচ্ছে ক্যাপ্টেন। মাথার ওপর হাত তুলে নাড়ল কবীর চৌধুরী। পা দুটো হোয়েলবোটের গলুইয়ে আটকে ঢেউ-এর দোলা সামলাচ্ছে সে। একটু পর একটা নোট বই বের করে টাগের যাবার সময়টা টুকে রাখল।

সেই কাক ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিটি জলযানের যাওয়া-আসা লক্ষ করছে কবীর চৌধুরি। শুধু সময় নয়, জলযানের ধরন, চেহারা, কোন্‌দিকে যাচ্ছে, স্পীড, এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় নোট করছে সে। কিন্তু একটা দৃশ্য সবচেয়ে বেশি সময় আর মনোযোগ কেড়ে নিল তার। চোখে বিনকিউলার তুলে অনেকক্ষণ ধরে নেভীর একটা মিসাইল ডেস্ট্রয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ক্রমশ ল্যাণ্ড পয়েন্টের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে সেটা। বিশেষভাবে লক্ষ করছে কবীর চৌধুরী, ডেস্ট্রয়ারের খালি মিসাইল মাউন্ট আর ডেক ক্রুদের অলস ঢিলেঢালা ভাবভঙ্গি।

আরও চার ঘণ্টা পর বোটগুলোকে নিয়ে আবার ফিরে আসতে দেখল টাগটাকে কবীর চৌধুরী। বোটগুলো এখন খালি। তাড়াতাড়ি নাম্বার আর নেভিগেশন লাইটের পজিশন নোট করে নিল সে। এর খানিক পর নোঙর তুলে রওনা হলো ফিরতি পথে।

দশ

কলোরাডো। টেবল লেক।

ঝিরঝির তুষার ঝরছে। থারমাল স্যুট পরা নুমা স্যালভেজ ডাইভাররা এই মাত্র সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর ডানা আর লেজ কাটা শেষ করেছে। এখন তারা বিধ্বস্ত ফিউজিলাজের তলা দিয়ে বিশাল দুটো সিলিং আটকাতে ব্যস্ত।

খানিক আগে এসে পৌঁছেচেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন আর কর্নেল রেজনিক। তাদের পিছু পিছু এসেছে একটা এয়ারফোর্স ব্লু ট্রাক। ট্রাক থেকে রিমেইনস্ আইডেনটিটি আর রিকভারি টীমের কয়েকজন লোক লাফ দিয়ে নিচে নামল। তারপর ধরাধরি করে পাঁচটা কফিন নামানো হলো।

সকাল দশটার মধ্যে তৈরি হয়ে গেল সবাই, ক্রেন অপারেটরদের উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা। ভাসমান ডেরিক দুটোর নিচে লেকের পানি বাতাসের অবিরাম ছোবল খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। পাওয়ার-ইউনিট অপারেটররা টেনশন বাড়াতেই ডেরিক থেকে নেমে আসা কেবলগুলো টান টান হয়ে কাঁপতে শুরু করল। টান লেগে ডেরিকগুলো নুয়ে পড়ল সামান্য, বোল্ট দিয়ে আটকানো জয়েন্টগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তারপর হঠাৎ, যেন তাদের অদৃশ্য হাত থেকে বিরাট কোন বোঝা খসে গেছে, সোজা হয়ে গেল ডেরিকগুলো।

'কাদা থেকে উঠে এসেছে প্লেন,' বলল রানা।

রানার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বেন নেলসন। তার মাথায় রেডিও ফোন পরানো রয়েছে। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে, বলল, 'ডাইভারদের রিপোর্ট—স্ট্রাটোক্রুজার উঠে আসছে।'

'নোজ সেকশন-এর ক্রেডল স্লিং অপারেট করছে যে লোকটা তাকে বলো, স্লিংটা যেন একটু নিচু করে রাখে,' বলল রানা। 'মেটাল ক্যানগুলো গড়িয়ে লেজের গর্তে ঢুকে গেলে বের করতে অসুবিধে হবে।'

হেডফোনের সাথে লাগানো খুদে একটা মাইক্রোফোনের সাহায্যে রানার নির্দেশ রিলে করল বেন।

হাড়-কাঁপানো পাহাড়ী বাতাসে টান টান উত্তেজনা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। সবার চোখ পড়ে আছে দুই ডেরিকের মাঝখানে। এখনও কোন অস্বাভাবিক আলোড়ন নেই পানিতে। লিফট এঞ্জিনের যান্ত্রিক ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও।

সবার কাছ থেকে একটু দূরে একা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। ফেলে আসা ছাব্বিশ বছর পিছনের একটা দিনের কথা ভাবছেন তিনি। পাইলট, মেজর ভ্যান জনসনের চেহারাটা এত বছর পরও পরিষ্কার কল্পনা করতে পারছেন। সেই একই লোককে নিয়ে উঠে আসছে সেক্সটন ফাইভ-থ্রী, কিন্তু দেখে চেনা যাবে না, থাকার মধ্যে আছে শুধু হাড়-কংকাল। নিজের অজান্তেই এক পা

এক পা করে এগোচ্ছেন তিনি। জুতো জোড়া পানিতে ডুবে যেতে হুঁশ ফিরল। দাঁড়িয়ে পড়লেন। বুকের মাঝখানে আর বাঁ কাঁধে হঠাৎ একটু ব্যথা অনুভব করলেন তিনি।

কেবলের নিচে নীল পানির রঙ বদলে খয়েরী হয়ে যাচ্ছে। তারপর দু'দিক ঢালু সেক্সটন ফাইভ-থ্রীর ছাদ ছাব্বিশ বছরে এই প্রথম দিনের আলোর মুখ দেখল। চকচকে অ্যালুমিনিয়ামের গা মরচে লেগে সাদাটে নিষ্প্রভ ছাইয়ের মত হয়ে গেছে। পিচ্ছিল জলীয় আগাছায় ঢাকা পড়ে রয়েছে বেশিরভাগটা। পানি থেকে শূন্যে তুলে ফেলেছে তাকে ক্রেনগুলো, ফিউজিলাজের পিছন দিকের ক্ষতটা থেকে কাদা-গোলা ঘোলা পানি বেরিয়ে আসছে হড় হড় করে।

ফিউজিলাজের ওপর নীল আর হলুদ রঙের প্রতীক চিহ্নটা এত বছর পরও চকচক করছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। মিলিটারি এয়ার ট্র্যান্সপোর্ট সার্ভিস লেখাটা ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু পড়া যাচ্ছে এখনও। জোড়া লাগিয়ে বা মেরামত করে সেক্সটন ফাইভ-থ্রীকে আর কখনও একটা প্লেনের চেহারায় ফিরিয়ে আনা যাবে না। বিচ্ছিন্ন আর মোচড়ানো কন্ট্রোল কেবল, ইলেকট্রিক্যাল অয়্যারিং, হাইড্রলিক লাইনস্ হাঁ করা গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গোছায় গোছায় ঝুলছে।

অটুট নিস্তব্ধতা ভাঙল প্রথমে কর্নেল রেজনিক। 'ওটাই বোধহয় দুর্ঘটনার কারণ ঘটিয়েছিল,' হাত তুলে ককপিটের ঠিক পিছনের ভাঙা অংশটা দেখিয়ে বলল সে। 'নিশ্চয়ই একটা প্রপেলার ব্লেড ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল।'

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন, দুই ডেরিকের মাঝখানে স্লিংয়ের সাথে ঝুলন্ত স্ট্রাটোক্রুজারের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন। বুকের ব্যথাটা আরও বেড়েছে। প্রচণ্ড ইচ্ছে শক্তির জোরে সেটার কথা ভুলে নিজের অজান্তেই ম্যাসেজ করছেন বাঁ হাতটা, মাংসের ভেতর অস্বস্তিকর একটা ব্যথা। প্লেনের উইণ্ডশীল্ড গ্লাসের ভেতর দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করছেন তিনি, কিন্তু কালচে সবুজ শ্যাওলা পড়ে ঝাপসা হয়ে গেছে কাঁচটা। পানির গা থেকে ক্রেনগুলো দশ ফুট ওপরে তুলে এনেছে ফিউজিলাজটাকে, এই সময় একটা চিন্তা ঢুকল তাঁর মাথায়। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে রানার পাশে দাঁড়ালেন তিনি।

'মেকশিফট বার্জের কোন ব্যবস্থা দেখছি না যে?' জানতে চাইলেন তিনি। 'ওটাকে তীরে আনবেন কিভাবে?'

'এখানেই আমরা ঝুলন্ত হুক ব্যবহার করব, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। বেনের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত দিল ও। 'ওকে, সিগন্যাল দাও ডাম্বোকে।'

দু'মিনিটের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা হেলিকপ্টার গাছের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এল, বিশাল দুই রোটর অদ্ভুত একটা যান্ত্রিক শব্দে কাঁপিয়ে দিল ভারী পাহাড়ী বাতাসকে। ক্রেনগুলোর মাথার ওপর থামল পাইলট, হাঁ করা পেট থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে দুটো হুক। ডেরিক ক্রুরা দ্রুত এবং দক্ষ হাতে হোয়েস্ট ক্রেডলের সাথে আটকে দিল সেগুলো। পাইলট এবার ধীর গতিতে ওপরে উঠে বোঝার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করল, ঢিল পড়ল ক্রেন কেবলে, সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হলো সংযোগ। অস্বাভাবিক মন্থর গতিতে আরও খানিক ওপরে উঠল

হেলিকপ্টারটা, তারপর দিক বদলে এগোতে শুরু করল তীরের দিকে।

ছুটে সবার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে আরেক জায়গায় দাঁড়াল বেন, পাইলট যাতে দেখতে পায় তাকে। হাত নাড়ছে ও, ওর নির্দেশিত জায়গায় ধীরে ধীরে হেলিকপ্টার নামিয়ে আনছে পাইলট।

বোঝা নামিয়ে আবার গাছের মাথার ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না পাইলটের। ওরা সবাই যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, পা তোলার শক্তি নেই যেন। বিড় বিড় করে তার এয়ারফোর্স সহকারীদেরকে কি যেন বলল কর্নেল রেজনিক, নিঃশব্দে মার্চ করে এগিয়ে গেল তারা। কফিনগুলো নামাচ্ছে ট্রাক থেকে। রানার ইঙ্গিতে নুমার একজন লোক একটা মই নিয়ে এগিয়ে গেল। আপার কার্গো ডেকের খোলা পিছন দিকটায় মই দাঁড় করাল সে।

মই বেয়ে উঠে গেলেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাঁপাচ্ছেন। ঠিক তাঁর পিছনেই রয়েছে রানা। আবার পা বাড়ালেন তিনি। মেটাল ক্যানগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে কন্ট্রোল কেবিনের দিকে এগোচ্ছেন। দরজার কাছে পৌঁছে আবার তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। পিছন থেকে তাঁর দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে মৃদু গলায় বলল রানা, 'আপনি সুস্থবোধ করছেন তো, অ্যাডমিরাল?'

কয়েক সেকেন্ড পর অনেক কষ্টে উত্তর দিলেন তিনি, 'ওদের দিকে আমি তাকাব কিভাবে, মি. রানা?'

'ওসব মুছে ফেলুন মন থেকে,' নরম গলায় বলল রানা।

বাল্কহেডের গায়ে হেলান দিলেন অ্যাডমিরাল, বুকের ব্যথাটা তীব্র হয়ে উঠছে ক্রমশ। 'একটু সময় দিন আমাকে, এখুনি সামলে নেব। আমার প্রথম কাজ ওয়রহেডগুলো পরীক্ষা করা।'

রানার দিকে এগিয়ে আসছে কর্নেল রেজনিক। প্রতিটি পদক্ষেপ সন্তর্পণে ফেলছে সে, মেটাল ক্যানগুলোর সাথে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবার ভয়ে টান টান হয়ে আছে পেশীগুলো। 'আপনি বললেই কঙ্কালগুলো নিয়ে যাবার জন্যে আমার লোকদেরকে ডেকে পাঠাব আমি, মি. রানা।'

'রহস্যময় পাঁচ নম্বরকে দিয়ে শুরু করুন,' বলল রানা। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা কয়েকটা মেটাল ক্যানের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'আপনার ডান দিকে দশ ফুট দূরে মেঝের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা আছে।'

এগিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াল রেজনিক। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সে। বিস্ময় ফুটে উঠেছে চেহারায়। 'কোথায়, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না, মি. রানা?'

'আপনি আসলে ওটার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন,' বলল রানা।

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?' বলল রেজনিক। 'নিজেই এসে দেখুন না। কিছুই নেই এখানে!'

'চোখে নিশ্চয়ই কম দেখেন আপনি,' রেজনিককে সরিয়ে দিয়ে মেটাল ক্যানের ফাঁকে তাকাল রানা। কার্গো বাঁধার রিঙের সাথে এখনও বাঁধা রয়েছে স্ট্র্যাপগুলো, কিন্তু খাকি ইউনিফর্ম পরা লাশটা আশপাশে কোথাও নেই। বোকার মত চুপ করে

আছে রানা। প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাবার চেষ্টা করছে। হাঁটু মুড়ে বসে স্ট্র্যাপগুলো পরীক্ষা করল ও। খোলা হয়নি, কেটে ফেলা হয়েছে।

দু'চোখে সন্দেহের ছায়া রেজনিকের। 'আপনি যেদিন ডাইভ দিয়েছিলেন সেদিন বরফের মত ঠাণ্ডা ছিল পানি। ঠিক দেখতে পাননি, হয়তো কিছুর ছায়া দেখে ভেবেছিলেন...'

দাঁড়াল রানা। একটু হাঁপাচ্ছে। কিন্তু গলার স্বর দৃঢ়। 'এখানেই ছিল ওটা।' বলার ভঙ্গি লক্ষ করে থ হয়ে গেল কর্নেল। কথা যোগাল না মুখে।

'লিফট অপারেশনের সময় পিছন দিয়ে ভেসে যায়নি তো?'

'সম্ভব নয়। ফিউজিলাজের সাথে সাথে উঠে এসেছে ডাইভাররা, কিছু পড়লে রিপোর্ট করত তারা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রেজনিক, কিন্তু হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল সে। 'মি. রানা! অ্যাডমি...'

ঘুরেই অ্যাডমিরালের দিকে ছুটল রানা। ঠিক সময়ে পৌঁছুল ও, দু'হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল অ্যাডমিরালকে। ধীরে ধীরে কার্গো কেবিনের মেঝেতে শুইয়ে দিল তাঁকে ও, সারা শরীর চটচটে ঘামে ভিজে গেছে তাঁর। সাংঘাতিক কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস ফেলতে। বুকের অসহ্য ব্যথায় ছটফট করছেন।

'হার্ট ট্রাবল!' রেজনিককে বলল রানা। 'শীগগির বেনকে ডেকে হেলিকপ্টার আনাতে বলুন।'

দ্রুত অ্যাডমিরালের বুকের কাছে শার্টটা ছিঁড়ে ফেলল রানা। কাঁপা একটা হাত তুলে রানার কব্জি চেপে ধরলেন অ্যাডমিরাল। 'ওয়রহেড...মি. রানা, ওয়রহেড...' শ্বাস কষ্টে নীল হয়ে গেছে মুখের চেহারা, গলা থেকে বেরুতে চাইছে না শব্দগুলো।

'শান্ত হোন। মন হালকা করুন। চিন্তা করার কিছু নেই, কয়েক মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।'

'মি. রানা,... ওয়রহেড...' কথা বলার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন অ্যাডমিরাল।

'কিচ্ছু ভাবলেন না,' আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল রানা। 'ক্যানের ভেতর সবগুলো নিরাপদে আছে।'

'না...না...বুঝতে পারছেন না,' ক্রমশ নেতিয়ে পড়ছে অ্যাডমিরালের কণ্ঠস্বর। অনেক কষ্টে চোখ দুটো মেললেন তিনি একবার। ইঙ্গিতে নিচু হতে বলছেন রানাকে। তাঁর ঠোঁটের কাছে কান নামাল রানা। 'শুনেছি...' ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'ওয়রহেড... আটাশটা...' পরের কথাগুলো শুনতে পেল না রানা।

কয়েকটা কম্বল নিয়ে ছুটে এল বেন।

ঠোঁট দুটো কাঁপছে অ্যাডমিরালের। নিচু হয়ে তাঁর কথা শুনছে রানা।

'হেলিকপ্টার আসছে,' চাপা গলায় বলল বেন। 'কেমন আছেন উনি?'

'এখনও লড়ছেন,' মাথা তুলে বিড়বিড় করে বলল রানা। 'কি হয় বলা যায় না।' কব্জির ওপর চেপে বসে থাকা অ্যাডমিরালের হাতটা ছাড়িয়ে নিল ও। তাঁর হাত ধরে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অ্যাডমিরাল। এর সুরাহা আমি করব। কথা দিচ্ছি।'

চোখ পিট পিট করছেন অ্যাডমিরাল, রানার কথা শুনে মাথাটা একটু নাড়লেন।
বেনের সাহায্য নিয়ে অ্যাডমিরালের গলা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে রানা। ব্যস্ততার সাথে ফিরে এল রেজনিক, পিছনে স্ট্রেচার নিয়ে দু'জন এয়ারম্যান। এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল রানা, পিছিয়ে এসে জায়গা ছেড়ে দিল ওদেরকে। সেক্সটন ফাইভ-থ্রী থেকে অ্যাডমিরালকে বাইরে বের করে এনে ওরা দেখল ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে হেলিকপ্টার।

রানার একটা হাত ধরে কর্নেল রেজনিক জানতে চাইল, 'কি বললেন অ্যাডমিরাল?'

'আটাশটা মেটাল ক্যান গুনেছেন উনি।'

'প্রার্থনা করি, ভালয় ভালয় সেরে উঠুন,' বলল রেজনিক। 'তবে এখন উনি মরেও শান্তি পাবেন। কুইক-ডেথ শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা গেছে। এখন শুধু সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেই সমস্ত বিপদের ভয় দূর হয়ে যায়।'

'আপনি ভুল বুঝেছেন,' বলল রানা। 'শেষ নয়, বিপদ মাত্র শুরু হলো।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল কর্নেলের।

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রীতে ছত্রিশটা ওয়রহেড ছিল,' বলল রানা। 'এখন আছে আটাশটা। আটটা ওয়রহেড চুরি গেছে।'

এগারো

ওয়াশিংটন, ডি. সি.। একই দিনের ঘটনা।

ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সী। গভীর রাত।

কয়েকজন দারোয়ান ছাড়া অফিসে আর কেউ নেই, একা শুধু রানার জন্যে অপেক্ষা করছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। স্থির হয়ে বসতে পারছেন না তিনি, উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছেন। অয়্যারলেসে শেষ খবর পেয়েছেন সেই বিকেল পাঁচটায়, তারপর কি হয়েছে না হয়েছে কিছুই তিনি জানেন না। খানিক আগে এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছে রানা, রিপোর্ট দেবার জন্যে নিজেই আসছে সে। তার মানে, খবর ভাল নয়।

নক হলো দরজায়।

'কাম ইন।'

বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে কামরার ভেতর ঢুকল রানা। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে নিজের রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসলেন অ্যাডমিরাল। 'বসো, রানা।'

'দুঃসংবাদ, অ্যাডমিরাল,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'পরে শুনলেও চলবে,' একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি। 'বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নাও আগে, তারপর কিছু মুখে দাও। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন কিছু পেটে পড়েনি।'

কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। এর আগেও কয়েক বার মনে হয়েছে তার, আজ আবার নতুন করে আরেকবার মনে হলো কথাটা—অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সাথে কোথায় যেন একটা মিল আছে মেজর জেনারেল রাহাত খানের। দু'জনেই ওর ওপর অগাধ আস্থা রাখেন, অত্যধিক ভালবাসেন, তার সুবিধে অসুবিধের দিকে সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। ক্লান্ত শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল,' বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল ও। ভিজে হাত-মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছে আবার যখন বেরুল ও, দেখল ডেস্কের ওপর প্লেট ভর্তি কেক আর ফ্লাস্ক ভর্তি কফি রয়েছে।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, ওর দিকে একটা কালো চুরুট বাড়িয়ে দিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'এটা ধরিয়ে টানতে থাকো, গরম হয়ে উঠবে শরীরটা। তারপর শুরু করো।'

রানার চুরুট ধরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন অ্যাডমিরাল, তারপর জানতে চাইলেন, 'কেমন আছেন এখন জ্যাক ডেনটন?'

'কোন পরিবর্তন নেই,' বলল রানা। 'ডেনটন আর্মি হাসপাতালের হার্ট স্পেশালিস্টের রিপোর্ট, আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা যদি টিকে যান, বিপদ কেটে গেছে বলে মনে করা যাবে। একটু সুস্থ হলেই তাঁকে ওরা ওয়াশিংটনের ওয়াল্টার রীড হাসপাতালে ট্র্যান্সফার করবে।'

'ওয়রহেডগুলো?'

'লিডভিল রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেছে,' বলল রানা। 'ওখানে কর্নেল রেজনিক আছে, জাহাজে তুলে সানফ্রান্সিসকোর পিয়ার সিক্সে পাঠাবার সমস্ত দায়িত্ব তাকেই দিয়ে এসেছি।'

'আমাদের প্যাসিফিক কোস্ট রিসার্চ শিপকে তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়ে রেখেছি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওয়রহেডগুলো পাবার পর কি করতে হবে জানা আছে স্কিপারের। কন্টিনেন্টাল শেলফ ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে গিয়ে দশ হাজার ফুট গভীর পানিতে ফেলে দেবে ওগুলো।' এক সেকেন্ড ইতস্তত করলেন অ্যাডমিরাল, তারপর জানতে চাইলেন, 'নিখোঁজ আটটা ওয়রহেডের সন্ধান পেয়েছ?'

'না। লেকের তলায় নেই। এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে।'

'তোমার কি ধারণা?'

'এখনও কোন ধারণা দিতে পারছি না আপনাকে।'

'কোন সূত্রও কি নেই তোমার হাতে?'

'নেই,' একটু ইতস্তত করে স্বীকার করল রানা।

'সেক্ষেত্রে আমার সামনে দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই, রানা,' গম্ভীর গলায় বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'এবার পেন্টাগনকে সব কথা জানাতে হয়।'

'কিন্তু সেটা কি উচিত হবে, অ্যাডমিরাল?'

ক্লিনশেভ প্রকাণ্ড মুখটা থমথম করছে জর্জ হ্যামিলটনের। চেহারায় গভীর ধ্যান মগ্নতার ছাপ ফুটে উঠল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন তিনি। তারপর বললেন,

'আর কোন বিকল্প নেই। জ্যাক ডেনটন কি বলেছেন, মনে আছে? লক্ষ-কোটি মানুষের অনিবার্য ধ্বংস। এতবড় ঝুঁকি আমি নিতে পারি না, রানা। পেন্টাগন যা ভাল বোঝে করুক। এফ.বি.আই আর সি.আই.এ-কে তারাই দায়িত্ব দিক। লার্জ-স্কেল ইনভেস্টিগেশন চালাবার মত আয়োজন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে নেই।'

মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে রানা। পেন্টাগনকে সব কথা জানানো মানে, আরেক সর্বনাশের পথ সুগম করা। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন মনে করলেই তারা কুইক-ডেথ ব্যবহার করবে। পেন্টাগনের ওরা সবাই নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে একেবারে অন্ধ। কুইক-ডেথ উদ্ধার করতে পারলে সেটাকে ওরা ধ্বংস করবে না, ভবিষ্যতে শত্রু-নিধনের জন্যে রেখে দেবে।

'কিন্তু, অ্যাডমিরাল, পেন্টাগনকে সব কথা জানালেই যে তারা সেগুলো উদ্ধার করতে পারবে তা মনে করার কোন কারণ নেই,' বলল রানা।

'কিন্তু আমরাও তো ওগুলো উদ্ধার করতে পারছি না,' বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'এমনও তো হতে পারে যে অবহেলার সাথে কোথাও ফেলে রেখে দেয়া হয়েছে ওগুলো। চোরেরা হয়তো জানেই না কি জিনিস পড়েছে তাদের হাতে।'

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা, 'সে-সম্ভাবনা আমিও উড়িয়ে দিই না। কিন্তু চোরের ওপর বাটপাড়িও তো হয়ে থাকতে পারে, অ্যাডমিরাল? কেউ চুরি করে ফেলে রেখে দেবে কেন? এক একটার ওজন প্রায় এক টন! মেটাল ক্যান দিয়ে মোড়া থাকলেও, দেখেই বোঝা যায় যে ওগুলো ন্যাভাল শেল।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'এর সাথে একটা খুনের রহস্যও জড়িয়ে রয়েছে, অ্যাডমিরাল। চার্লি স্মিথের হত্যাকাণ্ড...'

'যেখানে লাশই নেই, সেখানে ক্রাইম কোথায়?'

'কিন্তু আমি জানি আমি ভুল দেখিনি।'

'তাতে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হচ্ছে না,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কোন পাগল বা কোন অজ্ঞ লোক যদি নিজেকে ডিমোলিশন এক্সপার্ট মনে করে ফাটিয়ে ফেলে একটা ওয়রহেড, কেয়ামত নেমে আসবে...'

মন স্থির করে ফেলল রানা। শিরদাঁড়া খাড়া করে সরাসরি অ্যাডমিরালের চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমার একটা অনুরোধ আছে, অ্যাডমিরাল।'

'বলো,' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলেন জর্জ হ্যামিলটন।

'নিখোঁজ ওয়রহেডগুলো উদ্ধার করার জন্যে পাঁচটা দিন সময় চাই। আমি যদি খালি হাতে ফিরে আসি, তারপর আপনার যা খুশি করবেন আপনি।'

রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল। কথা বলছেন না। বুঝতে পারছে রানা, দ্বিধায় পড়ে গেছেন অ্যাডমিরাল।

'পাঁচ দিন?'

'হ্যাঁ।'

একটা চুরুট ধরালেন জর্জ হ্যামিলটন। তারপর বললেন, 'আমার বিচক্ষণতার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, রানা। শুধু তুমি বলে, অন্য কেউ হলে এ-অনুরোধ রাখার

কথা ভেবে পর্যন্ত দেখতাম না। আমি আশা করব, পাঁচ দিনের আগেই নিখোঁজ ওয়রহেডগুলো উদ্ধার করে আনবে তুমি। আর যদি খালি হাতে ফিরে আসো··· খোদা যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন।'

বারো

কলোরাডো। লী রেফারীর বাড়ি।

সূর্য ডুবতে আর বেশি দেরি নেই, দড়িতে শুকাতে দেয়া কাপড়গুলো একটা একটা করে তুলে গুছাচ্ছে শীলা। দেখতে পেল, রাস্তা থেকে নেমে এদিকেই এগিয়ে আসছে রানা। হাতের কাজটা শেষ করল সে, স্বামীর শার্টটা গুছিয়ে আর সব কাপড়ের সাথে যত্ন করে রেখে দিল, তারপর হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানাল রানাকে। 'এসো, রানা। খুব খুশি হয়েছি তোমাকে দেখে।'

'তোমরা ভাল তো?'

বাড়ির ভেতর থেকে ঘেউ ঘেউ করে গর্জে উঠল কুকুরটা, লাফ দিয়ে সদর দরজা টপকে ছুটে এসে দাঁড়াল রানার সামনে, ভেজা ভেজা লাল জিভটা বের করে রানার হাত চাটল।

'অপরিচিত লোক দেখলেই সাংঘাতিক খেপে ওঠে জিমি,' হাসতে হাসতে বলল শীলা। 'কিন্তু তোমার বেলায় আশ্চর্য একটা ব্যতিক্রম ঘটতে দেখছি। প্রথম থেকেই তোমাকে ওর ভাল লেগে গেছে।' পশ্চিম পাহাড়ের দিক থেকে হিমেল বাতাস বইছে; অথচ উইন্ডব্রেকারটা কাঁধের ওপর ফেলে রেখেছে রানা, ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য লাগছে শীলার। 'হ্যাঁ, ভালই আছি আমরা। তোমার সাথে লোরাও ফিরে এসেছে নাকি?'

'না, ওয়াশিংটনে রয়ে গেছে ও,' উঠানের চারদিকে তাকাল রানা। 'লী বাড়িতে নেই নাকি?'

'আছে,' বলল শীলা। আরেকবার রানার কাঁধে ফেলা উইন্ডব্রেকারের দিকে তাকাল সে। 'কিচেনের সিঙ্ক পরিষ্কার করছে। সোজা চলে যাও।'

হাতের কাজ মাত্র শেষ করেছে লী, কিন্তু টেবিল থেকে এখনও নামেনি, পা ঝুলিয়ে বসে তামাক ভরছে পাইপে। রানাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে একগাল হাসল সে। 'মোক্ষম সময়ে এসেছ, ভায়া। এই মাত্র আঙুরের রস ভর্তি একটা বোতলের ছিপি খুলতে যাচ্ছিলাম আমি। বসো, বসো।'

পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল রানা। 'ঘরে তুমি ব্র্যান্ডিও তৈরি করো?'

'এই প্রায় নো-ম্যানস্ ল্যান্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে উপায় কি?' নিঃশব্দে হাসছে লী। টেবিল থেকে নেমে একটা কাবার্ড থেকে বোতল আর দুটো গ্লাস বের করল সে।

'তোমার সাথে আমার কথা আছে, লী।'

'হাজার বার,' গ্লাস দুটোর কিনারা পর্যন্ত ব্র্যান্ডি ঢালল লী। 'এই রানা, লেকে অত হৈ-চৈ কিসের বলো তো? শুনলাম ওরা নাকি একটা প্লেন পেয়েছে? তুমি যেটার কথা জানতে চাইছিলে ওটা সেটা নাকি?' একটা চেয়ারে বসল সে।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। লী-র হাত থেকে নিয়ে চুমুক দিল গ্লাসে। লক্ষ্য করল লী, গ্লাসটা বাঁ হাতে নিল রানা।

'কি কথা, রানা?'

'ওই প্লেনের ব্যাপারেই আবার আমি এসেছি,' বলল রানা। 'চার্লি স্মিথকে খুন করেছ তুমি। জানতে চাই, কেন?'

লী-র ঘন একটা ভুরু শুধু সামান্য একটু ওপরে উঠল, তাছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল না রানা। 'আমি…খুন করেছি চার্লি স্মিথকে? তুমি পাগল হলে নাকি?'

'চার্লিকে খুন করার তিন বছর পর অপরিচিত একজন লোক এসে নিখোঁজ একটা প্লেনের কথা জানতে চাইবে, ঘুণাক্ষরেও তা আশা করোনি, তাই না?' যেন সদালাপ করছে এমনি ভঙ্গিতে বলল রানা। 'একটা মারাত্মক ভুল আগেই করে রেখেছিলে তুমি, যার জন্যে ধরা পড়ে গেলে। অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ারটা সরিয়ে ফেলা উচিত ছিল তোমার।'

রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লী। 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'নিখোঁজ প্লেনের কথা জিজ্ঞেস করায় তোমরা আমার প্রতিটি আচরণের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করো। যখন দেখলে লেকে ডাইভ দিচ্ছি, সাথে সাথে বুঝে নিলে প্লেন আর চার্লি স্মিথের হাড় আবিষ্কার করে ফেলেছি আমি। ওই পর্যায়ে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভুলটা করে বসলে তুমি। আতঙ্কিত হয়ে সরিয়ে ফেললে চার্লিকে। তার হাড়গুলো নিশ্চয়ই পাহাড়ের গভীর কোন জায়গায় পুঁতে দিয়েছ। ভয় পেয়ে এই বোকামিটা না করলে পুলিস তোমাকে তিন বছর আগের একটা খুনের সাথে সহজে জড়াতে পারত না।'

'লাশই যেখানে নেই,' বলল লী, নিভে যাওয়া পাইপে শান্তভাবে আগুন ধরাচ্ছে সে, 'সেখানে কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।'

'আইন জিনিসটাকে অত ঠুনকো মনে কোরো না,' বলল রানা। 'আর লাশ নেই বলছ কেন? তোমাকে বেঁধে কষে ধোলাই দিলে তুমিই তো পুলিসকে জানিয়ে দেবে কোথায় আছে লাশ। সে যাক। গল্পটা শুরু হলো কিভাবে, বলবে তুমি? নাকি আমি বলব?'

'কি জানো তুমি?'

'প্রায় সবটা জানি,' বলল রানা। 'বলছি, শোনো। কোথাও ভুল হলে শুধরে দিয়ো, কেমন?

'চার্লি স্মিথ একটা অটোমেটিক ফিশিং পোল কাস্টার আবিষ্কার করে,' শুরু করল রানা। 'পরীক্ষার সময় লেকের তলায় কিসের সাথে যেন হুকটা আটকে যায়। চার্লি একজন অভিজ্ঞ অ্যাঙলার ছিল, সে মনে করে গাছের কোন গুঁড়ির সাথে আটকে গেছে হুকটা। ব্যস্ত না হয়ে সেটা ছাড়াবার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা

করে সে। এবং শেষ পর্যন্ত লাইনের টান টান ভাবটা ঢিলে হয়ে যায়। কিন্তু লাইন গুটিয়ে নেবার সময় চার্লি অনুভব করে হুকের সাথে কি যেন বেধে আছে, উঠে আসছে সেটাও। একটু পরই জিনিসটা দেখতে পেল সে, একটা অক্সিজেন ট্যাংক। অনেকদিন পানিতে ডুবে থাকায় জিনিসটার মাউন্টস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল. চার্লির হুকের একটু টানই শুধু দরকার ছিল, সেটা পেতেই ছিঁড়ে আলাদা হয়ে ভেসে উঠেছে পানির ওপর।

'চার্লির উচিত ছিল পুলিসের কাছে যাওয়া। তা সে যায়নি, কারণ তার রক্তে ছিল আবিষ্কারের নেশা। লেকের তলায় একটা প্লেন আছে, এটা নিজের কাছে প্রমাণ করার দরকার ছিল তার। তাই একটা রশিতে লোহার আঙটা বেঁধে লেকের তলাটা আঁচড়াতে শুরু করে সে। এভাবেই নোজ গিয়ারটা আঙটার সাথে বাধায়, ওটা নিশ্চয় আগেই নিজের খোপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। যাই হোক, সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হলো। এই পর্যায়ে চার্লি সম্ভবত লোভী হয়ে ওঠে। পুলিসকে খবর দিলে প্লেনের ভেতর সোনাদানা যা আছে সব হাতছাড়া হয়ে যাবে, তাই পুলিসের কাছে না গিয়ে সোজা সে লী রেফারীর কাছে গিয়ে হাজির হলো।'

'কেন? আমার কাছে কেন আসবে চার্লি?'

'তুমি একজন রিটায়ার্ড নেভীম্যান; ডিপ ওয়াটার ডাইভার, তাই। তোমরা দু'জন মিলে ডাইভিং ইকুইপমেন্ট আর এয়ার কমপ্রেশার যোগাড় করো। একশো চল্লিশ ফুট পানির নিচে নামা তোমার জন্যে পানির মতই সহজ একটা ব্যাপার ছিল। প্লেনের ভেতর আশ্চর্য ধরনের একটা কার্গো দেখে তোমার মাথার ভেতর রঙিন কল্পনা ডানা মেলে দেয়। মেটাল ক্যানগুলোয় কি আছে বলে মনে করেছিলে? বোধহয় আণবিক বোমা, তাই না? কিন্তু মেটাল ক্যানগুলো প্লেনের ভেতর থেকে বের করে পানির ওপর তুললে কিভাবে তোমরা?'

'কোন বেগ পেতে হয়নি,' এতক্ষণে হাসল লী। ভয়ের লেশমাত্র নেই তার চেহারায়। 'ফিউজিলাজের ফাঁকটা আরও বড় করার জন্যে ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ ঘটায় চার্লি, আর আমি নিচে নেমে একটা কেবলের সাথে জড়িয়ে বাঁধি একটা মেটাল ক্যানকে। ওপর থেকে একটা ফোর-হুইল-ড্রাইভের সাহায্যে টেনে তুলে ফেলে সেটাকে চার্লি।'

'কিন্তু তারপর? মেটাল ক্যানটা খোলার পর দেখলে ওগুলো পুরানো মডেলের ন্যাভাল শেল, আজ যার কোন মূল্যই নেই। তখন কি করলে?'

তামাক শেষ হয়ে গেছে পাইপের, নিশ্চিন্ত মনে সেটায় আবার তামাক ভরছে লী রেফারী। 'সুন্দর অনুমান, রানা। তাক লাগিয়ে দিয়েছ। এক-আধটু ভুল যে নেই তা নয়, সেগুলো ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তবে, মেটাল ক্যানগুলো তুলে আনার একটু পরই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, ধাতবের তৈরি আর্মার ভেদ করার প্রজেক্টাইল নয় ওগুলো। মাত্র দশ মিনিট পরীক্ষা করেই চার্লি বলে দেয়, ওগুলো পয়জন-গ্যাস ক্যারিয়ার।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। ওদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে চার্লি আর লী। 'কিভাবে?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল ও।

'বাইরে থেকে দেখে মনে হয় ওটা একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ন্যাভাল অর্ডন্যান্স, কিন্তু

আমরা দেখলাম ওটায় স্টার শেলের ফিটিংসও রয়েছে। এ-ধরনের জিনিসের সাথে পরিচয় ছিল আমাদের—পূর্ব-নির্ধারিত একটা অলটিচ্যুডে পৌঁছে একটা প্যারাস্যুট খুলে যায়, সেই সাথে অল্প পরিমাণ এক্সপ্লোসিভ চার্জ গুঁড়িয়ে দেয় মাথাটাকে, আগুন ধরিয়ে দেয় ফসফরাসের একটা প্যাডে। এটার বেলায় একটু পার্থক্য আছে, এক্সপ্লোসিভ চার্জে মাথাটা উড়ে গেলে এক বাণ্ডিল খুদে পটকা বেরিয়ে আসে, সেগুলোর ভেতর লেথাল গ্যাস ভরা আছে।'

'স্রেফ এক নজর দেখেই চার্লি বলে দেয় ওগুলোর ভেতর গ্যাস আছে?'

'প্যারাস্যুট-এস্কেপ-হ্যাচ কাভারটা আবিষ্কার করে সে। ওটাই তাকে প্রথম সূত্র পাইয়ে দেয়। তারপর সামনে এসে মাথাটা নামায়, চার্জটা বিচ্ছিন্ন করে, উঁকি দিয়ে তাকায় ভেতরে।'

'ডিয়ার গড!' আতঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। 'চার্লি ওয়রহেড খুলেছিল?'

'তাতে এত আশ্চর্য হবার কি আছে? চার্লি একজন ডিমোলিশন এক্সপার্ট ছিল।'

ধীরে ধীরে বুক ভরে বাতাস নিল রানা। 'ওয়রহেডগুলো কি করেছ তুমি?'

'রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস যে কুড়িয়ে পায় তারই হয়ে যায়, সেটাই কি নিয়ম নয়?' হাসি মুখে বলল লী।

'ওগুলো কোথায়?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল রানা।

'আমরা ওগুলো বিক্রি করে দিয়েছি।'

'কি করেছ?' চমকে উঠল রানা। 'কোথায়?'

'ইউনিভার্সেল আর্মস কর্পোরেশন-এর কাছে। নিউআর্ক, নিউজার্সিতে। আন্তর্জাতিক বাজারে গোলা-বারুদ বিক্রি করে ওরা। ওদের ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করি আমি। লোকটা বেঁটে, কুৎসিত, দেখে মনে হয় বাদাম ফেরি করে। লোকটার নাম টার্নার ব্রুনো। কলোরাডোয় এসে একটা প্রজেক্টাইল চেক করে সে, দাম বলে পাঁচ হাজার ডলার। যতগুলো দিতে পারব সব নেবে বলে কথা দেয়, কোত্থেকে আসছে জানতে চাইবে না।'

'বাকিটা আমি কল্পনা করতে পারি,' বলল রানা। 'ওগুলো বিক্রি করতে রাজি হয়নি চার্লি, কারণ সে বুঝতে পারে, একটা যদি ডিটোনেট করা হয়, হাজার হাজার নিরীহ লোক মারা যাবে। কিন্তু তোমার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় টাকাটা। তোমরা ঝগড়া শুরু করো, তারপর মারামারি, এবং চার্লি তোমার কাছে হেরে যায়। তার লাশটা তুমি লেকের নিচে গিয়ে প্লেনের ভেতর রেখে আসো। তারপর তার গাড়িতে একটা ডিনামাইট ফাটাবার ব্যবস্থা করো, সেখানে রেখে দাও চার্লির এক পাটি জুতো আর একটা বুড়ো আঙুল।'

আশ্চর্য শান্ত দেখাচ্ছে লী-কে। ধীরে সুস্থে পাইপে টান দিচ্ছে সে। 'দুঃখের বিষয় হলো, আমার যুক্তি মানেনি চার্লি। আর তুমি যে আমাকে লোভী বলে গাল দিচ্ছ, কথাটা ঠিক নয়। প্রজেক্টাইলগুলো সব একই সাথে বিক্রি করার চেষ্টা করিনি আমি। যখনই আমাদের কিছু টাকার দরকার হয়েছে, টার্নার ব্রুনোকে খবর দিয়েছি আমরা। সাথে সাথে একটা ট্রাক পাঠিয়ে দিয়েছে সে, দামও চুকিয়ে দিয়েছে নগদ টাকায়।'

'আমরা মানে?' জানতে চাইল রানা। 'তুমি আর শীলা?'

'অবশ্যই! শীলা আমার লক্ষ্মী বউ, ভাল-মন্দ সব কিছুতে সাথে আছে।'

'চার্লিকে খুন করলে কিভাবে তুমি?'

'দুঃখিত, রানা। এ-ব্যাপারে তোমাকে নিরাশ না করে উপায় নেই আমার। মানুষ খুন করার মত মানসিক শক্তি কোন কালেই ছিল না আমার। এসব কাজে শীলার কোন ভয় নেই। চার্লিকে খুন করার কৃতিত্ব তারই। সোজাসুজি বুকে গুলি করে মারে ও তাকে।'

'শীলা?' হতভম্ব হয়ে গেল রানা। এবং পরক্ষণে বুঝল, মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে সে।

'ওর লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না,' হাসি মুখে রানার কাঁধের ওপর দিয়ে দরজার দিকে তাকাল সে। 'শীলা, লুকিয়ে থাকার দরকার নেই, তোমার চেহারাটা রানাকে দেখাতে পারো এবার।'

দুটো ধাতব শব্দ ঢুকল রানার কানে।

'মেঝেতে কার্টিজ পড়ার শব্দ শুনেই বুঝতে পারছ, শীলার হাতে উইনচেস্টার রাইফেলটা লোড আর কক্ করা। কোন সন্দেহ আছে?'

পা দুটো শক্তভাবে মেঝেতে রেখে উইন্ডব্রেকার জ্যাকেটের ভেতর একটা হাত ভরছে রানা। 'চমৎকার, লী!'

'তবু, ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নাও,' বলল লী। 'কিন্তু সাবধান! কোনরকম চালাকি নয়।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শীলা। রাইফেলের নলটা প্রায় ঠেকে রয়েছে রানার মাথার সাথে। 'দুঃখিত, রানা। বাকি জীবনটা জেলে কাটাবার কোন ইচ্ছে নেই আমাদের,' নিষ্ঠুর হাসি শীলার ঠোঁটে।

'আরেকটা খুন করেও নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবে না তোমরা, শীলা,' বলল রানা। শীলা আর ওর মাঝখানের দূরত্বটা চট করে হিসাব করে নিল ও। পাঁচ ফুট। পায়ের পেশীগুলো শক্ত করে নিল। 'ভেবেছ আমি একা এসেছি?'

'বাইরে কাউকে দেখেছ নাকি, শীলা?' জিজ্ঞেস করল লী।

এদিক ওদিক মাথা দোলাল শীলা। 'রাস্তা দিয়ে ওকে একা আসতে দেখেছি আমি। ও বাড়িতে ঢোকার পর অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম আমি, কাউকে দেখিনি।'

'আমিও তাই ধরে নিয়েছি,' বলল লী, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'ধোঁকা দিয়ে বাজিমাত করতে চাইছ তুমি, রানা। তোমার হাতে যদি কোন প্রমাণ থাকত, সাথে করে পুলিস নিয়ে আসতে ভুল করতে না।'

সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে রানাকে। 'কে বলল নিয়ে আসিনি? দু'জন ডেপুটিকে সাথে নিয়ে একটা গাড়িতে বসে আছেন শেরিফ। আধ মাইল দূরে। আমার কাছ থেকে খবর পেলেই…'

লী-র পেশীতে টান পড়ল। 'মিথ্যে কথা!'

'শেরিফ আমার বুকে একটা ট্র্যান্সমিটার আটকে দিয়েছে,' বলল রানা, বাঁ হাত

দিয়ে শার্টের বোতাম খুলছে ও। 'ঠিক এখানে, এই যে দেখো না...'

পরমুহূর্তে কিচেন রুমের ভেতর যেন নরক ভেঙে পড়ল। জ্যাকেটের নিচ থেকে কোল্টটা বের করেই গুলি করল রানা। কিন্তু শীলাও এক মুহূর্ত দেরি করেনি। একই সাথে গুলি করেছে ওরা দুজন।

প্রেতাত্মা-২

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৮১

এক

কলোরাডো। রকি পার্বত্য এলাকা।

জঙ্গলের কিনারা থেকে একটু পিছিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বসে রয়েছে কর্নেল রেজনিক আর বেন নেলসন। লী রেফারীর বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। রেজনিকের চোখে ফিল্ড গ্লাস, বাড়ির সামনে শীলা রেফারীকে দেখতে পাচ্ছে সে। রোদে শুকানো কাপড়গুলো তুলে ভাঁজ করছে শীলা।

'শীলার দিকে এগোচ্ছেন মি. রানা,' বলল রেজনিক।

'স্বামীটাকে দেখতে পাচ্ছেন?' জানতে চাইল বেন।

'নিশ্চয়ই বাড়ির ভেতর কোথাও আছে,' গ্লাস জোড়া সামান্য একটু সরাল রেজনিক। 'শীলার সাথে কথা বলছেন মি. রানা।'

'কোল্ট ফরটি-ফাইভটা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না তো?'

'ওটার ওপর উইণ্ডব্রেকার চাপিয়ে রেখেছেন,' সামনের দৃশ্যটা ভাল করে দেখার জন্যে ঝোপের সরু একটা ডাল বাঁকিয়ে মট্ করে ভেঙে ফেলল রেজনিক। 'বাড়ির ভেতর ঢুকছেন এখন।'

'আমাদেরও এবার এগোনো উচিত,' বলল বেন। ভাঁজ করা হাঁটু সোজা করে উঠে দাঁড়াচ্ছে সে, এই সময় রেজনিকের লোহার মত শক্ত একটা হাত তার কাঁধে চাপ দিয়ে আবার তাকে বসিয়ে দিল।

'সাবধান! ঘুর ঘুর করছে ডাইনীটা। সাথে কেউ এসেছে কিনা দেখে নিচ্ছে।'

বাড়ির সামনে উঠানে অলস পায়চারির ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে শীলা রেফারী, কুকুরের গলায় বাঁধা চেইনের অপর-প্রান্তটা ধরে আছে বাঁ হাতে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে জঙ্গলের কিনারা। মিনিট দুয়েক পর রাস্তার দিকে শেষ একবার তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির কোণে। একটু পরই ঘেউ ঘেউ শব্দ ভেসে এল। প্রতিবাদের সুরে চেঁচাচ্ছে কুকুরটা।

'আমি পিছন দিয়ে ঢুকব বাড়িতে,' বলল রেজনিক। 'আমাকে একটু সময় দিয়ে তার পর আপনি এগোবেন।'

মাথা ঝাঁকাল বেন। 'কুকুর হইতে সাবধান।'

'ওকে বোধহয় বেঁধে রেখেছে,' রওনা হয়ে গেল রেজনিক। ছোট ঢাল বেয়ে একটা নালার ভেতর নেমে গেল সে।

বাড়িটার পিছনের দরজাটা দেখতে পাচ্ছে রেজনিক, আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। এই সময় গুলির শব্দ শুনতে পেল সে।

*

চোখের সামনে রিস্টওয়াচ তুলে সময় দেখছে বেন, আচমকা বিস্ফোরণের আওয়াজে চমকে উঠল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ক্ষ্যাপা গণ্ডারের মত তীরবেগে ছুটল ঢাল বেয়ে। চেহারায় একটা উদভ্রান্ত ভাব। রাইফেলের আওয়াজ চিনতে ভুল হয়নি। প্রায় পৌঁছে গেছে বেন, এমনি সময়ে অকস্মাৎ দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল শীলা রেফারী, বারান্দা থেকে সিঁড়ির ধাপ গড়িয়ে পড়ল গিয়ে উঠানে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে বেন, হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে শীলার রক্তাক্ত পোশাকের দিকে। বয়স্কা মহিলা, কিন্তু সার্কাসের ট্রেনিং পাওয়া ছুকরির মত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে বেন, শীলার হাতে ধরা রয়েছে একটা রাইফেল।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরতে যাবে, এমনি সময় দেখে ফেলল সে বেনকে। বেকায়দায় ধরা রাইফেলটা সোজা করার জন্যে সময় নিল না সে। একটা হাত ব্রীচে, আরেকটা হাত ব্যারেলের ওপর, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল শীলা।

বুলেটের ধাক্কা খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল বেন, দড়াম করে পড়ল ঘাসের ওপর, রক্ত ভরা বেলুনের মত ফেটে গেছে তার উরু। লাল হয়ে উঠেছে ট্রাউজারটা।

সব কিছুই স্লো-মোশন ছবির মত ধীর লয়ে ঘটতে দেখছে যেন রানা। উইনচেস্টারের মাজল ঝলসে উঠল ওর মুখের ওপর। প্রথমে মনে হলো, আহত হয়েছে সে। কিন্তু ছিটকে মেঝেতে পড়ার পর আবিষ্কার করল হাত-পা নাড়তে পারছে। শীলার বুলেট কানের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে, আর ওর বুলেট রাইফেলের স্টকটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তারপর বাঁক নিয়ে ছুটে গিয়ে একটা কেরোসিন ল্যাম্পে লেগেছে বুলেটটা। চুরমার হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এখনও কাঁচের গুঁড়ো।

হিংস্র পশুর মত হুঙ্কার ছেড়ে হাতের ঝুলন্ত পাইপটা ছুঁড়ে মারল লী। রানার কানের নিচে, ঘাড়ের পাশে বাড়ি খেল সেটা। জ্বলন্ত ছাই আর আগুনের ফুলকির ছ্যাঁকা খেয়ে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে বসল রানা। সবকিছু ঝাপসা দেখছে ও। কোল্টটা তুলে একটা ধোঁয়াটে আকৃতির দিকে লক্ষ্য স্থির করছে, বুঝতে পারছে ওটাই লী।

চোখের পলকে রাইফেলের ব্যারেল নামিয়ে আনল শীলা, রানার হাতে ধরা কোল্টের ওপর পড়ল সেটা। মেঝেতে পড়ে ঠকাঠক নাচতে নাচতে সোজা গিয়ে ঢুকল পিস্তলটা ফায়ারপ্লেসের ভেতর।

রানার দিকে এগিয়ে আসছে লী। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে টেবিলের তলা থেকে এক হাত লম্বা একটা ফাঁপা লোহার পাইপ তুলে নিল সে। রাইফেল কক্ করছে শীলা। পাইপটা কাঁধের ওপর তুলে ধরেছে লী, রানার মাথার ওপর নামিয়ে আনছে।

বাঁ হাত তুলে মাথা আড়াল করল রানা। বাড়িটা লাগতেই থর থর করে কেঁপে উঠল শরীর, কিন্তু হাড় ভাঙার কোন শব্দ হয়নি লক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে গেল ও। প্রচণ্ড এক লাথি মারল সে লীর হাঁটু লক্ষ্য করে। পিঠ বাঁকা করে ঝুঁকে ছিল লী, চরকির মত ঘুরে গেল শরীরটা, তারপর ধপাস করে পড়ে গেল ওর ওপর।

'গুলি কর্ মাগী!' প্রচণ্ড রাগে গর্জে উঠল লী।
'কি করে!' তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল শীলা। 'সামনে যে তুমি!'
পাইপটা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে লী। তার গলায় শক্ত ফাঁসের মত জড়িয়ে আছে রানার ভাল হাতটা। ধস্তাধস্তি করছে ওরা দু'জন, আর কামরার চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে শীলা, উত্তেজিত ভাবে বারবার তাক করছে রাইফেল, কিন্তু রানার সামনে লীকে দেখে ট্রিগার টিপতে গিয়েও সামলে নিচ্ছে নিজেকে শেষ মুহূর্তে। লীকে ছাড়ছে না রানা, নিজের সামনে টেনে এনে একটা আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে তাকে, সেই সাথে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সাপের মত শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠল লীর, রানার পেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল সে। ব্যথায় অসাড় হয়ে গেল রানার শরীর। নিজেকে মুক্ত করে নিয়েই ডাইভ দিয়ে সরে গেল লী।
মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে রানার। হাঁপাচ্ছে। আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে, রাইফেল তুলে গুলি করতে যাচ্ছে শীলা। অসহায়ভাবে হাত দিয়ে মেঝে হাতড়াচ্ছে ও। পাইপের একটা প্রান্ত ঠেকল আঙুলে। খপ্ করে সেটা ধরেই তুলে ফেলল, তারপর লক্ষ্য স্থির না করেই সমস্ত শক্তি দিয়ে মারল শীলার দিকে।
শীলার ডান বুকে রকেটের মত গিয়ে আঘাত করল লোহার পাইপটা। কাপড় ভেদ করে থলথলে মাংসের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল শীলা, লম্বা হয়ে থাকা পাইপটা একটু একটু করে ঝুলে পড়ছে, মাংসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঠকাস করে মেঝেতে পড়ে গেল। আহত পশুর মত গোঙাচ্ছে শীলা। তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা, কাঁধের ধাক্কা খেয়ে প্রায় উড়ন্ত অবস্থায় চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল শীলা।
'শালা বানচোত্!' বলেই ঝাঁপিয়ে ফায়ার প্লেসের ওপর পড়ল লী, ছোঁ মেরে তুলে নিল ছাইয়ের গাদা থেকে কোল্ট পিস্তলটা, ঝট করে ঘুরল রানার দিকে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দের সাথে ধপ্ করে কিচেনের মেঝেতে পড়ল রেজনিক, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল একটা টেবিল। চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল লী, মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে। পরমুহূর্তে আবার যখন রানার দিকে তাকাল সে, দেখল তার মাথার ওপর নেমে আসছে রক্তাক্ত পাইপটা। হাত তুলে মাথাটাকে আড়াল করতে চাইল লী, কিন্তু সময় পেল না। হাত দুটো অর্ধেক দূরত্ব পেরোবার আগেই পাইপটা চুরমার করে দিল তার মাথার খুলি।
ওদিকে ঘাসের ওপর বসে আছে বেন, বোকার মত তাকিয়ে আছে ফুটো হয়ে যাওয়া উরুর দিকে। বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মুখ তুলে তাকাল। ঠিক কি ঘটেছে আর ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে চেষ্টা করছে।
হঠাৎ ঝুলে পড়ল তার মুখ, ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে এল শিরদাঁড়া বেয়ে। বেরিয়ে যাওয়া বুলেটের শেলটা ফেলে দিয়ে রাইফেল কক্ করছে শীলা। হাসছে সে। তাড়াহুড়ো না করে বেনের বুকের বাঁ দিকে তাক করল। বাঁকা হয়ে চেপে বসছে ট্রিগারে আঙুলটা।
বিস্ফোরণের আওয়াজটা কানে তালা ধরিয়ে দিল বেনের। কণ্ঠনালী ছিঁড়ে

দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, হাঁটু ভেঙে বেনের ওপরই পড়ে গেল শীলা। হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে গলার ফুটো থেকে। সদ্য জবাই করা গরুর মত মাটিতে হাত-পা ছুঁড়ছে শীলা। রক্ত লেগে সবুজ ঘাসের ডগাগুলো কালচে হয়ে উঠছে।

বারান্দার রেইলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, ডান হাতে ধরা রয়েছে কোল্ট, ব্যারেলটা রিকয়েল পজিশনে তির্যকভাবে মুখ করে রয়েছে আকাশের দিকে।

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নামছে রানা, এই সময় কামরা থেকে বেরিয়ে এল রেজনিক। ঘাসের ওপর বেনকে পড়ে থাকতে দেখে লাফ দিয়ে রেইলিঙ টপকাল সে. ছুটল বেনের দিকে।

বেনের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বসে আছে রেজনিক, এই সময় ওদের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। চোখ খুলল বেন। মুখে ক্ষীণ একটু হাসি। 'সবচেয়ে খুশি হবে আমার মা। তার একমাত্র ছেলেকে বাঁচিয়েছ তুমি, দোস্ত…' কথা শেষ করতে পারল না বেন, হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল।

দুই

নিউআর্ক, নিউজার্সি। ইউনিভার্সেল আর্মস করপোরেশন।

টার্নার ব্রুনোর সাথে তার অফিসে বসে আছে রানা। ঠিকই বলেছিল লী রেফারী, লোকটাকে দেখে অস্ত্র-ব্যবসায়ী নয়, ফেরিওয়ালা বলে মনে হয়। শরীরটা স্থূল, চেহারাটা কদাকার। তবে এখন আর সে ভাইস প্রেসিডেন্ট নয়, পদোন্নতির ফলে ইউনিভার্সেল আর্মস করপোরেশনের প্রেসিডেন্ট এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান।

রানার দিকে তীক্ষ্ণ, বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ব্রুনো। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম,' কর্কশ গলায় বলল সে। 'কিন্তু তার তো কোন উপায় দেখছি না।'

'উপায় আছে,' শান্তভাবে বলল রানা। 'আপনার রেকর্ড চেক করলেই ব্যাপারটা জানা যায়।'

'অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার,' গম্ভীর হলো ব্রুনো। 'যাকে তাকে দেখানো সম্ভব নয়। আমার কাছ থেকে যারা অস্ত্র কেনে তারা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চায়, যদি জানতে পারে…'

'কিন্তু কার কাছে কি অস্ত্র বিক্রি করলেন তা যখন ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টকে জানাবার আইন আছে, তাহলে আর এত রাখ রাখ ঢাক ঢাক কেন?'

'আপনি ডিফেন্সের লোক, মি. রানা?' গম গম করে উঠল ব্রুনোর গলা।

'সরাসরি না হলেও, তাই।'

'জানতে পারি আপনি কার প্রতিনিধিত্ব করছেন?'

'দুঃখিত, তা জানানো সম্ভব নয়।'

অস্বস্তির একটা ছায়া পড়ল ব্রুনোর চেহারায়, এদিক ওদিক মাথা নাড়তে নাড়তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'আমি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, মি. রানা, নষ্ট করার মত সময় নেই। কিছু যদি মনে না করেন, আপনি এখন...'

চেয়ার ছেড়ে ওঠার কোন লক্ষণ নেই রানার মধ্যে। ব্রুনোকে বাধা দিয়ে বলল, 'বসুন।' অনুরোধ নয়, কঠোর আদেশের মত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

রানার চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে স্থির হয়ে গেল ব্রুনো। উজ্জ্বল কোন পাথরের দুটো টুকরো যেন। কয়েক সেকেণ্ড নড়ল না সে। ইতস্তত করছে। রানার কথা অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েও শেষ মুহূর্তে কি ভেবে যেন কাঁধ ঝাঁকাল, নিঃশব্দে আবার বসে পড়ল চেয়ারে।

চিবুক নেড়ে টেলিফোনটা দেখাল তাকে রানা। 'জেনারেল কেলনার ফিল্ডকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন।'

'জেনারেল ফিল্ড?' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ব্রুনোর। 'ফরেন আর্মস শিপমেন্টের চীফ ইন্সপেক্টর? আপনি তাঁর কাছ থেকে এসেছেন?'

ইঙ্গিতে টেলিফোনটা আরেকবার দেখাল ব্রুনোকে রানা।

'কিন্তু জেনারেলকে ফোন করার আগে তাঁর সাথে আপনার সম্পর্কটা কি জানতে চাই আমি।'

'যা বলছি করুন,' বলল রানা। 'সবই জানতে পারবেন।'

'এর মধ্যে হুমকির সুর লক্ষ্য করছি আমি, মি. রানা,' গম্ভীর গলায় বলল ব্রুনো। 'আপনার অনুরোধ রক্ষা করা না হলে আপনি জেনারেল ফিল্ডকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবেন, এই তো?'

'সামান্য একটা তথ্য জানতে চেয়েছি আমি,' বলল রানা। 'লী রেফারীর কাছ থেকে যে ন্যাভাল শেলগুলো কিনেছেন সেগুলো এখন কোথায়?' মুচকি একটু হাসল রানা। 'আমার অনুরোধ আপনি রাখছেন না, কিন্তু জেনারেল ফিল্ড যদি আদেশ করেন?'

চেহারাটা লাল হয়ে উঠল ব্রুনোর। 'সেক্ষেত্রে...হুঁ, ঠিক আছে, দেখা যাক।' হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল সে।

'এই নিন, জেনারেলের ফোন নাম্বার,' বলল রানা, এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে ধরল ব্রুনোর দিকে।

'দরকার নেই', বলল ব্রুনো। 'জেনারেলের সব ক'টা ফোন নাম্বার আমার জানা আছে।' ডায়াল করছে সে। 'কিন্তু এখন কি পাওয়া যাবে জেনারেলকে? লাঞ্চ খেতে বেরিয়ে গেছেন কিনা...'

'জেনারেল তাঁর ডেস্কে বসেই লাঞ্চ সারেন।'

এবার নিয়ে তিনবার বাজছে ফোনের বেল। ট্রাউজারের গায়ে হাতের তালুর ঘাম মুছে নিয়ে রিসিভারটা তুলল কর্নেল রেজনিক। কথা বলার আগে বাঁ হাতে ধরা সাগর কলায় মস্ত একটা কামড় দিয়ে নিল। 'জেনারেল কেলনার ফিল্ড বলছি।'

'জেনারেল, ইউনিভার্সেল আর্মস থেকে টার্নার ব্রুনো বলছি...'

‘খাবার সময়ও শান্তি দেবে না তোমরা আমাকে? যা বলতে চাও, তাড়াতাড়ি বলো। গলার আওয়াজটা অমন ভোঁতা শোনাচ্ছে কেন তোমার?’

‘জেনারেল, আপনার গলাও কেমন যেন…’

‘খাচ্ছি, তাই,’ বলল রেজনিক। ‘মতলবটা কি বলে ফেলো তাড়াতাড়ি।’

‘অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত, জেনারেল,’ অপরপ্রান্ত থেকে বলছে ব্রুনো। ‘মি. মাসুদ রানা নামে কাউকে চেনেন আপনি?’

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর রেজনিক বলল, ‘রানা? মাসুদ রানা? খুব চিনি। কেন, তার ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছ কেন? তোমার মত ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করার উপযুক্ত লোক সে, সন্দেহ নেই। সিনেট আর্মড ফোর্স কমিটির একজন ইনভেস্টিগেটর সে।’ একটু থেমে রেজনিক আবার জানতে চাইল, ‘কি ব্যাপার, ব্রুনো?’

‘ওঁর তাহলে ক্ষমতা আছে…?’

‘ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে? কোন কোন ক্ষেত্রে আমার চেয়ে বেশি।’

‘আমার সামনে বসে রয়েছেন উনি,’ বলল ব্রুনো। ‘স্টক, বেচাকেনার রেকর্ড ইত্যাদি দেখতে চাইছেন।’

‘নার্ভ-গ্যাস উইপন কোথায় কি আছে তার খোঁজ বের করাই ওর কাজ,’ সাগর কলায় আরেকটা কামড় দিয়ে বলল রেজনিক। দেরাজ খুলে তার ভেতর কলার খোসাটা রাখল। ‘তোমার কাছে যদি কোন গ্যাস ক্যান থাকে, ওকে জানাও। তা নাহলে বিপদে পড়বে। ওকে ভয় পাবার কিছু নেই, ও শুধু তথ্যগুলো চায়। কিন্তু ভুল তথ্য দিয়ে যদি ধরা পড়ো, তোমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে ওই লোক। সাবধান।’

‘ধন্যবাদ, জেনারেল, অসংখ্য ধন্যবাদ,’ অপরপ্রান্ত থেকে কৃতজ্ঞ চিত্তে বলল ব্রুনো। ‘আপনার পরামর্শ না পেলে আমি বোধহয় ভুলই করে ফেলছিলাম।’

রিসিভার নামিয়ে রেখে স্বস্তির গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলল রেজনিক। রুমাল বের করে রিসিভারটা মুছল সে, তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে এল হলরুমে। জেনারেলের অফিসের দরজা বন্ধ করছে, এই সময় করিডরে দেখা গেল সবুজ ইউনিফর্ম পরা একজন ক্যাপ্টেনকে। কর্নেলকে দেখে সন্দেহের ছায়া পড়ল ক্যাপ্টেনের চেহারায়।

‘এক্সকিউজ মি, কর্নেল,’ দাঁড়িয়ে পড়েছে ক্যাপ্টেন। ‘আপনি কি জেনারেলের সাথে দেখা করতে চান? কিন্তু তিনি তো লাঞ্চ খেতে বাইরে গেছেন।’

তীব্র দৃষ্টি হানল কর্নেল, ক্যাপ্টেনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, ‘জেনারেলকে আমি চিনি না। কংক্রিটের এই জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আর্মি অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাণ্ড সেফটি ডিপার্টমেন্ট খুঁজছি আমি।’

সন্দেহ এবং অস্বস্তি থেকে মুক্ত হয়ে মৃদু একটু হাসল ক্যাপ্টেন। ‘আর বলবেন না, কর্নেল। আমি নিজেই দিনের মধ্যে কম করেও দশবার পথ হারিয়ে ফেলি। এর নিচের তলায় নামতে হবে আপনাকে। ডান দিকে এগিয়ে বাঁক নিলেই এলিভেটরটা দেখতে পাবেন।’

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।'

'মাই প্লেজার, স্যার।'

এলিভেটরের ভেতর ঢুকে রেজনিক ভাবছে, দেরাজ খুলে কলার খোসাটা যখন পাবেন জেনারেল, কি ভাববেন তিনি?

ইউনিভার্সেল আর্মস কর্পোরেশনের অয়্যারহাউস। নীল ইউনিফর্ম পরা চারজন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে গেটের দু'পাশে। প্রত্যেকের কাঁধের সাথে ঝুলছে অত্যাধুনিক অ্যাসল্ট রাইফেল।

রোলস-রয়েস থামিয়ে স্টিয়ারিং হুইল থেকে দুটো হাতই মূহূর্তের জন্যে ওপরে তুলে ফেলল ব্রুনো, ভঙ্গিটা যেন গার্ডদের প্রতি সস্নেহ আদরের প্রকাশ। প্রকাণ্ডদেহী গার্ডদের নেতা একবার শুধু ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল। সেটা লক্ষ্য করে একজন গার্ড এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল গেট।

'ওটা বোধহয় সিগন্যাল?'

'মাপ করবেন, আপনার প্রশ্নটা ঠিক...' রানার দিকে তাকিয়ে শুরু করল ব্রুনো।

'স্টিয়ারিং হুইল থেকে হাত তুললেন।'

'হ্যাঁ,' মুখের চেহারা কালো হয়ে গেছে ব্রুনোর। 'সিগন্যাল। আপনার হাতে আড়াল করা একটা রিভলভার থাকলে হাত দুটো হুইল থেকে তুলতাম না। আপনার দৃষ্টি থাকত গেটের দিকে, আর যে গেট খুলছে সেই গার্ডের দিকে। ওই ফাঁকে ওদের একজন চুপিসারে গাড়ির পিছন দিকে সরে এসে ফুটো করে দিত আপনার খুলি।'

'হাত তুলতে ভুল করেননি, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

'আপনার নজর বড় চোখা, মি. রানা,' গম্ভীর গলায় বলল ব্রুনো। 'গেট গার্ডদের জন্যে নতুন সিগন্যালের ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।' গাড়ি ছেড়ে দিল সে, গেট পেরিয়ে সরু কংক্রিটের রাস্তা ধরে ছুটছে রোলস-রয়েস। রাস্তার দু'পাশে প্রকাণ্ড টিন-শেডের সারি, প্রায় মাইল খানেক লম্বা। এরপর ফাঁকা মাঠ, মাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাঙা, আধা-ভাঙা বিভিন্ন আকারের আর্মার ট্যাংক। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করছে মেকানিকরা।

'কত একর নিয়ে আপনার এই অয়্যারহাউস?' জানতে চাইল রানা।

'পাঁচ হাজার,' বলল ব্রুনো। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ছয়টা অস্ত্র সমাবেশের একটা দেখছেন আপনি। এয়ারফোর্স ইকুইপমেন্টের হিসাবে সপ্তম স্থান অধিকার করে আছি আমরা।'

কংক্রিটের রাস্তা ছেড়ে একটা মেটো পথে নেমে এল রোলস-রয়েস। পাহাড়ের ধারে বড় বড় টিন-শেড, গুহার ভেতরও অস্ত্র রাখার জন্যে জায়গা করে নেয়া হয়েছে। 'আরসেনাল সিক্স' লেখা একটা টিন-শেডের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ব্রুনো। নিচে নেমে পকেট থেকে একটা চাবি বের করল, প্রকাণ্ড তালায় ঢুকিয়ে ঘোরাতেই খুলে গেল সেটা। ইস্পাতের পাত মোড়া কবাট দুটো উন্মুক্ত

করে দেয়াল হাতড়ে সুইচ অন করল সে। 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকে টিন-শেডের আকার দেখে বিস্মিত হলো রানা। ঢাকা স্টেডিয়ামের অর্ধেক তো বটেই, তার চেয়ে বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়। হাজার হাজার অ্যামুনিশনের বাক্স একটার ওপর আরেকটা সাজানো রয়েছে, আরেক ধারে আকারে আরও বড় কাঠের বাক্স দেখা যাচ্ছে, নানা ধরনের শেল আছে ওগুলোয়। সারিগুলোর শেষ প্রান্ত অনেক দূরে, দেখা যায় না। এর আগে এক সাথে এত বেশি মারণাস্ত্র দেখেনি রানা।

হুড খোলা ছোট একটা রেল গাড়ি দেখাল ব্রুনো, বলল, 'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে নামছি না আমরা, কাজেই ওটা ব্যবহার করা যেতে পারে।'

'এর নিচেও অস্ত্রপাতি আছে?'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড গোডাউনটা প্রায় দুই মাইল লম্বা।'

ভেতরটা ঠাণ্ডা। বিদ্যুৎচালিত গাড়িটার মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। খানিক দূর এগিয়ে একটা সাইড টানেলে ঢুকল গাড়ি। গতি কমিয়ে আনল ব্রুনো। আলোর সামনে একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলল সে। 'ষোলো ইঞ্চি ন্যাভাল শেল আজকাল ব্যবহার করা হয় না বললেই চলে,' মুখ তুলে বলল সে। 'পাওয়াও যায় না কোথাও, কিন্তু আমার কাছে এখনও কিছু আছে। এগুলো কিনে ভাল ব্যবসা করতে পারিনি আমি। এখান থেকে শুরু, শেষ হয়েছে প্রায় একশো গজ দূরে, ষোলো ইঞ্চি গ্যাস শেলগুলোও এই সারিগুলোর মধ্যে পাবেন। রেফারীর কাছ থেকে যেগুলো কিনেছিলাম, বাঁ দিকে প্রথম সারির মাঝখানে কোথাও আছে।'

'কিন্তু একটা শেলও ক্যানে মোড়া দেখছি না।'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্রুনো। 'ব্যবসা করতে হলে লোকসান দিতে নেই। স্টেন-লেস স্টীল ক্যানের অনেক দাম। ওগুলো আমি একটা কেমিক্যাল কোম্পানীর কাছে বেচে দিয়েছি।'

'কিন্তু এত শেলের মধ্যে ওগুলো খুঁজে বের করা...'

'মোটেও কঠিন কাজ নয়,' বলল ব্রুনো। 'গ্যাস শেলগুলো লট সিক্স-এ আছে।' গাড়ি থেকে নেমে পা বাড়াল সে। প্রজেক্টাইলের মাঝখান দিয়ে বিশ-পঁচিশ গজের মত এগিয়ে থামল। পিছনে রানার পায়ের আওয়াজ পেয়ে হাত তুলে একটা সরু গলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'ওই যে, পেয়েছি।' গলির ভেতর ঢুকে কয়েক পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সে। আগের জায়গায়, মেইন প্যাসেজে দাঁড়িয়ে আছে রানা।

ব্রুনোর মাথার ওপর উজ্জ্বল বালব। তার চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখল রানা। 'কি ব্যাপার?' দ্রুত জানতে চাইল ও।

চুপ করে থাকল ব্রুনো। মাথা নাড়ছে এদিক ওদিক। তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি না। এখানে মাত্র চারটে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু থাকার কথা আটটা।'

গায়ে কাঁটা দিচ্ছে রানার। স্তব্ধ হয়ে থাকল কয়েক সেকেণ্ড। সমস্ত শরীরের পেশীতে টান পড়েছে। 'খুঁজে দেখুন, নিশ্চয়ই কোথাও আছে।'

'প্লীজ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,' বলল ব্রুনো। 'ওই প্রান্ত থেকে চেক

করতে শুরু করুন আপনি, লট থারটি থেকে। আমি লট ওয়ান থেকে শুরু করছি।'

চল্লিশ মিনিট পর মাঝামাঝি জায়গায় আবার ওরা মিলিত হলো। স্তম্ভিত একটা ভাব ফুটে উঠেছে ব্রুনোর চেহারায়।

'নেই!'

'চালাকি করার জায়গা পাননি!' নিজের গলার আওয়াজে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল রানা, চারদিক থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে কথাগুলো। 'নিশ্চয়ই আপনি বিক্রি করে দিয়েছেন ওগুলো।'

'না!' জোরের সাথে প্রতিবাদ জানাল ব্রুনো। 'ওগুলো কিনে ঠকে গিয়েছিলাম আমি। কোন সরকারই গ্যাস শেল কিনতে চায় না আজকাল...'

'বাকি চারটে তাহলে গেল কোথায়?' অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল ব্রুনো। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ইনভেনটরি রেকর্ড চেক করে দেখা যাক। বিক্রি যদি করা হয়ে থাকে, তাও জানা যাবে। কিন্তু বিক্রি যে হয়নি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

টানেলের ঢোকার মুখে এসে দাঁড়াল ব্রুনো। হুকে ঝোলানো টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে দ্রুত ডায়াল করল। সতর্ক করে দিল অফিসকে। রানাকে সাথে নিয়ে সে যখন অফিসে গিয়ে পৌঁছুল, কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্টেন্ট খাতা-পত্র খুলে অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। দ্রুত লেজারের পাতা উল্টে সাত মিনিটের মধ্যে উত্তর বের করে ফেলল ব্রুনো।

'আমারই ভুল হয়েছে,' মৃদু গলায় বলল সে।

চুপ করে আছে রানা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে, ধীরে ধীরে বাঁকা হয়ে শক্ত মুঠো হয়ে যাচ্ছে হাতের আঙুল।

'বাকি চারটে গ্যাস শেল বিক্রি হয়ে গেছে।'

এখনও চুপ করে আছে রানা, স্থির চোখের মণিতে খুনের নেশা।

'মারাত্মক একটা ত্রুটি,' ম্লান গলায় বলল ব্রুনো। 'যেখান থেকে নেবার কথা সেখান থেকে না নিয়ে অন্য লট নাম্বার থেকে শেলগুলো তুলে নিয়ে গেছে আরসেনাল কর্মীরা। অরিজিনাল শিপিং অর্ডারে বলা হয়েছে, লট সিক্সটিন থেকে চল্লিশটা হেভী ন্যাভাল অর্ডন্যান্স বের করতে হবে, কিন্তু তা না করে ওরা লট সিক্স থেকে নিয়ে গেছে ওগুলো। এর একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হতে পারে, সিক্সটিনের জায়গা সিক্স পড়েছে ওরা। তা সম্ভব। ওদের কার্বন কপিতে 'ওয়ান সংখ্যাটি ওঠেনি, শুধু সিক্স পড়েছে ওরা—নিশ্চয়ই তাই।'

গম্ভীর, থমথমে গলায় জানতে চাইল রানা, 'পারচেজ অর্ডারে কার নাম রয়েছে?'

'ওই একই মাসে তিনটে অর্ডার পাই আমরা...'

'তালিকাটা চাই আমি।'

'কিন্তু, মি. রানা,' প্রতিবাদের সুরে বলল ব্রুনো, 'আমার অসুবিধেটা দয়া করে

একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আমার পার্টিরা যদি জানতে পারে...'

'আপনি চান আপনার বিরুদ্ধে সিনেট কমিটিতে রিপোর্ট করি আমি?' রূঢ় গলায় জানতে চাইল রানা।

'তারচেয়ে আপনি আমাকে গুলি করে মেরে ফেলুন,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ব্রুনো। তারপর সামলে নিল। 'বেশ, ঠিক আছে।' একটা প্যাড টেনে খসখস করে তাতে ক্রেতাদের নাম ঠিকানা লিখল সে। 'কিন্তু আপনার কাছে অনুরোধ রইল, আমার পার্টিদেরকে যেন ভুগতে না হয়, মি. রানা।' প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

একটা শেল কিনেছে ব্রিটিশ ইমপিরিয়াল ওয়র মিউজিয়াম, লণ্ডন। দুটো নিয়ে গেছে ফরেন ওয়রস্, ডেটন সিটি পোস্ট নাইন-নাইন-সেভেন-ফোর, ওকলাহোমা-র একদল বুড়ো সৈনিক। বাকি সাঁইত্রিশটা একজন বিদেশী এজেন্টের মাধ্যমে কিনেছে এ.এ.আর.—আফ্রিকান আর্মি অব রেভোলিউশন। কোন ঠিকানা দেয়া হয়নি।

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ভরল রানা, উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'এখানে যে চারটে শেল রয়েছে ওগুলো নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠাব আমি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ও। ব্রুনো কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে তার মুখের সামনে হাতের ঝাপটা মারল। 'কোন কথা নয়! আমার লোক এলে শেলগুলো দিয়ে দেবেন।'

'কিন্তু...' শুরু করল ব্রুনো।

'আপনি জানেন, ওর একটা যদি ফাটানো হয়, তার পরিণতি কি হবে?' ব্রুনোর নাকের ওপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে রানার, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে সে। 'লাখ লাখ, এমন কি কোটি কোটি লোকও মারা যেতে পারে। এবং সেজন্যে, যত সামান্যই হোক, আপনিও দায়ী হবেন।'

এই প্রথম দাঁত বের করে হাসল টার্নার ব্রুনো। 'লাখ বা কোটি, ওসব আমার কাছে নিষ্প্রাণ সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, মি. রানা। একজন ব্যবসায়ী শুধু তার লাভ-লোকসানই বোঝে। আর কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কি দায় পড়েছে তার?'

টেক্সাস। শেপার্ড এয়ারফোর্স বেসের এয়ারস্ট্রিপ। স্পুক এফ-ওয়ান-ফোর-জিরো নিয়ে নামল কর্নেল রেজনিক। ফ্লাইট অপারেশন অফিসারের সাথে কথাবার্তা শেষ করে বেসের মটর পুল থেকে একটা গাড়ি ধার করল সে। ষাট মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে উত্তর দিকে আসছে। রেড রিভার পেরিয়ে প্রবেশ করল ওকলাহোমায়। তারপর বাঁক নিয়ে স্টেট হাইওয়ে ফিফটি-থ্রী-তে উঠে এল। তিনটে বাজে, কিন্তু রাস্তায় না আছে একটা গাড়ি, না আছে একটা লোক। রাস্তার দু'পাশে খাঁ খাঁ করছে গমের খেত। ফসল কাটা হয়ে গেছে, যতদূর চোখ যায় শুধু ফাঁকা মাঠ, সীমাহীন নির্জনতা। আধ ঘণ্টা পর ছোট একটা শহরে ঢুকল রেজনিক। চৌরাস্তায় কয়েকটা সাইনবোর্ড দেখে বুঝল ডেটন সিটিতে পৌঁছে গেছে সে। একটা মণিহারী

দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, 'ভেটেরান ফরেন ওয়র পোস্ট নাইনটি-নাইন সেভেনটি ফোর কোন দিকে বলতে পারেন?'

'সোজা ডান দিকে চলে যান, তারপর আবার বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে খানিক দূর গেলেই সাইনবোর্ডটা দেখতে পাবেন।'

সাইনবোর্ডটা ছাড়িয়ে একটা কাঁকর বিছানো রাস্তায় নেমে এল রেজনিক, গাড়ি থামাল প্রকাণ্ড একটা দোতলা বাড়ির সামনে। নিচে নেমে একটা সিগারেট ধরাল সে, সামনের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখল বিরাট একটা হলরুম, টেবিলে বসে খাওয়াদাওয়া করছে লোকজন। খানিক ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকল সে। একটা টেবিল থেকে তিনজন লোক লক্ষ করল তাকে, তাদের মধ্যে থেকে বিশালদেহী একজন হাত নাড়ল তার উদ্দেশে। এগিয়ে গেল রেজনিক।

'গুড আফটারনুন, কর্নেল,' হাসিমুখে বলল লোকটা। 'আপনি কাউকে খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ,' বলল রেজনিক। 'পোস্ট কমাণ্ডার, মি. গেভিনকে দরকার আমার।'

'আমিই তো। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

'হাউ ডু ইউ ডু,' নরম গলায় বলল রেজনিক। 'আমি রেজনিক, অ্যাবি রেজনিক। জরুরী একটা ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলার জন্যে ওয়াশিংটন থেকে এসেছি।'

'নিশ্চয়ই টপ-সিক্রেট কোন রাশান স্পাই স্যাটেলাইট আমাদের কাছে পিঠে কোথাও নেমেছে?' হালকা কৌতুকের সুরে বলল পোস্ট কমাণ্ডার।

হাসল না রেজনিক। 'দুটো ন্যাভাল শেলের খোঁজে এসেছি আমি,' মৃদু গলায় বলল সে। 'ইউনিভার্সেল আর্মস কর্পোরেশনের কাছ থেকে কিনেছেন আপনারা।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' বলল পোস্ট কমাণ্ডার গেভিন। 'নষ্ট শেল দুটোর কথা বলছেন আপনি।'

'নষ্ট?'

'ভেটেরানদের পিকনিক উপলক্ষে ফাটাতে চেয়েছিলাম ওগুলো। একটা ট্রাক্টরে সেট করে সারাটা বিকেল আমরা চেষ্টা করি, কিন্তু ফাটাতে পারিনি। পরে ইউনিভার্সেল আর্মসকে ফোন করে ব্যাপারটা তাদেরকে জানাই, কিন্তু শেলগুলো বদলে দিতে রাজি হয়নি তারা।'

উত্তেজনা চেপে রেখেছে রেজনিক। হাতের তালু ঘামছে তার। 'ওগুলো হয়তো সেলফ-ডিটোনেটিং ধরনের অর্ডন্যান্স নয়।'

'উঁহুঁ,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে পোস্ট কমাণ্ডার। 'ওরা গ্যারান্টি দিয়ে বলেছিল, জ্যান্ত ব্যাটলশিপ শেল ওগুলো।'

'তারপর?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল রেজনিক।

'তারপর মানে?'

'কোথায় সেগুলো? ফেলে দিয়েছেন?'

'না। আছে। ওগুলোর মাঝখান দিয়েই তো হেঁটে এসেছেন আপনি,' বলল পোস্ট কমাণ্ডার। রেজনিককে সাথে নিয়ে বাইরে এল সে।

পোস্টে ঢোকার মুখে দু'পাশে দুটো শেল লম্বা করে ফেলে রাখা হয়েছে। আসল চেহারা হারিয়ে গেছে সাদা রঙের নিচে। দুটোর গায়েই ঝালাই করে আঙটা বসানো হয়েছে, আঙটা দুটোর সাথে একটা চেইন বাঁধা রয়েছে, পথের ওপর একটা ফিতের মত ঝুলছে সেটা।

উত্তেজনায় কথা বলতে পারছে না রেজনিক। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে শেল দুটোর দিকে। ডগাগুলো গোলাকার। গ্যাস শেল। যে চারটে খুঁজছে ওরা, তারই দুটো এগুলো। হঠাৎ পা দুটো অসাড় হয়ে গেল রেজনিকের, ধীরে ধীরে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল সে। চোখের সামনেটা ঝাপসা লাগছে। ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে পোস্ট কমাণ্ডার।

'এনিথিং রঙ, কর্নেল?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল সে।

'ওগুলোর গায়ে গুলি করেছেন আপনারা?' রেজনিকের গলায় অবিশ্বাস।

'প্রায় একশো রাউণ্ড। মাথার দিকে খানিকটা ছাল ওঠাতে পেরেছিলাম শুধু, ব্যস।' তীক্ষ্ণ হলো গেভিনের দৃষ্টি। 'কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

'এক্সপ্লোসিভ নয়,' ধীরে ধীরে বলল রেজনিক, 'ওগুলো গ্যাস শেল। প্যারাস্যুট উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওগুলোর ফায়ারিং মেকানিজম সেলফ-অ্যাকটিভেট হবে না। আপনাদের বুলেটে কোন কাজ হয়নি, তার কারণ অন্যান্য সাধারণ এক্সপ্লোসিভ প্রজেক্টাইলের মত ডিটোনেটের জন্যে এর মেকানিজম আগে থেকেই সেট করা নেই।'

'আমার মাথা ঘুরছে, কর্নেল!' কপালে উঠে গেছে পোস্ট কমাণ্ডারের চোখ। 'আপনি বলতে চাইছেন, ওগুলোর ভেতর পয়জন গ্যাস আছে?'

ওপর-নিচে শুধু মাথা দোলাল রেজনিক।

'ইয়াল্লা! ইয়াল্লা! তার মানে হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর জন্যে দায়ী হতাম আমরা...'

'হয়তো আরও কয়েক হাজার গুণ বেশি,' বিড় বিড় করে বলল রেজনিক। সিঁড়ির ধাপ থেকে উঠে দাঁড়াল সে। 'আপনাদের বাথরুম আর টেলিফোনটা ব্যবহার করব আমি। শেলগুলো এখান থেকে...'

'অবশ্যই। আসুন আমার সাথে। হলের বাঁ দিকে গেলেই দেখতে পাবেন বাথরুম, আর আমার অফিসে ফোন আছে। কিন্তু, কর্নেল, শেলগুলো যদি আপনাকে নিয়ে যেতে দিই...'

'এগুলোর বদলে আপনার পোস্ট দশটা ষোলো-ইঞ্চি শেল যাতে পায় তার ব্যবস্থা আমি করব,' বলল রেজনিক। 'আগামী পিকনিকে ফাটাবেন ওগুলো। কেমন হবে সেটা?'

'ওয়াণ্ডারফুল!' দু'কান পর্যন্ত প্রসারিত হলো পোস্ট কমাণ্ডারের হাসি।

বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে ঠাণ্ডা পানির ছিটে দিচ্ছে রেজনিক। আয়নায় চোখ দুটোকে টকটকে লাল আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে, কিন্তু তবু দৃষ্টিতে ফুটে রয়েছে আশার আলো। চারটের মধ্যে দুটো কুইক-ডেথ ওয়রহেড উদ্ধার করতে পেরেছে সে। মনে মনে এখন শুধু একটাই প্রার্থনা তার, মি. রানার ভাগ্যও যেন তার মত ভাল

হয়।

নুমা হেডকোয়ার্টার। ডিরেক্টর জর্জ হ্যামিলটনের অফিস কামরা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের পার্সোনাল সেক্রেটারি মেরিলিন। খুট করে বোতাম টিপে ডেস্কের আলোটা জ্বালল। রিভলভিং চেয়ারের দিকে তাকাল না, জানে ওখানে কেউ বসে নেই। খানিক আগে চলে গেছেন চীফ। ধীর পায়ে একটা সোফার দিকে এগোচ্ছে মেরিলিন। ডেস্কের আলোটা সরাসরি পড়েনি সোফার ওপর, তবে উজ্জ্বল আভায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে রানাকে। মাথার পিছনে একটা হাত রেখে ঘুমাচ্ছে, একদিকে কাত হয়ে আছে মাথাটা, অপর হাতটা ঝুলে পড়েছে মেঝেতে। ঝুঁকে পড়ল মেরিলিন। ঘন কালো চুলের ফ্রেমে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে মুখটা, চোখের পাতা সামান্য একটু ফাঁক করে দেখতে পাচ্ছে রানা। হঠাৎ যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে সটান খাড়া হয়ে গেল মেরিলিন। 'মি. রানা,' তাড়াতাড়ি বলল সে, 'আপনি জেগে আছেন?'

'ছিলাম না,' সোফার ওপর উঠে বসল রানা, 'তোমার পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কি ব্যাপার?'

'লং ডিস্ট্যান্স টেলিফোন,' বলল মেরিলিন। 'কর্নেল রেজনিক। তিন নম্বর লাইনে।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল রানা। ডেস্কের সামনে গিয়ে তুলে নিল তিন নম্বর লাইনের রিসিভার। 'কর্নেল?'

'দুটো ওয়রহেড উদ্ধার করেছি, মি. রানা,' চিকন, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, কিন্তু আনন্দে উত্তেজনায় অধীর। 'ভাবতেও পারিনি এত সহজে...'

'ভেরি গুড,' বলল রানা, কয়েক দিনের মধ্যে আজ এই প্রথম হাসি দেখা যাচ্ছে ওর মুখে। 'কোন সমস্যা নেই তো?'

'নেই। ওগুলো নিয়ে যাবার জন্যে লোকজন না আসা পর্যন্ত এখানেই আছি আমি।'

'নুমার একটা ক্যাটলিন প্লেন দাঁড়িয়ে আছে ডালেস এয়ারপোর্টে, ফর্কলিফট ইত্যাদি সহ রেডি। কোথায় ল্যাণ্ড করবে ওটা?'

অপর প্রান্তে কার সাথে যেন আলোচনা করে নিল রেজনিক, তারপর বলল, 'শহরের দক্ষিণে ছোট একটা এয়ারস্ট্রিপ আছে, আটশো গজ লম্বা রানওয়ে—চলবে?'

'চারশো গজ রানওয়েতেও নামতে পারে ক্যাটলিন।'

'বাকি শেল দুটোর কোন খবর, মি. রানা?'

'এখনও কিছু জানতে পারিনি,' বলল রানা। 'ব্রিটিশ ইমপেরিয়াল ওয়র মিউজিয়ামের কিউরেটর জানিয়েছেন, ইউনিভার্সেল আর্মসের কাছ থেকে তারা যে ন্যাভাল শেল দুটো কিনেছেন সেগুলো অবশ্যই এক্সপ্লোসিভ শেল, সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।'

'তার মানে আফ্রিকান আর্মি অব রেভোলিউশনের কাছে রয়েছে বাকি দুটো ওয়র-হেড।'

'না, নেই,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন তাঁর গোপন সূত্র থেকে খবর নিয়ে জানতে পেরেছেন আফ্রিকান আর্মি অব রেভোলিউশন সরাসরি বা কোন এজেন্টের মাধ্যমে কখনও কোথাও থেকে কোন শেল কেনেনি।'

'হোয়াট!' আঁতকে উঠল রেজনিক। 'তার মানে টার্নার ব্রুনো মিথ্যে তথ্য দিয়েছে আপনাকে?'

'মনে হয় না,' বলল রানা। 'যে কিনেছে সে মিথ্যে পরিচয় দিয়েছে নিজের, অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'কেন? ব্যাপারটা গোপন করতে চাওয়ার উদ্দেশ্য? তার আসল পরিচয়?'

'ধীরে, কর্নেল, ধীরে,' বলল রানা। 'ভয়ঙ্কর আর জটিল একটা সমস্যা, রাতারাতি এর সমাধান বের করা সম্ভব নয়। প্রথম কাজ ওয়র-হেডগুলো কোথায় আছে তা জানা। এ-ব্যাপারে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন তাঁর একজন পুরানো বন্ধুর সাহায্য নিচ্ছেন। ভদ্রলোক ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর হেডকোয়ার্টারে আছেন।'

'কিন্তু এন.এস.এ.-র চীফ ডেভিড মরগান অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ,' বলল রেজনিক। 'তিনি যদি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন, সব ফাঁস হয়ে যাবে...'

'সে ভয় নেই,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন চমৎকার একটা কাভার তৈরি করেছেন, আসল ব্যাপার টের পাবে না কেউ।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, কখন যেন নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে মেরিলিন। ধীর পায়ে ফিরে এসে সোফায় বসল ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিল, চোখ বুজে চিন্তা করছে। 'লোরার কাকার গ্যারেজে স্ট্রাটোক্রুজারের অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ-গিয়ারটা দেখার পর থেকেই কেন যেন খুঁতখুঁত করতে শুরু করে ওর মন। নিজের কাছেই অস্বাভাবিক লেগেছিল ব্যাপারটা। মনের ওই খুঁতখুঁতে ভাবের জন্যেই একটা জেদ চেপে গিয়েছিল, এর শেষ দেখার জন্যে একটা তাগাদা অনুভব করেছিল ও। মন খুঁতখুঁত করার কারণটা কি, এখনও তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে না ও, কিন্তু বিশ দিন আগের এক সকালের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। সেদিন ওকে যা বলেছিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, তার সাথে বোধহয় একটা যোগাযোগ আছে এই ব্যাপারটার...সমস্ত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর...

বিশ দিন আগের কথা।

ঢাকা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। হেডকোয়ার্টার। সকাল দশটা। রানার অফিস কামরা।

অনেকদিন পর আবার ওরা নিজেদের মধ্যে পেয়েছে রানাকে। যে যার কাজ ফেলে চলে এসেছে আড্ডা মারতে। চাঁদা তুলে ঝাল-মুড়ির আয়োজন করেছে সোহানা। কোকাকোলার খরচ যোগাচ্ছে রূপা। আর বিনা অনুমতিতে রানার

প্যাকেট থেকে একের পর এক সিগারেট খাচ্ছে সোহেল, জাহেদ।

নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে রানা। ডেস্কের দুই কোণে বসে আছে সোহেল আর জাহেদ। সোহানা দাঁড়িয়ে—ঝাল-মুড়ি পরিবেশন করছে সে। আর ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে কোকাকোলার ছিপি খুলছে রূপা।

'উঁহুঁ, শুধু সিগারেট জরিমানা করে ওর শিক্ষা হবে না,' সোহেলকে উদ্দেশ করে বলছে জাহেদ। 'যে অন্যায় করেছে ও, আরও অনেক কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত ওর।'

'আহা, অন্যায়টা কি করলাম, বলবি তো?' জানতে চাইল রানা।

'চোপ্!' চাপা গলায় গর্জে উঠল জাহেদ। 'চোপ্ শালা! তুই এখন আসামী, আমরা তোর বিচার করছি...'

'কিন্তু এখানে ভদ্রমহিলারা রয়েছে, ভাষাটা একটু...'

'এই রানা, খবরদার,' প্রতিবাদের সুরে সতর্ক করে দিল রূপা, 'ফের যদি মহিলা বলো তো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। কেউ মহিলা বললেই কেন যেন আমার মনে হয়, দু'ছেলের মা হয়ে গেছি আমি।'

'ঠিক বলেছিস,' সায় দিল সোহানা।

'তোমরাও তাহলে আমার বিরুদ্ধে?' হতাশ গলায় বলল রানা।

'অবশ্যই,' বলল সোহেল। 'তোর বিরুদ্ধে আমাদের কাছে ওরাই তো বিচার দিয়েছে।'

'কিসের অভিযোগ?'

'ভদ্রতার অলিখিত চুক্তি হলো, অফিসে এসে সবার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা, ভাল-মন্দ জিজ্ঞেস করা,' বলল জাহেদ। 'কিন্তু তুই প্রায় মাস তিনেক অফিস ফাঁকি দিয়ে কাল দুপুর বেলা চোরের মত চুপি চুপি এসে বিড়ালের মত নিঃশব্দে পালিয়ে গেছিস।'

'শুধু তাই নয়,' বলল জাহেদ, 'একটা ছুটির দরখাস্ত দিয়ে সাথে সাথে সেটা মঞ্জুরও করিয়ে নিয়ে গেছিস। ছুটি পেলে যে সবাইকে মিষ্টি খাওয়াতে হয়, সেই আইনের কথাটা বুঝি মনে ছিল না?'

'ছুটি পেলে মিষ্টি খাওয়াতে হয়? কেন? কবে থেকে চালু হলো এই আইন? কে চালু করল?'

'আমরা,' রায় ঘোষণার সুরে বলল জাহেদ।

'কেউ যদি আইনটা ভাঙার চেষ্টা করে, সেজন্যে কি যেন শাস্তির ব্যবস্থা আছে, জাহেদ?' নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইল রূপা।

'আইন হলো মাথা পিছু দশ টাকা করে মিষ্টি খাওয়াতে হবে,' বলল সোহানা। 'কিন্তু কেউ যদি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, তার শাস্তি, যে যত খেতে পারে তাকে তত মিষ্টি খাওয়াতে হবে।'

'এবং এই আইন বা শাস্তির ব্যাপারে কোন আপত্তি তোলা যাবে না,' জানাল জাহেদ। 'কেউ যদি এর বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে, শাস্তির মাত্রা বেড়ে যাবে।'

'সেটা যেন কি?'

'সবাইকে চাইনীজ খাওয়াতে হবে।' একগাল হেসে বলল জাহেদ।

রানার সামনে হাত পাতল সোহানা, 'বের করো টাকা।'

'তিনশো দিলেই চলবে,' মন্তব্য করল সোহেল।

'যদি না দিই?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

সোহেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জাহেদ বলল, 'নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে, তাই না? এখন আর পেট ভরা মিষ্টিতেও হবে না। চাইনীজ!' মুখ নেড়ে এমন ভঙ্গি করল, জিভে যেন পানি এসে গেছে তার।

'বেচারা,' বলল রূপা। 'আপীল করারও সুযোগ নেই!'

ডেস্ক থেকে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বের করল রানা। ধরাল। 'আর যদি চাইনীজ খাওয়াতেও অস্বীকার করি আমি?'

'অমন বোকামি কেউ করে বলে মনে হয় তোর?' সোহেলকে জিজ্ঞেস করল জাহেদ।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সোহেল। তাকাল রানার দিকে। 'চাইনীজ খাওয়াতে অস্বীকার করলে, সে যদি অবিবাহিত হয়, কোথাও থেকে একটা মেয়ে যোগাড় করে তার সাথে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। বিয়ে মানেই খানাপিনা, বুঝতেই পারছিস? আর বিবাহিত হলে, ...তা জেনে দরকার নেই তোর।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার চেহারা। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'যাক বাঁচলাম। তোদের কৃপায় তবু আমার একটা বিয়ে হবে। বেশ, তাই দে। বিয়েই করব আমি।'

'অ্যাঁ? বিয়ে করবি? চাইনীজ খাওয়াবার ভয়ে?' বিস্ময় বাঁধ মানছে না জাহেদের।

'এত কথা কিসের?' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'তোদের বিচার তো মেনেই নিলাম। নিয়ে আয় মেয়ে। বিয়ে করা।'

ওরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

'ফাঁকি দেবার ভাল বুদ্ধি বের করেছে তো শালা,' ফিসফিস করে বলল জাহেদ।

ওদিকে একটু দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় শলা-পরামর্শ করছে রূপা আর সোহানা। একটু পরই নতুন বুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে এল রূপা। 'মেয়ে ঠিক হয়েছে। মৌলভী সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসতে পারো এখন।'

খুক্ করে কাশল রানা। 'মেয়েটা...মানে বলছিলাম কি, মেয়েটাকে যদি এক নজর দেখতে পেতাম...'

'মেয়ে খুব সুন্দরী,' রাশভারী ভঙ্গিতে বলল রূপা, 'দেখার কোন দরকার নেই।'

'তবু...হে...হে...'

এগিয়ে এল রূপা। হাত বাড়িয়ে রানার স্যুটের পকেট থেকে সাদা রুমালটা বের করে দ্রুত হাতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে একটা পুতুল তৈরি করে ফেলল সে। সেটাকে রানার সামনে ডেস্কের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এতই যখন দেখার শখ, এই নাও, মনের সাধ মিটিয়ে দেখো।'

হাসির বোমা পড়ল কামরার ভেতর। অনেক দিন এভাবে প্রাণ খুলে হাসেনি ওরা। সবার সাথে হাসছে রানাও।

এই সময় ডাক পড়ল। মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেম্বারে।

চোরের মত নিঃশব্দে চীফের কামরায় ঢুকল রানা। দুরু দুরু করছে বুক। হাতের তালু ঘামছে। ভয়টা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ইলোরা, চীফ নাকি কি একটা ব্যাপারে তাকে সাবধান করে দেবার জন্যে ডেকেছেন।

'এসো,' ফাইল দেখছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, মুখ না তুলেই গম্ভীর গলায় বললেন তিনি।

ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। তর্জনীর ইশারায় বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

কেন ডেকেছেন, কিছুই জানে না। কাল থেকে ছুটি, আজ হঠাৎ ডেকে পাঠাবার মত কি ঘটল?

শুধু দেয়াল ঘড়িটা টিক টিক করছে, আর কোন শব্দ নেই। একটানা অনেকক্ষণ থেকে কানের নিচেটা চুলকাচ্ছে, এবার নিয়ে দু'বার হাত তুলল রানা, কড়ে আঙুল দিয়ে জায়গাটা চুলকে নিয়ে হাতটা নামাতে যাবে, এই সময় ওকে চমকে দিয়ে রাহাত খান জানতে চাইলেন, 'এলার্জি আছে নাকি তোমার?'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার, তাড়াতাড়ি বলল, 'না তো, স্যার।'

চুরুট ধরাচ্ছেন রাহাত খান। 'ফাইলে তোমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কমপ্লেন দেখছি,' অসন্তুষ্ট গলায় বললেন তিনি। 'গত তিন মাসে দু'বার সর্দি হয়েছে তোমার!'

এইজন্যেই ডেকেছেন নাকি? আশঙ্কায় কাঁপছে বুক। আগের কথা মনে পড়ে গেল রানার। লম্বা ছুটি দিয়ে বি.সি.আই. থেকে সরিয়ে দেবার কোন প্ল্যান করেনি তো বুড়ো? কিছু বলার মত খুঁজে পাচ্ছে না, বোকার মত বসে ঘামছে।

গল গল করে নীলচে ধোঁয়া ছাড়লেন চীফ। 'স্বাস্থ্যের দিকে নজর দাও,' কাঁচা-পাকা ভুরুর নিচে অন্তর্ভেদী চোখ জোড়া রানার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। 'বি.সি.আই.-এর ওটা একটা শর্ত, চাকরি করতে হলে শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হবে।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বললেন, 'খুব বেশি রাত জাগো বুঝি?'

'না তো, স্যার,' শেখানো বুলির মত আওড়াল রানা।

'ছুটি থেকে ফিরে এসে মেডিকেল বোর্ডকে দিয়ে শরীরটা একবার চেক করিয়ে নিয়ো।'

'জ্বী, আচ্ছা, স্যার,' ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি বলল রানা।

'ছুটিতে ওয়াশিংটনে যাচ্ছ, নাকি সিদ্ধান্ত বদলেছ আবার?'

'ওয়াশিংটনেই যাচ্ছি, স্যার।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাহাত খান, তারপর রানার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'ছুটির মধ্যে কাজের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ো, তা আমার পছন্দ নয়। অনাবিল আনন্দ আর বিশ্রাম, তাকেই বলে ছুটি।'

ধাঁধার মত লাগছে চীফের কথাগুলো, উদ্দেশ্যটা এখনও ধরতে পারছে না রানা। কিন্তু ডেকে যখন পাঠিয়েছেন, উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে। কি সেটা?

'কবীর চৌধুরীর কোন খবর পেয়েছ আর?' দুম করে প্রশ্ন করে বসলেন রাহাত খান।

'না, স্যার,' বলল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে ও। 'আইসল্যাণ্ডের পর তার আর কোন খবর জানা নেই আমার। সি. আই.-এ তার তিনটে ল্যাবরেটরি পুড়িয়ে দিয়েছে, ধকলটা বোধহয় এখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।'

'ভুল করেছে ওরা,' গম্ভীর গলায় বললেন রাহাত খান। 'অতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয়নি ওদের। দশ বিলিয়ন ডলারের চেকটা আটকে দিয়েছিল, সেটাই যথেষ্ট ছিল, ল্যাবরেটরিগুলো পুড়িয়ে দিয়ে তাকে ওরা খেপিয়ে তুলেছে।'

আগ্রহে চকচক করছে রানার চোখ। 'আপনি তার কোন খবর পেয়েছেন, স্যার?'

'তোমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে সে,' বললেন রাহাত খান। কপালে চিন্তার রেখা।

'মেসেজ?'

'বরাবর যা করে থাকে, তোমাকে দেখে নেবে বলে হুমকি দিয়েছে সে,' বললেন মেজর জেনারেল। 'খারাপ কোন মতলব আছে তার, রানা। তার চালচলন আমার ভাল ঠেকছে না।'

অধীর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে রানা।

'শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানি কবীর চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে ছিল।' দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছেন চুরুটটা। ধীরে ধীরে হেলান দিলেন চেয়ারে। 'পুরানো অস্ত্র আর গোলাবারুদ কিনছে সে। কেন, তা জানা যায়নি। অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের নাম-ঠিকানাও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অনেক রাজ্যে ছড়িয়ে আছে তার এজেন্টরা, তারাই এসব কেনাকাটা করছে। তারা নাকি একটা জাহাজ সংগ্রহেরও চেষ্টায় আছে। কি মনে হয় তোমার, রানা?'

চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে রানার কপালে। 'লক্ষণ ভাল বলে মনে হচ্ছে না, স্যার,' বলল ও। 'কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র কিনছে, জাহাজ যোগাড় করার চেষ্টা করছে—অত টাকা সে পেল কোথায়?'

'মার্কিনীদের ওপর খেপে গেছে সে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে দরকার হলে মার্কিনীদের যারা শত্রু ভাবে তাদের সাহায্য নেবে সে। সাহায্য করতে এক পা এগিয়ে আছে এমন পার্টির তো অভাব নেই। জানতে পেরেছি কে. জি. বি-র এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে তার।'

'নিশ্চয়ই কোন প্ল্যান আছে তার, স্যার।'

'হ্যাঁ,' বললেন রাহাত খান। 'ওখানেই যখন যাচ্ছ, চোখ-কান একটু খোলা রেখো। এই কথা বলার জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম।' খোলা ফাইলে চোখ নামালেন তিনি। তার মানে, বিদায়।

উঠে দাঁড়াল রানা। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল চীফের কামরা থেকে।

তিন

ওয়াশিংটন।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর হেডকোয়ার্টার। কাফেটেরিয়া। রোজকার মত কোণের টেবিলে বসে লাঞ্চ খাচ্ছেন চীফ ডেভিড মরগান। পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকালেন তিনি, দেখলেন এজেন্সীর ডোমেস্টিক ডিভিশনের হেড স্যাণ্ডেকার সোজা তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। 'কি হে, এই অসময়ে কি মনে করে?' মরগান জানেন, বাড়িতে ছাড়া অন্য কোথাও লাঞ্চ করে না স্যাণ্ডেকার। ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন তিনি। 'বসো।'

টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল স্যাণ্ডেকার। বসল না। 'ধন্যবাদ, চীফ। সবাইকে নিয়ে মীটিঙে বসতে হবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে।' একটা সিগারেট ধরাল সে। 'এইমাত্র বারবারার সাথে কথা হলো, আপনি নাকি ব্যাটলশিপের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করছেন, স্যার?'

মুখ তুলে তাকালেন মরগান। ধীরে ধীরে আপেল পাই চিবাচ্ছেন। 'হ্যাঁ। কেন বলো তা?'

'আমার এক পুরানো বন্ধু, জর্জ হ্যামিলটন…'

স্যাণ্ডেকার একজন অবসরপ্রাপ্ত কমোডোর।

'নুমার ডিরেক্টর, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন?' বাধা দিয়ে জানতে চাইলেন মরগান।

'হ্যাঁ। একটা অনুরোধ করেছেন আমাকে তিনি। পুরানো কিছু ষোলো ইঞ্চি ন্যাভাল শেল দরকার তাঁর, খোঁজ নিতে বলেছেন। আমি ভাবলাম…'

'আমার কথা মনে পড়ার কারণ?'

ষোলো ইঞ্চি ন্যাভাল শেল তো আর আজকাল তেমন ব্যবহার করা হয় না,' বলল স্যাণ্ডেকার। 'যতদূর জানি, শুধু কোন কোন ব্যাটলশিপে এখনও হয়তো ব্যবহার করা হয়। আপনি ব্যাটলশিপ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন শুনে…'

'ষোলো ইঞ্চি ন্যাভাল শেল,' অন্যমনস্কভাবে বললেন মরগান। 'কি দরকার ওগুলো অ্যাডমিরালের?'

'বললেন, তাঁর বিজ্ঞানীরা প্যাসিফিক কোরাল ফরমেশনের ওপর ফেলবে।'

চিবানো বন্ধ করে স্যাণ্ডেকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মরগান। 'কি?'

'সিসমোলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। আর্মার-ভেদী শেল দু'হাজার ফুট উঁচু থেকে প্রবালের ওপর ফেলা হবে। প্রচণ্ড একটা কম্পন সৃষ্টি করাই বোধহয় উদ্দেশ্য—তার মানে ভূমিকম্প।'

'কিন্তু আমার তো ধারণা, এই উদ্দেশ্য গ্রাউণ্ড এক্সপ্লোসিভের সাহায্যেও পূরণ হতে পারে।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাণ্ডেকার। 'এসব বিষয়ে আমি তাঁকে কোন প্রশ্ন করিনি। সিসমোলজিস্ট তো আর নই!'

'সে যাই হোক,' বললেন মরগান, 'এই নির্দিষ্ট ধরনের ন্যাভাল শেল কোথায় পাওয়া যাবে বলে মনে করেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন?'

'তাঁর ধারণা, কিছু ষোলো ইঞ্চি শেল এ. এ. আর-এর কাছে থাকতে পারে।'

চায়ের কাপে চুমুক দিলেন মরগান, ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছলেন। 'কোন সারপ্লাস আর্মস ডিলারের কাছ থেকে কেনার চেষ্টা করলেই তো হয়, এ. এ. আর-এর সাথে যোগাযোগ করার দরকারটা কি?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে স্যাণ্ডেকার। 'একসময় কিছু ষোলো ইঞ্চি এক্সপেরিমেন্টাল টাইপ ন্যাভাল শেল তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু কখনও ব্যবহার করা হয়নি—ঠিক সেগুলোই দরকার অ্যাডমিরালের।'

'ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোরাল লাগছে আমার কাছে,' বললেন মরগান। 'এ. এ. আর-এর কাছে শেলগুলো যদি থাকেও, অ্যাডমিরাল সেগুলো হস্তগত করবেন কিভাবে?'

'হয়তো ভাল দাম দিয়ে কিনে নেবার চেষ্টা করবেন…ঠিক জানি না। সরকারের টাকা, খরচ করতে অসুবিধে কি!' কৌতুক করল স্যাণ্ডেকার।

হঠাৎ স্যাণ্ডেকারকে প্রায় চমকে দিয়ে মরগান বললেন, 'আচ্ছা, মাসুদ রানার সাথে অ্যাডমিরালের সম্পর্ক কি? ছেলেটা বলতে গেলে তাঁর অফিসেই আস্তানা গেড়েছে—ব্যাপারটা কি?'

রিস্টওয়াচ দেখল স্যাণ্ডেকার। 'মাসুদ রানা? তার সাথে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সম্পর্ক? কি জানি! বলতে পারব না। আমাকে এবার যেতে হয়, চীফ। শেলগুলোর ব্যাপারে যদি কোন সূত্র পান, আমাকে জানাবেন, প্লীজ। অ্যাডমিরাল আমার পুরানো বন্ধু, অনেক ব্যাপারে আমি তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর সাহায্যে লাগতে পারলে কিছুটা অন্তত ঋণমুক্ত হতে পারব।'

'ঠিক আছে,' বললেন মরগান, 'যোগাযোগ করব আমি।' স্যাণ্ডেকার চলে যাবার পর আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন তিনি, তারপর গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

দশ মিনিট পর নিজের অফিসে ফিরে এলেন মরগান। বারবারাকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার সেই কাজটা করতে পারো তুমি, বারবারা।'

'স্যার?' দু'চোখে রাজ্যের প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে পার্সোনাল সেক্রেটারি বারবারা।

'মাসুদ রানার কথা বলছি,' বললেন মরগান। 'আমার ফোন নাম্বারটা যাতে সে পায়, তার ব্যবস্থা করো।'

ওয়াশিংটন। সাতই ডিসেম্বর।

বিকেল চারটে। ক্যাপিটল ইন। প্রায় নির্জন রেস্তোরাঁ, দুটো মাত্র টেবিলে লোক রয়েছে। একটায় দুটো অল্প-বয়েসী ছেলে মেয়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে নিচু

গলায় কথা বলছে, আর কোনদিকে খেয়াল নেই তাদের। আরেকটায় একা বসে সিগারেট ফুঁকছে রানা। এই সময় একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন ভিতরে। ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা, মেদহীন সুঠাম শরীর, মাথায় মস্ত কার্নিসওয়ালা হ্যাট, কানের দু'পাশে কাঁচা-পাকা চুল। বয়স হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ তাকালে টের পাওয়া যায় না। হাঁটার ভঙ্গিটা দৃঢ়, চেহারায় অটল আত্মবিশ্বাসের ছাপ। সোজা এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালেন।

'আপনি মাসুদ রানা?' জানতে চাইলেন তিনি।

'আপনি ডেভিড মরগান?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন মরগান। 'হ্যাঁ।'

উঠে দাঁড়াল রানা, হাতটা বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে। তারপর সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। 'বসুন, মি. মরগান।'

ধীরে ধীরে বসলেন এন. এস. এ. চীফ। হাতের ব্যাগ খুলে চুরুটের প্যাকেট আর লাইটার বের করছেন, কিন্তু তাকিয়ে আছেন রানার দিকে।

'আপনার জন্যে কি আনাব বলুন,' জানতে চাইল রানা। 'হুইস্কি, নাকি ব্র্যাণ্ডি?'

'পরে,' মৃদু গলায় বললেন মরগান। 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে সত্যি খুব খুশি হয়েছি আমি, মি. রানা। আপনি জানেন আমি কে?'

'না।'

'তবু আমার সাথে দেখা করতে আপত্তি করেননি!'

'বলতে পারেন, কৌতূহলেরই জিত্ হয়েছে,' বলল রানা, হাসছে। 'এর আগে আমার গাড়ির উইণ্ডশিল্ডে কেউ কখনও কোন চিরকুট সেঁটে যায়নি। আপনি কে জানি না, কিন্তু ফোন নাম্বারটা এন. এ. এস. এ.-র তা জানি।'

আপনাকে অনুসরণ করা হচ্ছিল, নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছিলেন আপনি?' চুরুট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন মরগান।

'সময় নষ্ট করে লাভ নেই,' বলল রানা। 'আপনি বরং কাজের কথা পাড়ুন। ব্যাপারটা কি?'

'ব্যাপার?'

'আমার সম্পর্কে আপনার আগ্রহের কারণ।'

'ঠিক আছে, মি. রানা, কাজের কথা পাড়ছি আমি,' বললেন মরগান। 'নুমা বিশেষ এক ধরনের হেভী ন্যাভাল শেল খুঁজছে কেন? এর পিছনে উদ্দেশ্যটা কি?'

'গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে হত না?' জানতে চাইল রানা।

'না, ধন্যবাদ,' রানা সময় নষ্ট করছে বুঝতে পেরে চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মরগানের।

'প্রশ্নটা আমাকে করার কারণ?' জানতে চাইল রানা।

'কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে,' বললেন মরগান। 'তার আগে আমার সম্পূর্ণ পরিচয়টা জানা দরকার আপনার। আমি এন. এস. এ চীফ। জানতে পেরেছি নুমার সাথে কাজ করছেন আপনি, কিসের ভিত্তিতে তা জানি না। সম্ভবত ওই ন্যাভাল

শেলগুলো সম্পর্কে আপনার কোন আগ্রহ আছে। নাকি ভুল অনুমান করছি আমি?'

ডেভিড মরগান ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি এজেন্সীর চীফ, কথাটা শুনে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না রানার মধ্যে, অন্তত বাইরে থেকে তার চেহারা দেখে মনে হলো একটুও আশ্চর্য হয়নি সে।

'নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আমাকে স্নেহ করেন, আমি তাঁকে একটা ব্যাপারে সাহায্য করছি। আর কিছু জানার আছে আপনার, মি. মরগান?'

'আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পাইনি এখনও। হেভী ন্যাভাল শেল, কি দরকার ওগুলো অ্যাডমিরালের?'

'আপনি জানেন ওগুলো দরকার,' বলল রানা, 'তার মানে কেন দরকার তাও আপনার অজানা নেই।'

'প্রবাল নিয়ে সিসমোলজিক্যাল টেস্ট?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা।

দাঁত দিয়ে চুরুটটা কামড়ে ধরে মাথাটা একটু তুলে ভাল করে তাকালেন মরগান রানার দিকে। 'টেস্টের তারিখ?'

'আগামী বছর, মার্চের শেষ দুই হপ্তা।'

'আই সি,' একটা ভুরু কপালে তুলে বললেন মরগান। পরমুহূর্তে চেহারায় গাম্ভীর্য ফুটে উঠল। 'নুমার দু'জন সিসমোলজিস্টের সাথে আমি নিজে কথা বলেছি, মি. রানা। প্লেন থেকে ষোলো ইঞ্চি ন্যাভাল শেল ফেলা হবে শুনে হেসেই অস্থির তারা। সিসমোলজিক্যাল টেস্টের জন্যে ওই শেলের কোন প্রয়োজনই নেই। তারা আমাকে আরও জানিয়েছে, ও-ধরনের কোন প্রোগ্রামও নুমার হাতে নেই। তার মানে? নুমা কিছু লুকাচ্ছে। কি সেটা, মি. রানা?'

'আমি আবার জানতে চাইছি,' বলল রানা, 'এসব প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করার কারণ?'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন মরগান, তারপর মৃদু গলায় বললেন, 'কবীর চৌধুরীর সাথে এই শেলের কোন সম্পর্ক আছে কি, মি. রানা?'

স্তব্ধ হয়ে গেল রানা। 'কি জানেন আপনি কবীর চৌধুরী সম্পর্কে?' জেরা করার ভঙ্গিতে জানতে চাইল সে।

'বলব,' মৃদু হেসে বললেন মরগান। 'কিন্তু তার আগে আমার কৌতূহল মেটান আপনি।'

'কবীর চৌধুরীর সাথে এই শেলের সম্পর্ক আছে কিনা, আমি জানি না।'

'শেলগুলো কেন খুঁজছেন আপনারা?' জানতে চাইছেন মরগান।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। শেলগুলো উদ্ধার করার আশা নেই বললেই চলে। এ. এ. আর. সেগুলো কেনেনি, তাদের নাম করে অন্য কেউ কিনেছে। এই অন্য কেউ কে, তার পরিচয় কি, এসব প্রশ্নের উত্তর বের করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। কুইক-ডেথ ওয়রহেডগুলো কবীর চৌধুরীর হাতে যদি থাকে...বাকিটা ভাবতেও সাহস পাচ্ছে না ও। নুমার সাধ্যমত সমস্ত চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু শেলগুলোর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়, প্রফেশনালদের

সাহায্য চাওয়া দরকার।

'কি ভাবছেন, মি. রানা?' বললেন মরগান। 'আপনার এবং কবীর চৌধুরী সম্পর্কে সবই জানা আছে আমার। তাকে নিয়ে আপনি যদি কোন সমস্যায় পড়ে থাকেন, আমাকে জানাতে পারেন, আমি বোধহয় আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

'কবীর চৌধুরীর সাথে ওই শেলগুলোর একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, এ-কথা আপনার মনে হলো কেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন, মি. রানা?'

'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'না। কেন?'

হেসে ফেললেন মরগান। বললেন, 'আপনি শুধু তথ্য আদায় করে নিতে চাইছেন। আপনিও কিছু ছাড়ুন, আমিও কিছু ছাড়ি—সেটাই তো ন্যায্য হবে, নয় কি?'

সিগারেট ধরাল রানা। 'ধরুন,' বলল ও, 'আমি আপনাকে একমুঠো মহামারীর বীজ দিলাম, যেটা তিনশো বছর ধরে কোন বিরতি ছাড়াই যেখানে যত প্রাণী পাবে সবাইকে সেই মুহূর্তে মেরে ফেলবে। কি করবেন আপনি ওটা নিয়ে?'

রানা ঠিক কি বলতে চাইছে বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকলেন মরগান, কয়েক সেকেণ্ড পর মৃদু গলায় বললেন, 'তার মানে?'

'উত্তর দিন,' বলল রানা।

'মহামারীর বীজ…ওটা কি কোন মারণাস্ত্র?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা।

অস্বস্তির ছায়া পড়ল মরগানের চেহারায়। 'এ-ধরনের কোন অস্ত্রের কথা জানা নেই আমার। কেমিক্যাল আর বায়োলজিক্যাল অস্ত্র নিষিদ্ধ। জাতিসংঘের সমস্ত সদস্যের সমর্থন ছিল তাতে।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, প্লীজ।'

'সরকারের হাতে তুলে দেব, সম্ভবত।'

'সেটা উচিত কাজ হবে বলে মনে করেন আপনি?'

'গুড গড, ম্যান! কি চান আপনি? আপনার এই হেঁয়ালির মানে কি?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে মরগানের।

'এ-ধরনের অস্ত্র অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলতে হবে,' বলল রানা। 'জাপানে কি হয়েছিল শহর দুটোর, ভুলে গেছেন? এই অস্ত্র দিয়ে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। কোন সরকারকেও না।'

পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওরা।

'সত্যি কি এ-ধরনের মহামারী জাতীয় অস্ত্রের অস্তিত্ব আছে?' অবশেষে জানতে চাইলেন মরগান।

'আছে।'

তিক্ত একটু হাসি দেখা গেল মরগানের ঠোঁটে। 'মি. রানা, এবার আপনি আমার জন্যে খানিকটা নির্জলা হুইস্কির অর্ডার দিতে পারেন।'

ওয়েটার টেবিল সাজিয়ে দিয়ে চলে যাবার পর রানা বলল, 'এবার আপনি মুখ খুলুন মি. মরগান।'

'আপনি মহামারীর বীজের কথা বলছেন, সত্যি যদি তার কোন অস্তিত্ব থাকে...' কি ভেবে চুপ করে গেলেন মরগান, একটু বিরতি নিয়ে আবার বললেন, 'গলাটা ভিজিয়ে নিতে দিন, তারপর আমরা কিছু অশুভ খবর বিনিময় করব।'

'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ...ব্যাটলশিপ...কবীর চৌধুরী!' বিড় বিড় করে বলল রানা।

'আমার বিশ্বাস,' বললেন মরগান, 'কবীর চৌধুরীর অপারেশন ওয়াইল্ড রোজের সাথে কুইক-ডেথের সম্পর্ক আছে।'

'ধরে নেয়া গেল, ইউনিভার্সেল আর্মস কর্পোরেশন থেকে এ. এ. আর.-এর নামে সাঁইত্রিশটা শেল কিনেছে কবীর চৌধুরী, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে কুইক-ডেথ ভর্তি শেল আছে তা জানার কথা নয় তার। কুইক-ডেথের কথা বাইরের কেউ জানে না।'

'জানুক বা না জানুক তাতে বিপদের মাত্রা কমছে না,' বললেন মরগান। 'কোন বড় শহরের ওপর শেলগুলো ফেলাই মনে হচ্ছে কবীর চৌধুরীর উদ্দেশ্য। দশ বিলিয়ন ডলারের চেক আটকে দেয়া আর ল্যাবরেটরি পুড়িয়ে দেবার প্রতিশোধ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সে এক হাত দেখিয়ে দিতে চাইছে। শেলগুলো ছুঁড়তে শুরু করলে তাকে থামানো অসম্ভব, কুইক-ডেথ ভর্তি শেলের একটাই যে প্রথমে ছুঁড়বে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি?' ঘন ঘন টান দিচ্ছেন তিনি চুরুটে, কিন্তু ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, অবশ্য সেদিকে কোন খেয়ালই নেই তাঁর। 'যা করার এখুনি করতে হবে, মি. রানা। গড নোজ, আরও কত শেল যোগাড় করেছে সে।'

'ব্যাটলশিপ সম্পর্কে আপনার রিপোর্ট কি বলে?' জানতে চাইল রানা।

'বেশিরভাগই বিভিন্ন সরকারী সংস্থার হাতে রয়েছে, কবীর চৌধুরী নাগাল পাবে না,' বললেন মরগান। 'আর বাতিল হয়ে গেছে যেগুলো সেগুলো লোহা-লক্কড়ের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। তারা ওগুলো ভেঙে মন দরে লোহা হিসেবে বেচবে।'

'আপনি শিওর?'

'আমি শিওর,' জোর দিয়ে বললেন মরগান।

'আরেকটা ব্যাপার,' চিন্তিতভাবে বলল রানা। 'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ—এত থাকতে অপারেশনের নাম হিসেবে এটাকেই বা বেছে নিল কেন কবীর চৌধুরী? নামটার সাথে কিসের যেন একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু মনে করতে পারছি না।'

'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ...ওয়াইল্ড রোজ...' আপন মনে বিড় বিড় করছেন মরগান।

'মনে পড়েছে!' বলল রানা। 'কিন্তু এর কোন তাৎপর্য আছে কিনা বোঝা মুশকিল। আইওয়া রাজ্যের প্রতীক—ওয়াইল্ড রোজ।'

ঝট্ করে হাত বাড়ালেন মরগান। রানার কব্জি চেপে ধরে নাড়া দিলেন।

'মাই গড! ঠিকই তো! এর তাৎপর্য কি বুঝতে পারছেন? আইওয়া নামে একটা ব্যাটলশিপ আছে…' হঠাৎ সমস্ত উত্তেজনা অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর চেহারা থেকে। রানার হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করলেন তিনি। 'কিন্তু…না, ব্যাটলশিপ আইওয়ার সাথে অপারেশন ওয়াইল্ড রোজের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, আইওয়াকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীরা…'

'কিন্তু ভাঙার জন্যে বিক্রি করা আর ভেঙে ফেলা, দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, মি. মরগান,' বলল রানা।

হতভম্ব দেখাচ্ছে এন. এস. এ. চীফকে।

'মেরীল্যাণ্ডের তীর ঘেঁষা পশ্চিম চেসাপীকের সমস্ত শিপইয়ার্ডে খবর নেয়া উচিত, শান্ত গলায় বলল রানা।

'ফোন, ফোন!' প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মরগান। ছুটলেন। তার পিছু পিছু রেস্তোরাঁর ফোন বুথে এসে ঢুকল রানা।

দ্রুত ডায়াল করছেন মরগান। অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাবার অপেক্ষায় আছেন, এই ফাঁকে রানার দিকে ফিরে বললেন, 'আমি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি এখানে। আপনি?'

'নুমার একটা গাড়িতে।'

'ব্যবহার করতে পারব তো?'

'অবশ্যই,' বুথ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তেল-পানি ঠিক মত আছে কিনা দেখে নিই তাহলে।'

দু'মিনিট পর রেস্তোরাঁ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে রানার পাশে উঠে বসলেন মরগান। 'আপনার অনুমানই ঠিক। গতকাল পর্যন্ত ব্যাটলশিপ আইওয়া ফর্বস মেরিন স্ক্র্যাপ অ্যাণ্ড সালভেজ ইয়ার্ডে ছিল, মেরীল্যাণ্ডে।'

'জায়গাটা চেনা আছে আমার,' বলল রানা। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ও। 'পাটুকজেন্ট নদী যেখানে বে-তে মিলেছে তার কয়েক মাইল এদিকে।'

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ির উইণ্ডশীল্ড ওয়াইপারের দিকে সম্মোহিতের মত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডেভিড মরগান। তাকিয়ে আছেন, কিন্তু কিছুই যেন দেখছেন না। তাঁর পাশে বসে একমনে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। একসময় স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে এল মরগানের চোখে, রাস্তার দিকে তাকালেন তিনি।

'সামনে বোধহয় লেক্সিনটন পার্ক?' জানতে চাইলেন।

'আর চার মাইল,' রাস্তার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল রানা।

'শহরে ঢোকার মুখেই একটা অল-নাইট গ্যাস স্টেশন আছে, পে ফোনের সামনে থামবেন একবার।'

কয়েক মিনিট পর হেডলাইটের আলোয় লেক্সিনটন পার্ক সিটি-লিমিট সাইন দেখা গেল রাস্তার পাশে, আরও মাইল খানেক এগোবার পর তীক্ষ্ণ একটা বাঁক, বাঁক ঘুরতেই উজ্জ্বল আলোকমালায় সাজানো সার্ভিস স্টেশনটা দেখতে পেল রানা। ফোন বুথের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ও। দরজা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মরগান, কিন্তু গা বাঁচাতে পারলেন না, বুথের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন

ভিজে সপসপে হয়ে। কাঁচ ঘেরা অফিসে বসে একটা পত্রিকা পড়ছে অ্যাটেনড্যান্ট, ছিনতাইকারী নয় বুঝতে পেরে ওদের সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলল।

দু'মিনিট পর গাড়িতে ফিরে এলেন মরগান। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

'নতুন কিছু জানা গেল?'

মাথা দোলালেন মরগান। 'একটা খবর যোগাড় করেছে আমার লোকেরা, কিন্তু সুখবর নয়।'

একটু গম্ভীর হলো রানার চেহারা। 'দুর্যোগ আর দুঃসংবাদ হাত ধরাধরি করে আসে।'

'ব্যাটলশিপ আইওয়াকে নিলামে বিক্রি করে দিয়েছে নেভী,' বললেন মরগান। 'ওয়ালভিস বে ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন কিনেছে ওটা।'

'নামটা আগে শুনিনি,' বলল রানা। 'কাদের করপোরেশন?'

'আফ্রিকান আর্মি অব রেভোলিউশনের আর্থিক দিকটা দেখাশোনা করে ওরা,' মৃদু গলায় বললেন মরগান। 'তার মানে, নিজের পরিচয় গোপন করার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি কবীর চৌধুরী।'

'ওই সামনে দেখা যাচ্ছে ফর্বস শিপইয়ার্ড,' বলল রানা।

কাঁটাতারের উঁচু বেড়া রাস্তার সাথে সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে, মেইন গেটের সামনে ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। গেটের বাইরে একটা গার্ডরুম, মাথায় ফ্লাড লাইট। গেটটা খোলা, কিন্তু মুখে একটা চেইন বাধা হয়ে রয়েছে। উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে রানা, কিন্তু ঝমঝম বৃষ্টি আর অন্ধকারে বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। বর্ষণের অঝোর ধারায় ঢাকা পড়ে গেছে জাহাজ, এমন কি আকাশ ছোঁয়া ডেরিকগুলোকেও দেখতে পাচ্ছে না ও।

গাড়ির দরজার পাশে, রানার দিকে, একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল। 'আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারি?'

পকেটে হাত ভরলেন মরগান, আই-ডি কার্ড বের করে ভাঁজ খুললেন সেটার, তারপর রানার দিকে কাত হয়ে জানালার কাঁচের সাথে সেঁটে ধরলেন সেটা। 'শিপইয়ার্ডে আইওয়া আছে কিনা জানতে এসেছি,' বললেন তিনি।

'নিশ্চয়ই আছে, স্যার,' সবিনয়ে বলল গার্ড। 'গত ছ'মাস থেকে ডক ছেড়ে যায়নি কোথাও। রিফিটিঙের কাজ চলছে এখন।'

মরগান আর রানা দৃষ্টি বিনিময় করল।

'আমরা নিজেরা দেখব,' বৃষ্টির মধ্যে মাথা বের করে গার্ডকে বলল রানা।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল গার্ড। 'মাফ করবেন, স্যার,' বলল সে। 'কোম্পানীর অফিস থেকে পাস না আনলে আমি কাউকে ঢুকতে দিতে পারি না। সকালে আমাদের অফিসের লোক আসবে, তার সাথে কথা বলে দেখতে পারেন। তিনি যদি অনুমতি দেন, আপনারা ভেতরে ঢুকে দেখতে পারবেন জাহাজ।'

কড়া ধমক লাগাতে যাচ্ছিলেন মরগান, এই সময় গাড়ির পাশে আরেকটা গাড়ি এসে থামল। জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়ে এক লোক জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, ও'হারা?'

গার্ড ও'হারা উত্তর দেবার আগেই ঝট করে গাড়ির দরজা খুলে নিচে নেমে পড়লেন মরগান, বৃষ্টি ঝমঝম শব্দকে ছাপিয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর, 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর ডিরেক্টর আমি, ডেভিড মরগান।' কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল বাঁকা করে গাড়িতে বসা রানার দিকে ইঙ্গিত করলেন, 'উনি আমার বন্ধু, মাসুদ রানা, একটা ইউভেস্টিগেটিং ফার্মের ডিরেক্টর। অত্যন্ত জরুরী একটা ব্যাপারে ব্যাটলশিপ আইওয়াকে দেখতে এসেছি আমরা।'

পাশে বসা একটা মেয়েকে কি যেন বলল আগন্তুক, তারপর দ্রুত নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। মরগানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই রাত তিনটের সময়?' মরগানের হাত থেকে আই-ডি কার্ডটা নিয়ে ফ্লাড লাইটের নিচে গিয়ে দাঁড়াল সে। কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মরগানকে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ও'হারা, চেইন তুলে নাও।' মরগানের দিকে তাকাল আবার। 'গাইড না করলে ডকে পৌঁছুতে অসুবিধে হবে আপনাদের, আমিও যাচ্ছি আপনাদের সাথে। আমার পরিচয়···শিপইয়ার্ডের সুপারিনটেনডেন্ট, ডেল জারভিস।' নিজের গাড়ির কাছে ফিরে গেল সে। প্যাসেঞ্জার সীটে বসা মেয়েটাকে নিচু গলায় কি যেন বলল, তারপর ফিরে এল আবার। ইতিমধ্যে রানার পাশে উঠে বসেছেন মরগান, রুমাল দিয়ে ভিজে চোখ আর নাক মুছছেন। গাড়ির ব্যাকসীটে উঠে বসল জারভিস। রানার কাঁধের কাছ থেকে বলল, 'আজ আমাদের বিয়ে-বার্ষিকী, উৎসব থেকে বাড়ি ফেরার পথে শিপইয়ার্ড হয়ে যাবার কারণ কিছু ব্লু-প্রিন্ট সাথে করে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম।'

চেইনটা সরিয়ে দিল ও'হারা। রানা গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে দেখে হাত দেখিয়ে থামতে ইশারা করল ওকে, তারপর জানালার সামনে ঝুঁকে পড়ে তাকাল সুপারিনটেনডেন্টের দিকে। 'স্যার, বাস ড্রাইভারের সাথে দেখা হলে তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এত দেরি করছে কেন সে?'

'বাস ড্রাইভার?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ডেল জারভিস।

'সন্ধে সাতটার দিকে প্রায় সত্তর জন কালা আদমী নিয়ে ঢুকেছে বাসটা,' বলল ও'হারা। 'বাস থেকে নেমে আইওয়ার দিকেই তো গেল ওরা।'

'তুমি ওদেরকে ঢুকতে দিলে?' বিস্ময় আর অবিশ্বাসের সাথে জানতে চাইল ডেল জারভিস।

'ওদের সবার কাছে পাস ছিল, স্যার,' বলল ও'হারা। 'বাসের পিছু পিছু একটা ট্রাকও ঢুকেছে, তার ড্রাইভারের কাছেও পাস আছে।'

'ক্যাপ্টেন ফক্স!' রাগে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে জারভিসের। 'লোকটা দেখছি পাগলামির সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। 'ক্যাপ্টেন ফক্স? কে তিনি?'

'এ. এ. আর. এর তরফ থেকে ক্যাপ্টেন ফক্সই তো আইওয়ার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। স্রেফ একটা উন্মাদ বলতে পারেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে জারভিসের দিকে তাকালেন মরগান। 'কি রকম?'

'শুনলে হাসবেন, বিশ্বাস করতে চাইবেন না,' বলল সুপারিনটেনডেন্ট।

'ক্যাপ্টেন ফক্স আমার ক্রুদেরকে দিয়ে আইওয়ার অর্ধেক সুপারস্ট্রাকচার ভেঙে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় কাঠের নকল জিনিস বসিয়েছে। শুধু সুপারস্ট্রাকচার নয়, জাহাজটার বাল্কহেড থেকে শুরু করে যা কিছু তার কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে সবই ভেঙে ফেলে দিয়েছে সে।'

'সে কি! কারণ?'

'আইওয়ার ওয়াটার লাইন নামাতে চায়,' বলল জারভিস। 'তার ধারণা, ওজন কমাতে পারলেই তা সম্ভব।'

'কিন্তু আমি যতটুকু জানি,' বললেন মরগান, 'কর্কের মত পানিতে ভাসাবার জন্যে তৈরি করা হয়নি এ-ধরনের ব্যাটলশিপ। ভাসমানতা আর ভারসাম্য যদি কমবেশি করা হয়, ঝড়ের মুখে টিকতে পারবে না, ডুবে যাবে।'

'এই নিয়ে তার সাথে আমি দিনের পর দিন তর্ক করেছি,' বলল জারভিস। 'কোন লাভ হয়নি। ভয়ঙ্কর জেদী লোক, কারও কথা শুনতে চায় না। শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, নিখুঁত ইলেকট্রিক টারবাইন ইঞ্জিন দুটোকেও ফেলে দিতে চেয়েছিল সে। বলে কিনা, ইঞ্জিন দুটোকে সরিয়ে সীল করে দিন ওগুলোর শ্যাফট।' থামল সে, টোকা দিল রানার কাঁধে। 'স্টীল প্লেটিঙের ওই স্তূপটা পেরিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নেবেন, তারপর আবার ডেরিকের রেইল ট্র্যাকের কাছে ডান দিকে।'

বৃষ্টির অঝোর ধারা বরফের তৈরি চাদরের মত লাগছে, গাড়ির ভেতর ভিজে শরীর নিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছেন মরগান। কাঁপা হাতে একটা চুরুট ধরিয়ে কষে টান দিলেন তিনি। হেডলাইটের আলোয় প্রকাণ্ড আকারের দুটো বাক্সের মত আকৃতি ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে দেখছে রানা। 'ওই যে দেখা যাচ্ছে বাস আর ট্রাক,' বলল ও। আরও খানিক এগিয়ে ট্রাকের পাশে দাঁড় করাল গাড়ি।

'ড্রাইভাররা নেই কেন?'

গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা টর্চ বের করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা। ওকে অনুসরণ করে মরগানও নামলেন। জারভিস নামল পিছনের দরজা দিয়ে, কাউকে কিছু না বলে দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ট্রাকের পিছন আর বাসের জানালা দিয়ে টর্চের আলো ফেলে ভেতরে তাকাল রানা। দুটোই খালি।

খালি গাড়ি দুটোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রানা, ভিজে চুরুট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করছেন মরগান। খানিক দূর এগিয়ে এসে রানা দেখল, পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জারভিস। হাত দুটো মুঠো পাকানো, শরীরের দু'পাশে টান টান হয়ে ঝুলছে। ভিজে সপসপ করছে গায়ের জ্যাকেটটা, মাথার খুলি কামড়ে সেঁটে বসে আছে চুলগুলো কংক্রিটের মত, পানি থেকে উঠে আসা ভূতের মত চেহারা হয়েছে লোকটার।

'কোথায় আইওয়া?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইলেন মরগান।

হাত তুলে সামনের অন্ধকার দেখাল ওদেরকে জারভিস। বিড় বিড় করে বলল, 'নেই!'

'নেই মানে!'

'পাগলা লোকটা···ক্যাপ্টেন ফক্স···জাহাজ নিয়ে চলে গেছে!'

'ওহ্ গড! আপনি শিওর?' জারভিসের দিকে এক পা এগোলেন মরগান।

'একটা ব্যাটলশিপ দেখতে পাব না, অতটা অন্ধ নই আমি, মি. মরগান,' গম্ভীর গলায় বলল জারভিস। 'ভাঙাচোরার সময় ঠিক এইখানে নোঙর করা ছিল।' হঠাৎ কি যেন দেখতে পেয়ে এক ছুটে ডকের কিনারায় দাঁড়াল সে। 'কি সর্বনাশ, কাণ্ড দেখুন! ডক বোলার্ডের সাথে নোঙরের লাইন এখনও বাঁধা রয়েছে! মাই গড! লাইনগুলো জাহাজ থেকে ফেলে দিয়েছে ওরা! এর মানে কি? আইওয়া কি নোঙর ফেলবে না কখনও?'

ঝুঁকে পড়ে তাকালেন মরগান। ভারী লাইনগুলো কালো পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

'এখানে আর দেখার কিছু নেই,' তাঁর পিছন থেকে বলল রানা। 'ফিরে চলুন, মি. মরগান।'

গাড়ি নিয়ে শিপইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল রানা।

'কি হবে এখন, মি. রানা?' শুকনো একটা চুরুট ধরিয়ে জানতে চাইলেন মরগান।

'কবীর চৌধুরী হামলা করবে, সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু যদি জানা যেত কবে, কখন, কোথায়···'

'নির্দিষ্ট কোন তারিখ আছে বলে মনে করেন?'

হঠাৎ প্রায় চমকে উঠল রানা। ঝট্ করে তাকাল মরগানের দিকে। 'আজ ক'তারিখ? সাত?'

'হ্যাঁ। সাতই ডিসেম্বর। কেন?'

ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলল রানা।

'কি হলো?' প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে আঁতকে উঠলেন মরগান।

'ডিসেম্বরের সাত···আজকের দিনেই পার্ল হারবারে বোমা ফেলা হয়েছিল!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা। 'আমেরিকাকে আক্রমণ করার জন্যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটা দিন বেছে নিয়েছে কবীর চৌধুরী।'

ফিশিং ট্রলার মলি বেণ্ডার।

ব্যারোমিটারটা দেখে নিয়ে চার্ট টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল স্কিপার কার্ল সুইড, ধূমায়িত কফির কাপটা তুলে নিয়ে ছোট্ট একটা চুমুক দিল। কল্পনায় নদীর সামনেটা দেখতে চেষ্টা করছে সে, তাকিয়ে আছে ডেকে জমে ওঠা তুষারের দিকে। তার এই সত্তর বছর বয়সে দুর্যোগের রাত কম দেখেনি সে, কিন্তু আজকের রাতটা কেমন যেন একটা খুঁতখুঁতে ভাব এনে দিয়েছে তার মনে। কেন যেন আজ তার বড় বেশি করে মনে পড়ে যাচ্ছে স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কথা। আরও দশ বছর আগে অবসর নেয়া উচিত ছিল তার, কিন্তু স্ত্রী মারা যাবার পর ছেলেমেয়েরাও দুনিয়ার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, বাড়িতে একা বসে সময় কাটে না তার, তাই ছাড়ি ছাড়ি করেও চাকরিটা ছাড়তে পারেনি সে। পারবেও না। মনে মনে জানা

আছে তার, এই পানিতে ভাসতে ভাসতেই হঠাৎ একদিন টুপ করে মরে যাবে সে।

'অন্তত সিকি মাইল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে,' বিড় বিড় করে বলল সে।

'আরও খারাপ হতে পারে আবহাওয়া,' হেলমের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সহকারী অসকার, স্কিপারের উদ্বেগ লক্ষ্য করে নিঃশব্দে হাসছে সে। মাত্র আটাশ বছর বয়স, বুক ভরা দুর্জয় সাহস।

লেদার জ্যাকেটের বোতাম লাগাচ্ছে স্কিপার। 'হেলমের দিকে নজর রাখো, আর সাবধান, র‍্যাগড পয়েন্ট চ্যানেল বয়ার কাছ থেকে দূরে সরে থেকো।'

'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, স্কিপার। ব্লাডহাউণ্ডের মত চ্যানেল মার্কারের গন্ধ পাই আমি।'

রূঢ় শোনাল স্কিপারের গলা, 'নাক নয়, আমি চাই তুমি তোমার চোখ ব্যবহার করো।'

র‍্যাগড পয়েন্ট পেরিয়ে এসে ভাটির দিকে নিজস্ব কোর্সে ছুটে চলেছে মলি বেগুর। আলোকিত চ্যানেল বয়াগুলো একের পর এক চলে যাচ্ছে পাশ ঘেঁষে। বর্ষণের অঝোর ধারার ভেতর দিয়ে বহু দূরের আলো ঝাপসা দেখাচ্ছে।

'উজান ঠেলে কে যেন আসছে,' ঘোষণার সুরে বলল অসকার।

বিনোকিউলার তুলে নিয়ে বো-র পিছন দিকে তাকাল স্কিপার কার্ল সুইড। 'লিডশিপে তিনটে সাদা আলো দেখতে পাচ্ছি। তার মানে পিছনে টো নিয়ে একটা টাগ। ঝাঁপসা অন্ধকারে ওটার কাঠামো দেখা যাচ্ছে না। তবে, অস্বাভাবিক লম্বা টো মনে হচ্ছে। টাগের পিছনে, একই লাইনে প্রায় তিনশো গজ দূরে দুটো থারটি-টু-পয়েন্ট সাদা আলো দেখা যাচ্ছে। পিছনের সর্বশেষ টো বোধহয় ওটাই।'

'কিন্তু মুখোমুখি সংঘর্ষের কোর্সে এগোচ্ছি আমরা, স্কিপার,' একই সরল রেখায় রয়েছে ওটার মাস্ট লাইট আর আমাদের বো।'

'নদীর এটা আমাদের দিক, ও শালারা কি করছে এদিকে?' রাগে গজগজ করে উঠল বুড়ো সুইড। 'স্কিপার ব্যাটা জানে না দুটো জাহাজ পরস্পরের দিকে যখন এগোবে, প্রত্যেকের স্টারবোর্ড সাইড তীরের দিকে রাখতে হবে?'

'ওদের চেয়ে অনেক দ্রুত দিক বদলাতে পারব আমরা,' বলল অসকার। 'ওদেরকে বরং আমরা সতর্ক করে দিই, আর যে-যার স্টার বোর্ড সাইড দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাই।'

'ঠিক আছে, অসকার। দু'বার হুইসেল বাজিয়ে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দাও ওদেরকে।'

কিন্তু উত্তরে পাল্টা কোন হুইসেলের আওয়াজ পেল না ওরা। হঠাৎ উপলব্ধি করল কার্ল সুইড, অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে টাগের আলো। টাগ? সন্দেহের প্রথম দোলা লাগল তার মনে। পিছনে টো নিয়ে কোন টাগ এই রকম তীর বেগে আসতে পারে? 'কোর্স বদলাও! পোর্টের দিকে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে।

সাথে সাথে নির্দেশ পালন করল অসকার। পরমুহূর্তে হতভম্ব হয়ে গেল স্কিপার কার্ল সুইড। ট্রলারের কোর্সের সাথে রহস্যময় টাগটাও তার কোর্স বদলেছে। সোজা ছুটে আসছে মলি বেগুরের দিকে। পথরোধ করাই যেন উদ্দেশ্য।

'হুইসেল বাজাও। বেজন্মাটাকে হুইসেল বাজিয়ে সতর্ক করে দাও!' থরথর করে কাঁপছে স্কিপার।

চারবার সংক্ষিপ্ত আওয়াজ—মানে, ইনল্যাণ্ড ওয়াটারওয়ে ডেঞ্জার সিগন্যাল। উল্টো দিক থেকে আসছে এমন কোন জলযানের উদ্দেশ্য বা কোর্স বোঝা না গেলে বাজানো হয়। হুইসেলের তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে দু'জন ক্রুর, চোখ কচলাতে কচলাতে হুইল হাউসে ঢুকল তারা, ঢুকেই দেখল আশ্চর্য একটা আলো দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ভয়ে আর বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল তারা।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময় পেল স্কিপার কার্ল সুইড। ছোঁ মেরে বুলহর্নটা তুলে নিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! পোর্টের দিকে ঘোরো, খোদার দোহাই…!'

সচল একটা পাহাড় অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে যেন, নিঃশব্দে। কেউ কোন উত্তর দিল না। হিম-শীতল অন্ধকার থেকে কোন পাল্টা হুইসেল বেজে উঠল না। অসহায় মলি বেণ্ডারের ওপর হিংস্রদৃষ্টিতে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে শুধু দ্রুতগতির আলোগুলো।

সংঘর্ষ অবধারিত বুঝতে পেরে জানালার নিচের ফ্রেমটা দু'হাত দিয়ে আলিঙ্গন করে ধরল স্কিপার কার্ল সুইড। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ল সহকারী অসকার, উন্মত্ত ব্যস্ততার সাথে উল্টোদিকে চালাল এঞ্জিনগুলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল অসকারের হাত দুটো। হুইল হাউসের মাথার অনেক ওপর পর্যন্ত কি যেন দেখতে পাচ্ছে সে। রঙটা কালো। তারপর চিনতে পারল অসকার। একটা প্রকাণ্ড জাহাজের বো। দেখল, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারল না। পরমুহূর্তে ছোট্ট ট্রলারটাকে ধাক্কা দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল আইওয়া। ঠাণ্ডা বরফ পানির নিচে তলিয়ে গেল সব।

হোয়াইট হাউসের গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছেন ডেভিড মরগান, হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন রানার দিকে। 'সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা,' আন্তরিকতার সাথে বললেন তিনি।

'কি করবেন এখন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'যতই বকাঝকা খেতে হোক,' বললেন মরগান, 'প্রেসিডেন্ট আর চীফস অব স্টাফকে ঘুম থেকে তুলব এখন আমি।' ক্লান্ত হাসি দেখা গেল তাঁর মুখে। 'এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব ওঁদের হাতেই থাকা উচিত।'

'আমি কোন সাহায্যে লাগতে পারি?'

'না। আপনি আপনার কর্তব্যের চেয়ে বেশি করেছেন। এখন থেকে যা করার ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট করবে।'

'কুইক-ডেথ ওয়রহেড,' বলল রানা। 'ওগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হলে ধ্বংস করা হবে বলে কথা দিতে পারেন আপনি?'

'কথা দিচ্ছি চেষ্টা করব, কিন্তু সাফল্যের গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'উত্তরটা পছন্দ হলো না আমার।'

তর্ক করার মত উৎসাহ বোধ করছেন না মরগান, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে তাঁর শরীর। 'দুঃখিত, মি. রানা। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়া আমার স্বভাব নয়।' গাড়ি থেকে নেমে গেলেন তিনি। গার্ডকে পাস দেখিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন হোয়াইট হাইসের ভেতর।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ভারমন্ট এভিনিউয়ের দিকে যাচ্ছে রানা। দু'মাইল এগিয়ে একটা অল-নাইট কফি-শপ দেখতে পেয়ে দাঁড় করাল গাড়ি।

ভেতরে ঢুকে কফির অর্ডার দিল রানা। তারপর ফোনের বুথে ঢুকে দু'জায়গায় ফোন করল। তারপর কফিটুকু গলায় ঢেলে দ্রুত বিদায় নিল।

পাঁচ

বেথেসডা ন্যাভাল হাসপাতাল।

ওয়েটিংরুমে রানার জন্যে অপেক্ষা করছে হিলি। আকাশী রঙের একটা স্কার্ফ তার সোনালী চুলের অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছে। চোখের নিচে কালি পড়লেও, চেহারায় তারুণ্যের একটা তরতাজা ভাব ফুটে রয়েছে। রানাকে দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'কেমন আছেন অ্যাডমিরাল?' ভেতরে ঢুকেই জানতে চাইল রানা।

ক্লান্ত চোখ দুটো রানার মুখের ওপর কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকল। তারপর বলল হিলি, 'এখনও যুঝছেন। পরাজয় কাকে বলে জানেন না, এবারও সুস্থ হয়ে উঠবেন বাবা।'

ওয়েটিংরুমে ঢোকার আগে বড় ডাক্তারের সাথে কথা বলে এসেছে রানা, তাই হিলির একটা কথাও বিশ্বাস কবল না ও। লক্ষ্য করল হিলির চোখেও হতাশার ছায়া, কথাগুলো সে নিজেও হয়তো বিশ্বাস করে না। হালকাভাবে ওর কোমরে একটা হাত রেখে ওয়েটিংরুমে থেকে করিডরে বের করে আনল তাকে রানা। 'অ্যাডমিরাল কথা বলতে পারবেন আমার সাথে?'

মাথা ঝাঁকাল হিলি। 'আপনার মেসেজ পাবার পর ডাক্তারদের কথা কানে তুলছেন না বাবা, আপনার সাথে কথা বলবেনই।'

'অত্যন্ত জরুরী না হলে এই অবস্থায় তাঁকে আমি বিরক্ত করতাম না,' মৃদু গলায় বলল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে রানার চোখের দিকে তাকাল হিলি। 'তা আমি বুঝতে পারছি।'

কেবিনের সামনে দাঁড়াল ওরা। দরজা খুলল হিলি। নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলল রানাকে।

সেক্সটন জিরো-ফাইভ কলোরাডোর টেবল লেক থেকে তোলার সময় শেষবার দেখেছিল রানা অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কটকে। মাত্র কয়েক দিন আগের কথা, কিন্তু এরই মধ্যে আরও যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে

অ্যাডমিরালের। শুকিয়ে গেছে মুখটা, পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। বালিশের ভেতর ডুবে রয়েছে প্রকাণ্ড মাথাটা। নাকের ভেতর অক্সিজেনের পাইপ, হাতের শিরায় টিউব, চাদরের নিচে থেকেও একাধিক পাইপ বেরিয়ে এসেছে। একসময় শরীরটা পেশীবহুল ছিল, এখন সেটা নরম কাদার মত তুলতুলে। এগিয়ে এসে রানার কাঁধে একটা হাত রাখল একজন ডাক্তার।

'অ্যাডমিরাল কথা বলতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

মাথাটা সামান্য একটু ঘোরালেন অ্যাডমিরাল স্কট, একটা দুর্বল হাত তুলে রানার উদ্দেশে নাড়লেন। 'কাছে আসুন···মি. রানা,' বিড় বিড় করে বললেন তিনি।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার। 'কাছে পিঠেই আছি আমি, দরকার হলে ডাকবেন,' কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়াল সে। ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসল রানা। তারপর ঝুঁকে পড়ল অ্যাডমিরাল স্কটের কানের দিকে। 'কুইক-ডেথ প্রজেক্টাইল,' বলল রানা। 'আকাশে ওঠার পর কিভাবে সেটা অপারেট করে?'

'সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স···রাইফ্লিঙ।'

'বুঝেছি,' নিচু গলায় বলল রানা। 'গান বোরের ভেতর স্পাইরাল রাইফ্লিঙের ফলে শেলটা ঘুরতে শুরু করে, সেই সাথে একটা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স সেট হয়ে যায়···'

'জেনারেটর চালু হয়···ফলে ছোট একটা রাডার অলটিমিটার স্টার্ট নেয়···

'আপনি নিশ্চয়ই একটা ব্যারোমেট্রিক অলটিমিটারের কথা বলতে চাইছেন?'

'না···ব্যারোমেট্রিকে কাজ হবে না,' ফিসফিস করছেন অ্যাডমিরাল স্কট। 'হেভী ন্যাভাল শেলের রয়েছে হাই ভেলোসিটি আর ফ্ল্যাট ট্রাজেকটরি···নিখুঁত ব্যারোমেট্রিক রিডিঙের জন্যে বড় বেশি নিচু···মানে, মাস্ট ইউজ রাডার টু বাউন্স সিগন্যাল ফ্রম গ্রাউণ্ড।'

'কিন্তু কামান যখন দাগা হবে,' বলল রানা, 'একটা রাডার অলটিমিটার হাই গ্রাউণ্ড ফোর্স সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

অনেক কষ্টে ক্ষীণ একটু হাসলেন অ্যাডমিরাল স্কট। 'প্যাকেজের ডিজাইন নিজের হাতে তৈরি করেছি আমি। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করুন···পাউডার চার্জ ডিটোনেট হবার সবটুকু ধকল সহ্য করতে পারবে ইন্সট্রুমেন্টগুলো।'

প্রচণ্ড ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন অ্যাডমিরাল। এই সময় নিঃশব্দে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল হিলি। রানার কাঁধে একটা হাত রাখল সে। ফিসফিস করে বলল, 'আপনার কথা শেষ হয়েছে?'

'না।'

'আপনি না হয় পরে আর একবার···বিকেলের দিকে আসুন।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা, 'অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে।'

রেগে গেল হিলি। চাপা গলায় বলল, 'বাবাকে আপনি মেরে ফেলতে চান?' দু'চোখ বেয়ে পানি নেমে আসছে।

উত্তর দিল না রানা। কিন্তু যেমন ঝুঁকে ছিল তেমনি রইল, সিধে হয়ে দাঁড়াবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ওর মধ্যে। 'প্লীজ, মি. রানা, দোহাই আপনার...'

হিলি কি বলছে, শুনতেই পাচ্ছে না রানা। অ্যাডমিরাল স্কট ওর একটা হাত ধরেছেন। ধীরে ধীরে চোখ মেলছেন তিনি। 'একটু সামলে নিচ্ছি...যাবেন না, এটা আমার অর্ডার।'

রানার চেহারায় ব্যথা আর সহানুভূতির ছাপ দেখে পিছিয়ে গেল হিলি।

'এরপর কি ঘটবে?' নিচু গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'শেলটা তার ক্ষমতার শীর্ষে ওঠার পর নামতে শুরু করবে মাটির দিকে, অলটিমিটারের ওমনিডিরেকশন্যাল ইণ্ডিকেটর পতনের গতি আর মাত্রা দেখিয়ে সিগন্যাল দিতে শুরু করবে...'

ক্রমশ নিস্তেজ হতে হতে মিলিয়ে গেল অ্যাডমিরালের গলার আওয়াজ। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে রানা।

'মাটি থেকে পনেরোশো ফুট ওপরে থাকতে একটা প্যারাস্যুট খুলে যাবে, ফলে মন্থর হয়ে পড়বে শেল পতনের গতি, সেই সাথে চালু হবে ছোট একটা এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস।'

'পনেরোশো ফুট, প্যারাস্যুট খুলবে,' পুনরাবৃত্তি করল রানা।

'একহাজার ফুটের মাথায় এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ডিটোনেট করবে... প্রজেক্টাইলের মাথা ভেঙে বেরিয়ে আসবে একগাদা খুদে বোমা, কুইক-ডেথ ভর্তি...'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। প্রজেক্টাইল অপারেশনের বর্ণনাটা মনে গেঁথে নেবার চেষ্টা করছে। অ্যাডমিরালের ঢুলঢুলু চোখের দিকে তাকাল আবার।

'সময়ের হিসেবটা, অ্যাডমিরাল? প্যারাস্যুট ইজেকশন আর কুইক-ডেথ ভর্তি বোমা বেরিয়ে আসার মাঝখানে সময়ের ব্যবধান কত...?'

'অনেক দিন আগের কথা, মনে নেই...'

'চেষ্টা করুন, প্লীজ,' চাপা গলায় আবেদন জানাল রানা।

তলিয়ে যাচ্ছেন অ্যাডমিরাল। সচেতন থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তিনি, কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না তাঁর ব্রেনের সেল। পরমুহূর্তে ঢিল পড়ল মুখের ভাঁজে, ফিসফিস করে বললেন, 'মনে হয়...ঠিক জানি না...ত্রিশ সেকেণ্ড...পতনের মাত্রা প্রতি সেকেণ্ডে আঠারো ফুট...'

'ত্রিশ সেকেণ্ড?' জানতে চাইল রানা, নিশ্চিত হতে চাইছে ও।

রানার কব্জি ধরে থাকা অ্যাডমিরালের হাতটা নেতিয়ে পড়ল বিছানায়, বন্ধ হয়ে গেল চোখ দুটো। জ্ঞান হারিয়েছেন তিনি।

মলি বেণ্ডারের সাথে সংঘর্ষে আইওয়ার কোন ক্ষতি হয়নি, শুধু বো-এর রঙ একটু চটে গেছে। মৃদু একটু ঝাঁকিও অনুভব করেনি কবীর চৌধুরী। পোর্টের দিকে হুইল ঘোরালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটা অবশ্যই এড়াতে পারত সে, কিন্তু তাতে চ্যানেলের গভীর এলাকা থেকে অল্প পানিতে সরিয়ে নিয়ে আসতে হত আইওয়াকে, তার ফলে

জাহাজের কীলের সাথে নদীর মেঝে ঘষা খেতে পারত—ঝুঁকিটা নিতে চায়নি সে।

এমনিতেই প্রতি মুহূর্তে ঝুঁকি নিতে হচ্ছে তাকে। হাজার হাজার টন অপ্রয়োজনীয় লোহা আর ইস্পাত ভেঙে ফেলে দিয়ে ব্যাটলশিপের ওয়াটারলাইন আটত্রিশ ফুট থেকে কমিয়ে বাইশ ফুটে নামিয়ে এনেছে সে, তবু নদীর মেঝে আর আইওয়ার কীলের মাঝখানে অতি সামান্য ফাঁক থাকছে। যে-কোন মুহূর্তে মাটিতে আটকে যেতে পারে জাহাজ। পিছনে কয়েক মাইল লম্বা ঘোলা পানি রেখে এগোচ্ছে আইওয়া। নরম কাদায় আটকাচ্ছে না কীল, কিন্তু কাদার ঠিক নিচেই রয়েছে শক্ত মাটি, একবার যদি বেকায়দায় পড়ে আটকে যায়, সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে।

এই নদীতে বারবার আসা-যাওয়া করেছে কবীর চৌধুরী। এর প্রতিটি ইঞ্চি তার নখদর্পণে। প্রতিটি বয়া, প্রতিটি ডোবা চর, প্রতি গজে নদীর মেঝে কোথায় কতটুকু উঁচু-নিচু সব তার মুখস্থ। কঠোর পরিশ্রম করে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছে সে, এখন সেগুলো সুফলও দিচ্ছে।

সামনে রয়েছে আসল বিপদ। কেটলী বটম নামে একটা চর আছে, পানিতে ডোবা। লম্বায় সেটা ছয় মাইল। উঁচু-নিচু বালির অসংখ্য চড়া গোটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। নোঙর কেটে রওনা হবার পর থেকেই এই চরের কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছে কবীর চৌধুরী।

পিছিয়ে এসে মাইক্রোফোনের মাউথ-পীসটা তুলে নিল কবীর চৌধুরী। 'বিরতিহীন ডেপথ রিডিং চাই আমি।'

স্পীকারের মাধ্যমে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন।'

তিন ডেক নিচে কবীর চৌধুরীর দু'জন নিগ্রো ক্রু পালা করে ডেপথ রিডিং আওড়াবার দায়িত্ব নিল। ফ্যাদোমিটার দেখে রিপোর্ট করছে তারা। সাধারণত ফ্যাদমের হিসেবে রিডিং জানানো হয়, কিন্তু তারা ফুটের হিসেবে জানাচ্ছে।

'টোয়েন্টি সিক্স ফুট...টোয়েন্টি-ফাইভ...টোয়েন্টি ফোর-ফাইভ।'

কেটলী বটম তার উপস্থিতি জাহির করছে। 'যাও, হেলিকপ্টার রেডি করো,' একজন সহকারীকে আদেশ করল কবীর চৌধুরী। কিছু তথ্য তার দরকার। রানা সম্পর্কে।

ব্যাটলশিপ আইওয়ার এঞ্জিন রুম।

এত বড় একটা জাহাজকে মাত্র সত্তর জন ক্রু দিয়ে চালানো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। প্রতিটি ক্রু একা পাঁচজনের সমান কাজ করছে। প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনা আর অমানুষিক কায়িক পরিশ্রমে চেহারা বদলে গেছে ক্রুদের। দরদর করে ঘামছে সবাই, রক্ত-মাংসের হাত-পায়ে যান্ত্রিক ব্যস্ততা। দুটো এঞ্জিন সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে তবু কিছুটা রক্ষা পেয়েছে ওরা। কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার, ওদের মধ্যে অনেককেই এঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে যখন সময় আসবে, গানারের ভূমিকাও পালন করতে হবে।

তবে এত পরিশ্রম গায়ে লাগছে না ওদের, তার কারণ এই ছুটকো কাজে আশাতীত মজুরী দেয়া হবে ওদেরকে। জাহাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বেকার বসে ছিল ওরা গ্রীসের একটা বন্দরে। এই সময় হঠাৎ একটা রাশান ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপ্টেনের তরফ থেকে প্রস্তাবটা এল। একটা সাবমেরিন আর একটা ব্যাটলশিপের জন্যে কিছু ক্রু দরকার। সাধারণত যা দেয়া হয় তার চারগুণ বেশি পারিশ্রমিক, খাওয়া-দাওয়া সহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ সব বহন করবে কর্তৃপক্ষ। এক কথায় রাজি হয়ে গেছে ওরা। পরদিনই প্লেনে করে নিয়ে আসা হয়েছে ওদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ভিসা ইত্যাদির ঝামেলা সবই সামলেছে নতুন কর্তৃপক্ষ।

অন্ধের মত কাজ করছে ওরা, খোলের স্টীল প্লেটের অপরদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই জানে না। জানে না আইওয়া তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, বা এই অভিযান তাদের জন্যে কি পরিণাম ডেকে আনতে যাচ্ছে। কবীর চৌধুরী তাদেরকে জানিয়েছে, পুরানো এঞ্জিনগুলো এখনও কি পরিমাণ কর্মক্ষম আছে জানার জন্যে খানিক দূরে যাবে আইওয়া, সেই সাথে গোলা ছুঁড়ে কামানগুলোকেও পরীক্ষা করে নেয়া হবে। ক্রুরা ধরে নিয়েছে বে থেকে বেরিয়ে আটলান্টিকে পড়বে জাহাজ। সেজন্যেই জাহাজটা হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে দুলে ওঠায় হতভম্ব হয়ে গেল তারা। খোলের নিচের দিক থেকে কর্কশ ধাতব আওয়াজ উঠে আসছে, থরথর করে কাঁপছে জাহাজের প্রতিটি নাট-বল্টু।

বালির একটা চরের সাথে ধাক্কা খেয়েছে আইওয়া। বালির ঢিবিটাকে দু'ফাঁক করে দিয়ে এখনও এগোচ্ছে জাহাজ, কিন্তু অস্বাভাবিক মন্থর হয়ে গেছে তার গতি। ব্রিজ থেকে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে নির্দেশ এল, 'ফুল অ্যাহেড!' জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এঞ্জিনগুলো এক লক্ষ ছয় হাজার হর্স পাওয়ার প্রয়োগ করছে।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে ক্রুরা, উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাদেরকে। ওদের প্রত্যেকের ধারণা ছিল, গভীর পানিতে চলে এসেছে আইওয়া।

ব্রিজের সাথে যোগাযোগ করল চীফ এঞ্জিনিয়ার চার্লস। 'ক্যাপ্টেন, আমরা কি মাটির সাথে ধাক্কা খেয়েছি?'

'তেমন কিছু নয়, চার্টে উল্লেখ করা হয়নি এমন একটা কিছুর সাথে ঘষা খেয়েছে জাহাজ,' শান্ত গলায় আশ্বাস দিল কবীর চৌধুরী। 'বাধাটা না পেরোনো পর্যন্ত ফুল অ্যাহেড নির্দেশ বলবৎ থাকল।'

কিন্তু চীফ এঞ্জিনিয়ার চার্লসের সন্দেহ ঘোচে না। প্রায় থেমে গেছে জাহাজ, চলছে কিনা বোঝা মুশকিল। থরথর করে কাঁপছে পায়ের নিচের ডেক। আর কর্কশ ধাতব শব্দের কোন বিরাম নেই। তবে, খানিক পর থেকে ধীরে ধীরে কাঁপুনিটা কমে আসতে শুরু করল। ক্রমশ গতি বাড়ছে আবার। আবার যেন গভীর পানিতে চলে এসেছে আইওয়া।

এক মিনিট পর ব্রিজ থেকে চিৎকার করে বলল কবীর চৌধুরী, 'তোমার কর্মীদেরকে বলো, ছাড়া পেয়েছি আমরা। বেরিয়ে এসেছি গভীর পানিতে।'

ক্রুদের চেহারা থেকে ধীরে ধীরে দিশেহারা ভাবটা দূর হয়ে গেল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ক্ষীণ একটু হাসল কেউ কেউ। তারপর আবার যে যার কাজে

ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হোয়াইট হাউস। মাটির তিনশো ফুট নিচে ইমার্জেন্সী এক্সিকিউটিভ অফিস এলাকা কনফারেন্স রুম।

লম্বা কনফারেন্স টেবিলের শেষ প্রান্তে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ডেভিড মরগানের চোখের ওপর। 'ব্যাপারটা কি, মরগান? হঠাৎ এমন কি ঘটল যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না? জুজুর ভয়ে দিশেহারা হবার মত মানুষ তো তুমি নও, অন্তত সেই রকম ধারণা ছিল আমার। আমি ক্লান্ত, বিশ্রামের জন্যে রাজধানী ছেড়ে চলে যাচ্ছি কাল, নিশ্চয়ই সে-খবর জানা আছে তোমার?'

নার্ভাস বোধ করছেন মরগান। প্রেসিডেন্ট তাঁর কড়া মেজাজের জন্যে বিখ্যাত। কিন্তু কথা বলার সময় কোনরকম অপ্রতিভ ভাব দেখা গেল না তাঁর মধ্যে।

'দুঃখিত, স্যার,' বললেন মরগান। 'আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, এ ছাড়া কোন উপায় দেখতে পাইনি আমি। জয়েন্ট চীফসকে আমি জানিয়েছি…'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ডিফেন্স সেক্রেটারি চার্লস উইলসন বললেন, 'মরগান বলতে চাইছে…'

বাধা দিয়ে মরগান বললেন, 'আমি বলতে চাইছি, চেসাপীক বে-র কোথাও এক পাগলা বিজ্ঞানী একটা বায়োলজিকাল মারণাস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন বড় একটা শহরে সেই মহামারীর বীজ ভর্তি একটা শেল ফাটিয়ে দিতে পারে সে। শহরটার প্রতিটি প্রাণী মারা যাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই, গোটা যুক্তরাষ্ট্রের সবাই মারা যাবে কয়েক দিনের মধ্যে, শুধু তাই নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী গোটা উত্তর আমেরিকায় প্রাণের কোন চিহ্ন দেখতে পাবে না কেউ।'

জেনারেল কার্ট হিগিনস্, চেয়ারম্যান অব দি জয়েন্ট চীফস, মরগানের দিকে তীব্র সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। 'ওরকম কিলিং পাওয়ার আছে এমন কোন বায়োলজিক্যাল অস্ত্রের কথা জানা নেই আমার। আপনার মাথার কোনরকম…'

চটেমটে কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন মরগান, কিন্তু একটা হাত তুলে, থামার ইঙ্গিত করলেন প্রেসিডেন্ট।

'শান্ত হও, মরগান,' প্রেসিডেন্টের ঘন গোঁফের নিচে সকৌতুক একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সহকর্মীরা নিজেদের মধ্যে বাক-যুদ্ধ শুরু করলে মনে মনে খুশিই হন তিনি, মাঝে মধ্যে সেটা উপভোগও করেন। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্য রকম, বুঝতে পারছেন তিনি। সমস্যাটা জেনে নিয়ে ত্বরিত ব্যবস্থা নেবার দরকার হতে পারে।

চেয়ারে হেলান দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'আপাতত আমার পরামর্শ, মরগানের কথাগুলো বাইবেল বলে মনে করা হোক।' চীফস অব ন্যাভাল অপারেশনস্

অ্যাডমিরাল টিমোথি মার্চের দিকে তাকালেন তিনি। 'মার্চ, ব্যাপারটা যখন নৌ-হামলা সংক্রান্ত, কাজেই তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই আমি।'

চেহারা দেখে বোঝাই যায় না টিমোথি মার্চ একজন জাঁদরেল সামরিক নেতা। মাথায় সাদা চুলের মুকুট, সরু মুখটা ক্লিন শেভ, চোখে স্টীল রিমের চশমা, নিরীহ একজন সেলসম্যানের মত চেহারা। মরগানের সাথে কথা বলার সময় কিছু নোট নিয়েছেন তিনি, চোখ নামিয়ে সেটা একবার দেখে নিয়ে শুরু করলেন।

'দুটো তথ্য জানা আছে আমার, যাতে প্রমাণ হয় মরগানের আশঙ্কা অমূলক। এক, ব্যাটলশিপ আইওয়াকে ওয়ালভিস বে ইনভেস্টমেন্টের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। আমাদের গতকালকের স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে ফর্বস্ শিপইয়ার্ডে নোঙর ফেলা অবস্থায় ছিল আইওয়া।'

'এখন? এই মুহূর্তে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

উত্তর দিলেন না মার্চ, টেবিলে তাঁর সামনের একটা বোতামে চাপ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দূর দেয়ালে কাঠের প্যানেল দু'ভাগ হয়ে সরে গেল দু'পাশে, আট বাই দশ ফুটের একটা প্রজেকশন স্ক্রীন দেখা যাচ্ছে সেখানে। টেলিফোনের একটা রিসিভার তুলে নিয়ে দ্রুত গলায় নির্দেশ দিলেন মার্চ, 'শুরু করো।'

মাটির অনেক ওপর থেকে তোলা ছবি ফুটে উঠল স্ক্রীনে। স্যাটেলাইটের অত্যন্ত শক্তিশালী ক্যামেরায় শেষ রাতের অন্ধকার আর মেঘ প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ভিউকার্ডের মত উজ্জ্বল আর ঝকঝকে দেখাচ্ছে চেসাপীক বে-র পুব তীরের ছবি। এগিয়ে গিয়ে স্ক্রীনের পাশে দাঁড়ালেন মার্চ, হাতে পেন্সিল দিয়ে ছবির একটা জায়গা চিহ্নিত করলেন।

'এই যে, এখানে এটা···নদীর প্রবেশ মুখ আর অববাহিকা, উত্তরে ড্রাম পয়েন্ট আর দক্ষিণে হগ পয়েন্ট,' পেন্সিলটা মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো, 'আর এই খুদে রেখাগুলো ফর্বস শিপইয়ার্ডের ডক···মরগানের পক্ষে একটা প্রমাণ। দেখতেই পাচ্ছেন, মি. প্রেসিডেন্ট, আইওয়ার ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও।'

মার্চের নির্দেশে ক্যামেরা এগিয়ে যাচ্ছে বে-র আরেক প্রান্তের দিকে। মালবাহী জাহাজ, মাছ ধরার বোট, মিসাইলবাহী ফ্রিগেট মিছিল করে পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এসবের মধ্যে ব্যাটলশিপের মত বিশালাকার কোন আকৃতি দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রীনের ডান দিকে কেমব্রিজ। একটু পরেই বাঁ দিকে দেখা গেল ন্যাভাল একাডেমি। তারপর স্যাণ্ডি পয়েন্টের নিচে টোল ব্রিজ। ক্যামেরা এগিয়ে যাচ্ছে সেই একেবারে প্যাটাপসকো নদী পর্যন্ত। তারপর বালটিমোর। নেই।

'দক্ষিণে?' মৃদু গলায় জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'নরফোক ছাড়া তিনশো মাইলের মধ্যে আর কোন শহর নেই।'

'কিন্তু···তাহলে? অত বড় একটা জাহাজ বাতাসে তো আর মিলিয়ে যেতে পারে না!'

কেউ কোন উত্তর দেবার আগে হোয়াইট হাউসের একজন এইড কনফারেন্স রূমে ঢুকল, সোজা এগিয়ে এসে প্রেসিডেন্টের সামনে একটা কাগজ রাখল সে।

কাগজটা দেখেই চিনতে পারছে সবাই। রেডিও মেসেজের অনুলিপি।

'কবীর চৌধুরীর মেসেজ!' কাগজের দিকে ভুরু কুঁচকে আছেন প্রেসিডেন্ট। হঠাৎ মুখ তুলে মরগানের দিকে তাকালেন একবার। 'কবীর চৌধুরী? কে সে?' পরমুহূর্তে আবার চোখ নামালেন রেডিও মেসেজের দিকে। "...আমি, কবীর চৌধুরী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেইনল্যাণ্ড আক্রমণ করতে যাচ্ছি। বড় বাড় বেড়েছে তোমরা, তাই আমার দশ বিলিয়ন ডলারের চেকটা আটকে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছ, আমার গবেষণাগার ধ্বংস করে দিয়েছ। এটা তারই প্রতিশোধ। কবীর চৌধুরীকে খেপিয়ে তোলার পরিণাম কি হতে পারে, তার সামান্য একটু নমুনা দেখাতে চাই আমি দুনিয়াকে।" ঝট্ করে মুখ তুললেন প্রেসিডেন্ট। 'এসব কি? কবীর চৌধুরী...কে সে?'

'এর কথাই বলতে চেয়েছি আমি,' অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বললেন মরগান। 'পাগলা বিজ্ঞানী।'

রেডিও মেসেজটার দিকে আবার তাকালেন প্রেসিডেন্ট। শব্দগুলো যেন তাঁর চোখের সামনে নাচছে, কথাগুলোর অর্থ বুঝতে গিয়ে ঘেমে উঠছেন তিনি। বাস্তব বিপদের চেহারা কল্পনা করে ঢোক গিললেন একটা। 'তার মানে আমাদের মাথার ওপর নরক ভেঙে পড়তে যাচ্ছে?'

ছয়

ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। নুমার নিজস্ব হ্যাঙ্গার।

একটা ড্রাফটিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। টেবিলের ওদিকে কর্নেল রেজনিক আর রানা। এলাকার জলপথ আঁকা একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ দেখছে ওরা।

'ওজন কমিয়ে আইওয়াকে হালকা করার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে কবীর চৌধুরীর,' অ্যাডমিরালের চুরুটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে লাইটারটা পকেটে ভরল রানা। 'ষোলো ফুট ওয়াটার লাইন নামানো সহজ কথা নয়। হাজার হাজার টন ইস্পাত ভেঙে ফেলে দিতে হয়েছে তাকে। উদ্দেশ্য ছাড়া একটা কাজও করে না সে।'

'তোমার হিসেবে কোন গোলমাল নেই তো?' জর্জ হ্যামিলটন জানতে চাইলেন। 'তার মানে পানির নিচে বাইশ ফুট ডুবে আছে আইওয়া।' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। 'অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার।'

'এমন একজন লোকের কাছ থেকে জেনেছি, যার ভুল হতে পারে না,' বলল রানা। 'ফর্বস শিপইয়ার্ডের সুপারিনটেনডেন্ট ডেল জারভিসের সাথে আবার যোগাযোগ করেছিলাম আমি। হিসাবটা নিখুঁত বলে গ্যারান্টি দিয়েছে সে।'

'কিন্তু কেন?' জানতে চাইল কর্নেল রেজনিক। 'কি লাভ তাতে? সমস্ত কামান সরিয়ে সেগুলোর জায়গায় ডামি বসানো হয়ে থাকলে জাহাজটার আর মূল্য

থাকল কোথায়? কি কাজে লাগাবে ওটাকে কবীর চৌধুরী?'

'সমস্ত ফায়ার-কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট সহ দু'নম্বর গান টাওয়ারটা এখনও নিজের জায়গায় আছে,' বলল রানা।

এই সময় হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দ। হ্যাঙ্গারের বাইরে ঘ্যাচ্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক ধাক্কায় দরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে এল নীল স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ পরা একটা মেয়ে। হনহন করে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে মেয়েটা। চিনতে পারছে ওরা, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের পার্সোনাল সেক্রেটারি, মেরিলিন। সোজা এগিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল সে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে।

'কি ব্যাপার, মেরিলিন?' আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'আমাদের অফিসে একটা রেডিও মেসেজ এসেছে, স্যার,' দ্রুত বলল মেরিলিন। 'মি. রানার নামে। কবীর চৌধুরীর মেসেজ।' হাতের ব্যাগ খুলে মেসেজের একটা অনুলিপি বের করল সে। 'এই যে...'

মেরিলিনের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল না রানা, টেবিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল অনুলিপিটা। পড়ছে।

মুহূর্তে বদলে গেল রানার চেহারা। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন উঠে এসেছে মুখে। কাগজ ধরা হাতটা মুঠো পাকিয়ে গেল, ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল ও।

'কি ব্যাপার, রানা?'

'নষ্ট করার মত সময় নেই আর, অ্যাডমিরাল,' দ্রুত বলল রানা। 'প্রতিটি সেকেণ্ড এখন মহামূল্যবান। কোন একসময় সম্মোহিত করে ট্রুথ সেরাম ব্যবহার করে অ্যাডমিরাল ডেনটন স্কটের কাছ থেকে কুইক-ডেথের রহস্য জেনে নিয়েছে কবীর চৌধুরী। চ্যালেঞ্জ করে বলেছে, দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই যে তাকে ঠেকাতে পারে এখন। গোটা উত্তর আমেরিকাকে ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছে সে।' হঠাৎ থেমে গেল রানা, কথা বলতে পারছে না।

দ্রুত টেবিল ঘুরে এগিয়ে এসে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলেন হ্যামিলটন।

'আমার প্ল্যানটাই এখন একমাত্র উপায়, অ্যাডমিরাল,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই আমি।'

মনোযোগের সাথে একটা নতুন চুরুট ধরালেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। সিলিংয়ের দিকে একমুখ নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে রানার দিকে তাকালেন। 'তোমার প্ল্যানটা পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়, রানা। তুমি আত্মহত্যা করতে চাইছ।'

'কিছু একটা করতে চাইছি,' দৃঢ় গলায় বলল রানা, 'এখানে এভাবে বসে কথার মালা গাঁথলে কোন লাভ হবে? বুঝতে চেষ্টা করুন, অ্যাডমিরাল। সামরিক উপদেষ্টারা প্রেসিডেন্টকে রাজি করাবেন, কমাণ্ডো পাঠিয়ে আইওয়া দখল করার নির্দেশ দেবেন তিনি। মহামারীর বীজ সামরিক বাহিনীর হাতে চলে আসবে। আপনি তাই চান?'

'আগেও জানিয়েছি, নীতিগতভাবে আমি তা চাই না,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'কিন্তু আমার প্রশ্ন, কন্ট্রোল করা যায় না এমন একটা বায়োলজিক্যাল

অস্ত্র কি কাজে লাগবে ওদের?'

'প্রাণ বাজি রেখে বলতে পারি, এ-দেশের সব ক'জন বায়োলজিস্ট কুইক-ডেথের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে।' সিগারেট ধরাচ্ছে রানা, হাত দুটো মৃদু মৃদু কাঁপছে দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল। 'আজ হোক কাল হোক কেউ একজন দুর্লঙ্ঘ্য বাধাটা টপকাবে, কুইক-ডেথকে কন্ট্রোল করা তখন আর কোন সমস্যা হবে না—এবং আতঙ্কগ্রস্ত একজন জেনারেল বা একজন অ্যাডমিরাল হঠাৎ একদিন কারও বিরুদ্ধে তা ব্যবহারও করে বসবে।'

'কুইক-ডেথের অস্তিত্ব পর্যন্ত রাখতে চাইছ না তুমি,' চোখ বুজে ওপর-নিচে মাথা দোলালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'আমি তোমাকে সমর্থন করি। কিন্তু…'

'আপনারা আমার বিরোধিতা করলেও,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা, 'কবীর চৌধুরীকে বাধা দেবার জন্যে পদক্ষেপ নিতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু এখানে আমরা যে তিনজন রয়েছি, তারা কেউ দুটো কুইক-ডেথ উদ্ধার করার প্রতিযোগিতায় ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের সাথে পেরে উঠব না।'

'পারব কি পারব না সেটা পরের কথা,' বলল রানা। 'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? এখনকার পরিস্থিতি অ্যাকশন দাবি করছে।' একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু করল রানা, 'ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের আগে আমরা যদি একজন লোককে আইওয়াতে পাঠাতে পারি, তার পক্ষে প্রজেক্টাইল দুটোর ফায়ারিং মেকানিজম অচল করে দিয়ে কুইক-ডেথ ভর্তি খুদে বোমাগুলো পানিতে ফেলে দেয়া খুব কঠিন হবে না।'

'সেই লোকটা নিশ্চয়ই তুমি?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'তিনজনের মধ্যে আমিই সবচেয়ে উপযুক্ত।'

'আপনি আমাকে ছোট করে দেখছেন, মি. রানা,' গম্ভীর গলায় বলল কর্নেল রেজনিক।

'সব চেষ্টা যদি বিফল হয়,' বলল রানা, 'হেলিকপ্টার কন্ট্রোল করার জন্যে ভাল একজন লোক দরকার হবে আমাদের। দুঃখিত, কর্নেল, আমি হেলিকপ্টার চালাতে জানি না, কাজেই আমাকেই যেতে হচ্ছে আইওয়াতে।'

'তাছাড়া, ঠিক এ-ধরনের কাজে আপনার কোন অভিজ্ঞতা নেই, কর্নেল,' মন্তব্য করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'এটা একটা ইমার্জেন্সী, ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন প্রফেশনালের ওপর দায়িত্ব দিতে চাই।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'কিন্তু তবু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে ব্যাপারটা। তোমার আগেই যদি ডিফেন্সের লোকেরা আইওয়ায় গিয়ে ওঠে, সব ভেস্তে যাবে। আইওয়া কোথায় আছে তা খুঁজে বের করতে মোটেও বেগ পেতে হবে না ওদেরকে। স্যাটেলাইটের সাহায্য পাচ্ছে ওরা।'

'আর আমরা পাচ্ছি আগেভাগে যোগাড় করা তথ্যের সাহায্য,' বলল রানা।

'তার মানে?'

'আমি জানি আইওয়া কোন্ দিকে যাচ্ছে,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'জানেন?'

'কোন্ দিকে?' আগ্রহের আতিশয্যে রানার দিকে ঝুঁকে পড়লেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'আইওয়ার ওজন কমিয়েই ধরা পড়ে গেছে কবীর চৌধুরী,' বলল রানা। 'একটা মাত্র জলপথ আছে যার গভীরতা গড়পরতায় বাইশ ফুটের মত। ব্যাটলশিপ আইওয়াও পানির নিচে মাত্র বাইশ ফুট ডুবে আছে, ঠিক কিনা?'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। কর্নেল রেজনিকও একচুল নড়ছে না। দু'জনেই অপেক্ষা করছে ধাঁধার উত্তরটা রানার মুখ থেকে শোনার জন্যে।

'রাজধানী,' দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলল রানা। 'কবীর চৌধুরী পোটোম্যাক নদী দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আইওয়াকে। ওয়াশিংটন আক্রমণ করবে সে।'

মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে কবীর চৌধুরীর। চোখে ক্ষুরধার দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে বহুদূরে। হুইল ধরা হাত দুটো টনটন করছে ব্যথায়, প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রমে ফর্সা মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, অনবরত দরদর করে ঘামছে সে, টপটপ করে পড়ছে ফোঁটাগুলো পায়ের কাছে। শুধু হাত দুটো নড়ছে তার, তাছাড়া শরীরটা ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তির মত স্থির। প্রায় আট ঘণ্টা আইওয়ার হুইলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। মাঝখানে দু'ঘণ্টার জন্যে একাই হেলিকপ্টার নিয়ে জাহাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে সেই যে দাঁড়িয়েছে, মুহূর্তের জন্যেও নড়েনি আর। হাতে ফোস্কা পড়েছে, সেগুলো গলে গিয়ে জ্বালা করছে। কিন্তু এসব দিকে কোন খেয়াল নেই তার। কোন জীবিত বা মৃত নাবিক দুঃস্বপ্নেও যা ভাবতে পারে না, তাই করছে সে, একটা ব্যাটলশিপকে নিরাপদে নিয়ে যাচ্ছে চ্যানেলের ভেতর দিয়ে। এই কাজেই সে তার সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিয়েছে। দু'নম্বর গান টাওয়ারের লম্বা, ভয়ঙ্কর কামানগুলো উজানের দিকে মুখ করে রয়েছে, এখনই রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে পেনসিলভানিয়া অ্যাভেনিউ।

চ্যানেল বয়াগুলোকে একের পর এক পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আইওয়া। বিশ মাইল সামনে ঝলমল করছে রাজধানী ওয়াশিংটনের আলোকমালা, সেদিকে সম্মোহিতের মত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কবীর চৌধুরী।

স্টার্নের পিছনে চলে গেল কোয়ানটিকো মেরিন বেস। হ্যালোয়িং পয়েন্ট আর গানস্টন কোভ পেরিয়ে এসেছে জাহাজ। আইওয়ার বো-এর সামনে এখন আর মাত্র একটাই বাঁক—তারপরই সরল রেখার মত সোজা হয়ে গেছে চ্যানেল, শেষ হয়েছে গলফ্ কোর্সের কিনারায়, ইস্ট পোটোম্যাক পার্কে।

'টোয়েনটি-থ্রী ফুট,' ডেপথ রিডারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল স্পিকারে। 'টোয়েনটি-থ্রী…টোয়েনটি-টু-ফাইভ…'

পরবর্তী বয়াকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আইওয়া। পাঁচ ব্লেডের আঠারো ফুট আউটবোর্ট প্রপেলার নদীর নিচে মহা আলোড়ন তুলছে, বো-এর ধাক্কা খেয়ে ফাইভ

নট কারেন্টের পানি হয়ে উঠছে সাদা ফেনার পাহাড়।

'টোয়েনটি-টু ফুট, ক্যাপ্টেন,' ডেপথ রিডারের গলায় উত্তেজনা। 'টোয়েনটি-টু, আটকাল···আটকাল···হায় খোদা! টোয়েনটি-ওয়ান-ফাইভ!'

বালিশে হাতুড়ির বাড়ির মত নদীর মেঝেতে গুঁতো মারল আইওয়া। ধাক্কাটা যতটা না অনুভব করল তারচেয়ে বেশি অনুমান করে নিল কবীর চৌধুরী—প্রতি মুহূর্তে গভীর কাদায় ঢুকে যাচ্ছে ব্যাটলশিপের বো। এঞ্জিনগুলোর যান্ত্রিক গুঞ্জন থামেনি, থরথর করে কাঁপছে আইওয়া, কিন্তু গতি নেই, স্থির হয়ে গেছে।

মাউন্ট ভারননের ঢালের গায়ে আটকে গেছে আইওয়া।

'এ যে সম্ভব তা আমি ভাবতেই পারিনি,' বললেন অ্যাডমিরাল টিমোথি মার্চ। ভিউয়িং স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, দৃষ্টিতে বিস্ময় এবং প্রশংসা, আইওয়ার বিশাল আকার দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। 'এই রকম একটা ইস্পাতের দুর্গকে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে সরু চ্যানেলের ভেতর দিয়ে চালিয়ে নব্বুই মাইল নিয়ে আসা, সীম্যানশিপের চরম ঔৎকর্ষ, সন্দেহ নেই।'

গভীর ধ্যানমগ্ন দেখাচ্ছে প্রেসিডেন্টকে। 'এই লোক, মানে, কবীর চৌধুরী সম্পর্কে কতটুকু কি জানি আমরা?'

একজন এইডকে ইশারা করলেন মার্চ, এগিয়ে এসে প্রেসিডেন্টের সামনে একটা নীল রঙের ফোল্ডার বাড়িয়ে ধরল সে।

'আমার অনুরোধে রানা এজেন্সীর স্থানীয় চীফ···আনিস আহমেদ, কবীর চৌধুরী সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে,' বললেন মার্চ। 'নতুন অনেক কথা জানতে পারছি আমরা, আমাদের সি.আই.এ.-র ফাইলে সেগুলো ছিল না।'

চোখে একজোড়া রিডিং গ্লাস পরে ফোল্ডারের ভাঁজ খুললেন প্রেসিডেন্ট। কয়েক মিনিট পর হর্ন রিমের ওপর দিয়ে অ্যাডমিরাল মার্চের দিকে তাকালেন। 'অদ্ভুত ব্যাপার! গবেষণার বিষয় আর আবিষ্কার দেখে বোঝা যাচ্ছে, দুর্লভ একটা প্রতিভা। অথচ তার এই অধঃপতন? সম্ভবত অবহেলার পরিণতি, অথবা···' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি।

'আইনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই, বাকি সব ঠিক আছে,' বললেন ডেভিড মরগান। 'আর অবহেলার কথা বললেন, সেটাও খাঁটি কথা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো খাবার যোগাড় করতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, বিজ্ঞানীদের কদর দেবে কোত্থেকে!'

ধীরে ধীরে সামরিক উপদেষ্টাদের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমি প্রস্তাব চাইছি।'

সবার আগে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল কার্ট হিগিনস্। স্ক্রীনের পাশে গিয়ে টেবিলের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আইওয়ায় ভয়ঙ্কর একটা বায়োলজিক্যাল এজেন্ট রয়েছে, এই কথা মনে রেখে আমাদের স্টাফ প্ল্যানাররা কয়েকটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছে। এক, এয়ারফোর্সের এফ-ওয়ান টোয়েনটি স্পেকটর জেটের একটা স্কোয়াড্রনকে কপারহেড মিসাইলের সাহায্যে আইওয়াকে

উড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিতে পারি আমরা। এই আক্রমণকে সহায়তা করবে আর্মি ইউনিট, তীর থেকে ফায়ার ওপেন করে।'

'বড় বেশি ঝুঁকি,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'নিশ্চিত ফল পাবার আশা করা যায় না। আইওয়া যদি সেই মুহূর্তে এবং পুরোপুরি ধ্বংস না হয়, কুইক-ডেথের বীজ ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

'দুই,' আবার শুরু করলেন হিগিনস্, 'নেভী সীল-এর অধীনে একটা টীম পানিপথ দিয়ে আইওয়ায় পাঠাচ্ছে, ওদের কাজ হবে স্টার্ন সেকশন দখল করা, ওখানে একটা হেলিপ্যাড আছে। সীল টীম সফল হলে মেরিন অ্যাসল্ট ট্রুপ ল্যাণ্ড করে দখল করতে পারবে আইওয়াকে।' থামলেন হিগিনস্, মন্তব্যের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

'কিন্তু জাহাজটাকে যদি ভেঙেচুরে সমতল করে ফেলা হয়ে থাকে,' কথা বলছেন অ্যাডমিরাল টিমোথি মার্চ, 'মেরিন ট্রুপস্ ভেতরে ঢুকবে কিভাবে?'

উত্তর দিলেন মরগান। 'শিপইয়ার্ড সুপারিনটেনডেন্টের দেয়া তথ্য, আর্ম বেশিরভাগ আর্মার আর সুপারস্ট্রাকচার কাঠের সাথে বদল করা হয়েছে বিস্ফোরণের সাহায্যে ভেতরে ঢুকতে পারবে ওরা, যদি ল্যাণ্ড করার সময়ই কবীর চৌধুরী ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে না দেয়।'

'এসব যদি ব্যর্থ হয়,' বললেন হিগিনস্, 'খুদে একটা নিউক্লিয়ার মিসাইলের সাহায্যে কাজ হাসিল করা আমাদের সর্বশেষ বিকল্প।'

কনফারেন্স রূমের ভেতর জমাট বাঁধছে স্তব্ধতা। ঝাড়া এক মিনিট কেউ কোন শব্দ করলেন না। জেনারেলের সর্বশেষ প্রস্তাবের অকল্পনীয় পরিণতি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন সবাই। প্রস্তাবের সমর্থনে মুখ খুলতে সাহসী হলেন না কেউ। তবে, সমস্ত দায়িত্ব যার, তিনিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলেন।

'তার চেয়ে আমার মনে হয়,' বললেন প্রেসিডেন্ট, 'ছোট একটা নিউট্রন বোমা সমস্যার সমাধান দিতে পারে।'

'শুধু রেডিওঅ্যাকটিভিটিতে মরবে না কিউ-ডি এজেন্ট,' জানালেন মরগান।

'এবং,' কথার পিঠে কথা পাড়লেন অ্যাডমিরাল মার্চ, 'মারাত্মক কোন রশ্মিও বোধহয় গান-টাওয়ার ভেদ করতে পারবে না। ছিপি আঁটা অবস্থায় প্রায় এয়ারটাইট থাকে ওগুলো।'

জেনারেল হিগিনসের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'নিউক্লিয়ার মিসাইল ব্যবহার করলে খারাপ কতটুকু কি ঘটতে পারে আশা করি তোমার লোকেরা তা জানে?'

অবিচলিত দেখাচ্ছে হিগিনসকে। ধীর ভঙ্গিতে ওপর-নিচে মাথা দোলালেন তিনি। 'আমাদের সেই চিরন্তন নীতি। অনেকের প্রাণ বাঁচাবার স্বার্থে কয়েকজনকে আত্মত্যাগ করতে হবে।'

'ক'জনকে কয়েকজন বলছ তুমি?'

'পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর হাজার নিহত। সম্ভবত এর দ্বিগুণ আহত হবে। আইওয়ার কাছাকাছি ছোট জনবসতিগুলো আর আলেকজান্দ্রিয়ার ঘন-বসতি এলাকা সবচেয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শহর ওয়াশিংটনের ব্যাপক কোন

ক্ষতি হবে না।'

'রওনা হবার আগে তৈরি হতে কতক্ষণ সময় নেবে মেরিন ট্রুপস্?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট

'এই মুহূর্তে তারা হেলিকপ্টারে চড়ছে,' এই প্রথম কথা বললেন মেরিন কমাণ্ড্যান্ট জেনারেল ম্যালকম 'আর এরই মধ্যে ভাটির দিকে একটা কোস্ট গার্ড পেট্রোল বোট নিয়ে রওনা হয়ে গেছে সীল।'

'একটা করে কমব্যাট ইউনিটে দশজন করে লোক,' যোগ করলেন মার্চ, 'তিনটে ইউনিট।'

কির কির-কির কির, কির কির, কির কির, মৃদু শব্দে একটা বেল বেজে উঠল জেনারেল হিগিনসের চেয়ারের পাশ থেকে। ঝুঁকে পড়ে অ্যাডমিরাল মার্চ তুলে নিলেন রিসিভারটা, শুনলেন, তারপর আবার রেখে দিলেন সেটা মুখ তুলে হিগিনসের দিকে তাকালেন তিনি, হিগিনস্ স্ক্রীনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

'আইওয়ার ওপর সাউদার্ন ব্লাফে ক্যামেরা সেট করেছে কমিউনিকেশন টীম,' বললেন অ্যাডমিরাল মার্চ, 'কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ছবি পাঠাতে শুরু করবে ওরা।'

মার্চের কথা শেষ হবার আগেই স্যাটেলাইট ক্যামেরা অফ হয়ে গেল, মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হয়ে গেল স্ক্রীন, তারপরই নতুন ছবি ফুটে উঠল সেখানে। আইওয়ার সুপারস্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে একটা কাপে কফি ঢাললেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু চুমুক দিচ্ছেন না তাতে। আইওয়ার দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন, উপযুক্ত একটা সিদ্ধান্ত খুঁজছেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত পর একটা নিঃশ্বাস ফেলে জেনারেল হিগিনসকে বললেন, 'সীল আর মেরিনদের প্রোগ্রামটাই বেছে নিচ্ছি আমরা। ওরা যদি ব্যর্থ হয়, স্পেকটর জেটগুলোকে পাঠানো হবে, আর তোমার বাহিনীকে অর্ডার দেবে যা কিছু আছে সব যেন তীর থেকে ছুঁড়তে শুরু করে ওরা।'

'নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম?'

মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'না ' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আমার দেশবাসীকে পাইকারী ভাবে হত্যা করার হুকুম আমি দিতে পারি না, যাই ঘটুক না কেন।'

'সূর্য ওঠার আগে আমাদের হাতে আধ ঘণ্টা সময় আছে,' মৃদু গলায় বললেন অ্যাডমিরাল টিমোথি মার্চ। 'কামান দাগার জন্যে দিনের আলো দরকার হবে কবীর চৌধুরীর। ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করার আগে আইওয়ার সমস্ত রাডার অপারেটেড আর অটোমেটিক-ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম সরিয়ে নেয়া হয়েছে। টার্গেট এলাকায় বা কাছাকাছি কোথাও একজন স্পটার না থাকলে ঠিক জায়গায় আঘাত করতে পারবে না একটা শেলও। একজন স্পটার না থেকেই পারে না, রেডিওর সাহায্যে সে-ই কবীর চৌধুরীকে রেঞ্জ ইত্যাদি জানাবে।'

'হয়তো রাস্তার ওপারেই কোন ছাদে বসে আছে সে,' বললেন প্রেসিডেন্ট, চুমুক দিলেন কফির কাপে।

'অসম্ভব নয়,' বললেন মার্চ। 'যাই হোক, বেশিক্ষণ রেডিও ব্যবহার করতে হবে না তাকে, কমপিউটারাইজড্ ট্রায়াঙ্গুলেশন মনিটরস্ সেট আপ রয়েছে

আমাদের, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বের করে ফেলবে তার হদিশ।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আপাতত মন্দের ভাল একটা ব্যবস্থা করা গেছে। এখন দেখা যাক।'

'আমার আরেকটা কথা, মি. প্রেসিডেন্ট,' বললেন হিগিনস, 'সবশেষে বলব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম।'

'বলো।'

'কুইক-ডেথ প্রজেক্টাইল,' বললেন হিগিনস। 'আমরা যদি অক্ষত অবস্থায় দখল করতে পারি ওগুলো, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে অ্যানালাইজ করার ব্যবস্থা...'

'প্রশ্নই ওঠে না!' প্রতিবাদ করলেন মরগান। 'ওগুলো অবশ্যই নষ্ট করে ফেলতে হবে। ও-ধরনের ভয়ঙ্কর একটা অস্ত্র রেখে দিয়ে লাভ নেই কোন।'

'আরও জরুরী একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে,' সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন ডিফেন্স সেক্রেটারি চার্লস উইলসন।

সাথে সাথে সবার চোখ গিয়ে পড়ল স্ক্রীনে। ছোঁ মেরে একটা রিসিভার তুলে নিলেন টিমোথি মার্চ। চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন তিনি। 'স্টার্নের পিছনে আর ওপরে লেন্স নিয়ে যাও!'

অদৃশ্য হাত নিষ্ঠার সাথে দ্রুত নির্দেশ পালন করল, ক্যামেরা তার ইমেজ এরিয়া বাড়াবার সাথে সাথে ব্যাটলশিপের কাঠামো ছোট হয়ে গেল। সবার চোখ পড়ল এক সেট এয়ারক্রাফট-নেভিগেশন লাইটের ওপর। উজানের দিক থেকে আসছে।

'ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'একটা হেলিকপ্টার,' রেগে গেছেন জেনারেল হিগিনস। 'নিশ্চয়ই বোকা কোন সিভিলিয়ানের কৌতূহল হয়েছে, ঢুঁ মেরে দেখতে আসছে জাহাজটাকে।'

সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে ভিড় করে দাঁড়ালেন স্ক্রীনের সামনে। উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠেছে সবার চেহারায়। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নেভিগেশনাল আলোর দিকে। নদীতে আটকে পড়া আইওয়ার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে 'কপ্টারটা।

'আমাদের লোক রেডি হবার আগেই কবীর চৌধুরী যদি ভয় পেয়ে কামান দাগতে শুরু করে,' চাপা উত্তেজনার সাথে বললেন অ্যাডমিরাল মার্চ, 'আমাদের জন্যে সেটা একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। কত লোক মারা যাবে তা একমাত্র খোদাই বলতে পারেন।'

পোটোম্যাক নদীর মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আইওয়া। এঞ্জিনগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কোথাও কোন শব্দ নেই।

চার্লস এখন আর চীফ এঞ্জিনিয়ার নয়, ক্যাপ্টেনের নির্দেশে সে এখন গানারি অফিসার। ব্রিজে উঠে আসছে। ভয়ে দুরু দুরু করছে বুকের ভেতরটা। রাশভারী, বদ-মেজাজী মানুষ ক্যাপ্টেন, দেখলেই ভয় করে, চোখের দিকে তাকানো যায় না, কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না। কিন্তু নিচে ক্রুদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে, চাইলেও এখন মুখ বুজে থাকা সম্ভব নয়।

ব্রিজে উঠে চার্লস দেখল ক্যাপ্টেন একটা ছোট রেডিও সেটের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বুদ্ধি করে নিপুণ ভঙ্গিতে একটা স্যালুট ঠুকল সে। 'মাফ করবেন, ক্যাপ্টেন, আপনার সাথে কিছু কথা ছিল আমার।'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ, চার্লসের কাঁধে মস্ত একটা হাত রাখল সে। 'কি ব্যাপার, চার্লস, মাই ডিয়ার বয়?'

ক্যাপ্টেনকে খোশমেজাজে পেয়ে স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচল চার্লস। ক্রুদের প্রশ্নটা সংক্ষেপে তুলল সে, 'এ আমরা কোথায় এসেছি, স্যার?'

সাথে সাথে উত্তর দিল কবীর চৌধুরী, যেন প্রশ্নটার জন্যে আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল সে। 'অ্যাবারডিন প্রুভিং গ্রাউণ্ডে। জায়গাটার সাথে পরিচয় আছে তোমার, চার্লস?'

'না, স্যার।'

'এখানে মার্কিনীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ টেস্ট করে।'

'কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম···মানে, ক্রুদের ধারণা ছিল, আইওয়াকে সাগরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

চোখ সরিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল চৌধুরী। 'নো, মাই বয়। ইয়াঙ্কিরা দয়া করে তাদের টার্গেট গ্রাউণ্ডে আমাদেরকে গানারি প্র্যাকটিস করার অনুমতি দিয়েছে।'

'কিন্তু স্যার, এখান থেকে বেরুব কিভাবে?' চার্লসের চেহারায় অস্বস্তি আর বিস্ময়ের ছাপ। 'জাহাজের বো তো মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেছে!'

আশ্বাস দিয়ে হাসল কবীর চৌধুরী। 'ভয় পেয়ো না, চার্লস। জোয়ার এলে আমাদেরকে কোন চেষ্টাই করতে হবে না, নিজে থেকেই কাদা থেকে বেরিয়ে আসবে আইওয়া।'

চেহারা থেকে ভীতির ছাপ দূর হয়ে গেল চার্লসের। 'কথাটা শুনে শান্ত হবে ওরা,' বলল সে।

'ভেরি গুড, চার্লস,' চার্লসের পিঠ চাপড়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'যা বললে খুশি হয় ওরা, তাই বলবে তুমি ওদেরকে। এবার স্টেশনে ফিরে যাও, গান লোড করার কাজ কতদূর এগিয়েছে দেখো।'

স্যালুট করে চলে গেল চার্লস। আবার রেডিও সেটের ওপর ঝুঁকে পড়ল কবীর চৌধুরী, কিন্তু এক মুহূর্ত পর ঝট্ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। এয়ারক্রাফটের আওয়াজ! আকাশের দিকে তাকাল সে। ফিকে হতে শুরু করেছে অন্ধকার। পুব দিকের আকাশে রঙবেরঙের আলো দেখা যাচ্ছে। একটা হেলিকপ্টার আসছে উজানের দিক থেকে। ছোঁ মেরে একজোড়া নাইট-গ্লাস তুলে নিয়ে চোখে তুলল সে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে 'কপ্টারটা। আবছাভাবে দেখা গেল তার কাঠামো, নুমা লেখা পরিচিতিটা চোখে পড়ল না তার। কোন সিভিলিয়ানের 'কপ্টার হবে, ভাবল সে, বিপদের কোন ভয় নেই। অলসভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে, ব্যস্ততা বা উত্তেজনার কোন লক্ষণ নেই। ব্রিজ কাউন্টারে বিনকিউলারটা রেখে আবার রেডিওর দিকে মন দিল সে। একটা কানের সাথে হেডসেটটা চেপে ধরে

মাইক্রোফোনের বোতাম টিপে দিল।

'রেড মুন ওয়ান কলিং রেড মুন টু। ওভার।'

প্রায় সাথে সাথে অপর প্রান্ত থেকে সাড়া দিল পার্কার, 'স্পষ্ট এবং পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি, স্যার।'

'রেডি, টার্গেট রেঞ্জ?'

'ইয়েস, স্যার।'

'গুড,' বলল কবীর চৌধুরী। রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'পাঁচ মিনিট দশ সেকেণ্ড বাকি আর।'

'ইয়েস, স্যার। ওভার।'

বোতাম টিপে মাইক অফ করে দিল কবীর চৌধুরী। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, ওয়াশিংটনের দিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টারটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে মিনার্ভা এম ডাবল এইট হেলিকপ্টারের কন্ট্রোল বদলে নিচের দিকে ডাইভ দিল কর্নেল রেজনিক। সেই সাথে মেরীল্যাণ্ডের ওপর বিশাল এলাকা জুড়ে বাঁক নিচ্ছে। পাতা-ঝরা গাছের ঠিক ওপর দিয়ে এগোচ্ছে মিনার্ভা, ওয়াটার টাওয়ারগুলোকে এড়াবার জন্যে গতি বদলাচ্ছে মাঝে মধ্যে। এয়ারফোনে রূঢ় আদেশের সুর। চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠল রেজনিকের।

'বড় বেশি চেঁচামেচি করছে ওরা,' শান্তভাবে বলল সে। 'কোথাকার কোন্ এক জেনারেল বলছে, এলাকা ছেড়ে চলে না গেলে গুলি করে নামাবে আমাদেরকে।'

'সাড়া দিন,' বলল রানা। 'বলুন, জ্বী আজ্ঞে, আপনার আদেশ শিরোধার্য।'

'কি পরিচয় দেব নিজেদের?' জানতে চাইল রেজনিক।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'সত্যি কথাই বলুন নুমা, 'কপ্টার, স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টে আছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রেজনিক, কথা বলতে শুরু করল মাইক্রোফোনে।

'নাম-না-জানা বুড়ো জেনারেল বিশ্বাস করেছে,' বলল সে। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'আপনি এবার তৈরি হোন। অনুমান, আট মিনিট পর ঝাঁপ দেবেন আপনি।'

গম্ভীর থমথমে মুখে বসে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। চেহারা দেখে বোঝা যায়, মনের ভেতর তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে তাঁর।

সীট বেল্ট খুলে ফেলল রানা। অ্যাডমিরালের সীট বেল্ট খোলা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর 'কপ্টারের কার্গো কম্পার্টমেন্টের দিকে এগোল। রেজনিকের পাশে থামল একবার, তার কানে কানে বলল, 'সাবধান, কর্নেল,' ঠাট্টার ছলে রেজনিককে সতর্ক করে দিল ও। 'একটু এদিক ওদিক হলেই আইওয়ার গায়ে রক্তাক্ত একটা কুৎসিত দাগে পরিণত হব আমি।'

'কিচ্ছু ভাববেন না,' সহাস্যে বলল রেজনিক। 'আপনি শুধু জান-পরাণ দিয়ে ঝুলে থাকবেন, মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়িয়ে নিয়ে যাব আমি 'কপ্টার। নির্দিষ্ট সময়ের

আগেই যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় আপনাকে, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, আপনি যাতে পানিতে পড়েন তার ব্যবস্থা আমি করতে পারব।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা।

'ফিকে হয়ে আসছে অন্ধকার,' বলল রেজনিক। 'চোখে ধুলো দেবার জন্যে চক্কর শেষ করে পশ্চিম দিক থেকে এগোব আমরা।' উইণ্ডশিল্ড থেকে মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি ফেরাচ্ছে না এখন সে। 'নেভিগেশন লাইট অফ করে দিচ্ছি। গুড লাক।'

রেজনিকের কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে অপ্রশস্ত কার্গো কেবিনে এসে ঢুকল রানা। ওকে অনুসরণ করলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। ককপিটের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

কার্গো কেবিনের ভেতরটা বরফের মত ঠাণ্ডা। লোডিং হ্যাচটা খোলা রয়েছে, ভোর-আঁধারির হিমেল বাতাস অ্যালুমিনিয়াম গম্বুজের ভেতর তীর বেগে ঢুকে ছুটোছুটি করছে। হারনেসটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। কবীর চৌধুরীর মেসেজটা পাবার পর থেকে খুব কম কথা বলছেন তিনি। হারনেসটা স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে নিল রানা।

কি যেন বলতে গিয়ে ইতস্তত করে থেমে গেলেন অ্যাডমিরাল। ভাবাবেগের ক্ষীণ একটু ছায়া দেখা গেল তাঁর চেহারায়, কিন্তু মুহূর্তে সেটা মিলিয়ে গেল আবার। তারপর তিনি বললেন, 'ব্রেকফাস্টে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি।'

'পোচ করা ডিম, বাটার-টোস্ট, জেলি, তারপর আপনার যা খুশি,' বলেই হিম-শীতল অন্ধকারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

ওয়েট স্যুট পরছে সীল কমব্যাট ইউনিটের লীডার লেফটেন্যান্ট র‍্যাণ্ডি কোহেন। রাগে গজগজ করছে সে। হাই কমাণ্ডের মাথায় ভূত চেপেছে আর কি! ঘণ্টাখানেক আগে গভীর ঘুম থেকে তুলে হড়বড় করে এই বিদঘুটে অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলা হয়েছে তাকে, যার হাতামাথা কিছুই বুঝতে পারেনি সে। গত সাত বছরের নেভী জীবনে এ-ধরনের ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। মাথায় রাবার হুডটা গলিয়ে কান দুটো লাইনিঙের নিচে ঢেকে নিল সে, তারপর ধীর পায়ে এগোল মোটাসোটা একজন লোকের দিকে। একটা চেয়ারে বসে রয়েছে লোকটা। ব্রিজ রেইলিঙের ফাঁক গলে পা দুটো বেরিয়ে গেছে বাইরে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পোটোম্যাক নদীর দিকে।

'ব্যাপারটা কি আসলে?' প্রশ্ন করল লেফটেন্যান্ট কোহেন।

একটু নড়েচড়ে বসল কোস্ট গার্ড পেট্রল বোটের কমাণ্ডার লেফটেন্যান্ট আর্নেস্ট বাকলার। চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি ফুটে উঠল তার, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আপনার মত আমিও ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'পোটোম্যাক নদীতে ব্যাটলশিপ, এই গাঁজাখুরি গল্প আপনি বিশ্বাস করেন?'

'কিভাবে!' অবাক সুরে বলল বাকলার। 'উজানে, ওয়াশিংটন নেভী ইয়ার্ডে চার হাজার টন ডেস্ট্রয়ার দেখেছি আমি···তাই বলে পঞ্চাশ হাজার টন ব্যাটলশিপ?

অসম্ভব!'.

'জাহাজে চড়াও হয়ে স্টার্নের দিকটা মেরিন হেলিকপ্টার অ্যাসল্ট টীমের জন্যে দখল করো,' ঝাঁঝের সাথে বলল কোহেন। 'ভাবছি, এটা কোন অর্ডার, নাকি পাগলের প্রলাপ?'

হঠাৎ হাসল বাকলার। 'আমার কি মনে হয় জানেন? মেয়েমানুষ আর মদ নিয়ে খুব হৈ-হুল্লোড় হচ্ছে ওখানে, মনে করুন পিকনিকে যোগ দিতে যাচ্ছি আমরা...'

'এই ভোর-অন্ধকারের কনকনে ঠাণ্ডায় তাও কারও ভাল লাগবে না।'

'যাই হোক, একটু পরই জানা যাবে সব। শেরিডান পয়েন্ট ঘুরতে আর দু'ঘণ্টা বাকি আছে, বাঁক নেবার পর নিশ্চয়ই আমরা দেখতে পাব...' হঠাৎ বাকলার থেমে গেল, মাথাটা একদিকে একটু কাত্ করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে সে। 'শুনতে পাচ্ছেন?'

হাত তুলে কান দুটোকে আড়াল করে ঘাড় ফেরাল কোহেন, পেট্রল বোটের পিছনের আকাশে তাকাল। 'মনে হচ্ছে একটা হেলিকপ্টার?'

'নরক থেকে বাদুড় আসছে নাকি?' অবাক গলায় বলল বাকলার। 'আলো নেই কেন?'

'হায় খোদা!' আঁতকে উঠল কোহেন। 'মেরিন ট্রুপস। সময়ের আগেই রওনা হয়ে গেছে ওরা!'

পরমুহূর্তে, পেট্রল বোটের মাত্র দুশো ফুট ওপরে দেখা গেল হেলিকপ্টারটাকে। প্রচণ্ড গর্জন তুলে তীব্র বেগে উড়ে গেল সেটা, অন্ধকারে তার কাঠামোটা শুধু দেখা গেল এক ঝলক। পেট্রল বোটের সবাই চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে 'কপ্টারটার গমন পথের দিকে, হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা, কেউ লক্ষ্যই করল না যে আরেকটু নিচে এবং 'কপ্টারের সামান্য একটু পিছনে আবছা একটা মানুষের আকৃতি ঝুলছে। ঝুলন্ত মূর্তিটা ডেকের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ধাক্কা খেল রেডিও অ্যান্টেনার সাথে, ভেঙে গেল সেটা, নিয়ে চলে গেল সাথে করে।

'আরে!' সবিস্ময়ে বলল কোহেন। 'ওটা আবার কি!'

নদীর মাত্র ত্রিশ ফুট ওপরে নুমা হেলিকপ্টারের সাথে ঝুলছে রানা। পেট্রল বোটের অ্যান্টেনাকে শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল ও। পা দুটো সামনে নিয়ে গিয়ে ভাঁজ করছে, এই সময় সংঘর্ষটা ঘটল। ভাগ্য ভাল, নিতম্বের কাছে মোটা টিউবিঙের সাথে সংক্ষিপ্ত মৃদু একটু ধাক্কা লাগল মাত্র, ভেঙে গেল অ্যান্টেনা, কিন্তু একটা তারও জড়াতে পারল না শরীরটাকে।

দিগন্তরেখার ঠিক ওপর ঘন কালো একসার মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে রয়েছে দিনের নতুন সূর্য, কুয়াশায় প্রতিহত হয়ে তার আভা আশপাশে কোথাও এসে পৌঁছায়নি। বাতাস যেন হিমের ছুরি। চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে রানার।

নিচে কালো পারদের মত আবছা একটা ঝলক যেন পোটোম্যাক নদী, যার কোন শেষ নেই। ঘণ্টায় দুশো মাইল গতিতে উড়ে যাচ্ছে রানা। দুই তীরে দাঁড়ানো গাছগুলো গাড়ির মিছিলের মত স্যাঁত্ স্যাঁত্ করে পিছিয়ে যাচ্ছে।

আকাশের দিকে তাকাল ও, হেলিকপ্টারের দরজার কাছে ম্লান একটা গোলাকার আকৃতি দেখা যাচ্ছে, চিনতে পারছে, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের উদ্বিগ্ন মুখ ওটা।

প্রকাণ্ড এক বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে নদী। মোড় ঘুরছে রেজনিক, হারনেসের সাথে একপাশে সরে যাচ্ছে রানা, সেই সাথে পাক খাচ্ছে। তারপর আবার যখন সোজা হলো 'কপ্টার, আগের পজিশনে 'কপ্টারের সামান্য পিছনে চলে এল রানা, এখন আর পাক খাচ্ছে না। সামনে তাকাতেই কেন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। আইওয়ার প্রকাণ্ড শরীরটা দেখা যাচ্ছে, গোবেচারা ভঙ্গিতে উজানের দিকে মুখ তুলে রয়েছে তার ফরওয়ার্ড গান।

আস্তে করে থ্রটল ঠেলে 'কপ্টারের স্পীড কমিয়ে আনল রেজনিক। হারনেসের স্ট্র্যাপ বুকে চেপে বসছে অনুভব করে ঝাঁপ দেবার জন্যে হাত দুটো ভাঁজ করল রানা।

কন্ট্রোল কেবিনের সামনের উইণ্ডশীল্ড দিয়ে আইওয়ার সুপারস্ট্রাকচার ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। জাহাজের স্টারবোর্ড সাইডের ওপর, মেইন ব্রিজের ঠিক পিছনে, 'কপ্টার থামাল রেজনিক। পরমুহূর্তে নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে আনা উচিত ছিল। প্রচণ্ড একটা দোলা খাবে এখন রানা, সুপারস্ট্রাকচারের সাথে ধাক্কা খেয়ে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ সামনের দিকে প্রচণ্ড একটা টান অনুভব করল রানা, তারপর বাতাস কেটে শোঁ-শোঁ করে এগোতে শুরু করল সামনের দিকে। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে মেইন ডেক, ওখানেই নামার প্ল্যান করেছে ও। একটুর জন্যে খালি একটা গানটাওয়ারের সাথে ধাক্কা লাগল না। দোলার শেষ প্রান্তে চলে এসেছে ও। ফিরতি পথে কিসের সাথে ধাক্কা লাগবে বলা মুশকিল। লাগবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয় এখন, না হয় কখনোই নয়। চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও কুইক রিলিজ বাটনটা টেনে দিল দ্রুত হাতে। হারনেসের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল শরীরটা তীরবেগে নেমে যাচ্ছে।

ভোরের আবছা আলোয় চোখ কুঁচকে নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে তাঁর। আশঙ্কা আর উত্তেজনায় রুদ্ধ হয়ে আছে শ্বাস। ঝপ্ করে নেমে যেতে দেখলেন তিনি রানাকে। ফরওয়ার্ড সুপারস্ট্রাকচারের পিছনে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল আইওয়াও। কোণাকুণিভাবে প্রায় খাড়া উঠে যাচ্ছে রেজনিক হেলিকপ্টার নিয়ে, বিদ্যুৎগতিতে বাতাস কাটছে রোটরের ব্লেডগুলো, তীরে দাঁড়ানো গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে আড়ালে চলে এল 'কপ্টার।

সেফটি স্ট্র্যাপ খুলে ককপিটে ফিরে এলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

'গেছেন উনি, স্যার?' দ্রুত জানতে চাইল রেজনিক।

'হ্যাঁ, নেমেছে রানা।'

'অক্ষত কিনা...'

'আশা করতে পারি,' শান্তভাবে বললেন হ্যামিলটন, এঞ্জিনের আওয়াজে তাঁর

কথা ভাল করে শুনতে পেল না রেজনিক। 'আশা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের!'

সাত

আইওয়া। ব্রিজ। ভাটির দিকে চোখ পড়তেই ভুরু কুঁচকে উঠল কবীর চৌধুরীর। ফুল স্পীডে ছুটে আসছে একটা বোট। ধীরে ধীরে নিষ্ঠুর একটু হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে ওরা কারা, কেন আসছে, সবই বুঝতে পারল সে। বোতাম টিপে মাইক্রোফোনে কথা বলল।

'চার্লস?'

'স্যার?'

'মেশিনগান ক্রুদেরকে পজিশন নিতে বলো। ভাটির দিক থেকে অবাঞ্ছিত একদল আগন্তুক আসছে, ওদেরকে বাধা দিতে হবে।'

'এটা কি একটা মহড়া, স্যার?' জানতে চাইল চার্লস।

'না,' কঠিন সুরে বলল কবীর চৌধুরী। 'চরমপন্থী একদল ইয়াংকি আমাদের জাহাজ দখল করতে আসছে। তোমার লোকদেরকে বলো, কোন ব্যক্তি, জলযান বা এয়ারক্রাফট, সে যেই হোক, আমাদের জাহাজ বা ক্রুদের নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হয়ে দেখা দিলে সাথে সাথে ফায়ার করতে হবে। পশ্চিম দিক থেকে ওই যে বোটটা আসছে, ওদেরকে যে-কোন মূল্যে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে...।'

'ইয়েস, স্যার,' উত্তেজনায় কেঁপে গেল চার্লসের গলা।

ভাটির দিকে আর একবার তাকাল কবীর চৌধুরী। ছোট বিন্দুটা ক্রমশ বড় হচ্ছে আকারে। আবার মাইক তুলে নিল সে। 'মেইন ব্যাটারি।'

'মেইন ব্যাটারি রেডি, ক্যাপ্টেন।'

'সিঙ্গেল ফায়ার অন কমাণ্ড,' চার্টের পাশে রাখা হিসাবের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'রেঞ্জ, টোয়েন্টি-থ্রী থাউজেণ্ড নাইন হানড্রেড ইয়ার্ডস। টার্গেট বিয়ারিং, ওহ্-ওয়ান-ফোর ডিগ্রিজ।'

দু'নম্বর মেইন ব্যাটারি-টাওয়ারের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। টাওয়ার থেকে আটষট্টি ফুট লম্বা তিনটে কামান বেরিয়ে আসছে। মেকানিজম সহ প্রতিটি ব্যারেলের ওজন একশো চৌত্রিশ টন। সাবলীল ভঙ্গিতে বেরিয়ে এসে পনেরো ডিগ্রীতে স্থির হলো কামানগুলোর মাজল। হাত বাড়িয়ে ট্র্যান্সমিট বাটনটা টিপে দিল কবীর চৌধুরী।

'পজিশনে আছ, রেড মুন টু?'

রেডিওতে স্পটার পার্কারের গলা ভেসে এল, 'ইয়েস, স্যার।'

'চার্লস?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

'স্ট্যাণ্ডিং বাই টু ফায়ার, স্যার।'

সেই নিষ্ঠুর হাসিটা আবার ফিরে এল কবীর চৌধুরীর মুখে। প্রতিশোধ নেবার সমস্ত আয়োজন শেষ করেছে সে। এখন শুধু তার হুকুমের অপেক্ষা। দশ বিলিয়ন ডলারের চেক আটকে দিয়ে ব্যাটারা ভেবেছিল খুব শায়েস্তা করা গেছে লোকটাকে। কিন্তু আমাকে ওরা চিনতে পারেনি! এখন? এখন কি হবে? একটা কানাকড়িও খরচ করতে হয়নি আমাকে, অথচ প্রতিশোধ নেবার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছি। এই অপারেশনের ফি হিসেবে শুধু দশ বিলিয়ন ডলার নয়, সেই সাথে কয়েকটা ল্যাবরেটরি তৈরি করার যাবতীয় খরচ আগাম পেয়ে গেছে সে মার্কিনীদের প্রাণের শত্রু আরেক সুপার-পাওয়ারের কাছ থেকে। তাছাড়া, অপারেশনের সমস্ত খরচ তো ওরা বহন করছেই। ওদের কিছু লোক জিম্মি হিসেবে রেখেছে সে, তার কারণ মার্কিনীদের শত্রুকেও একবিন্দু বিশ্বাস করে না সে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ধ্বংসের বীজ ভর্তি বোমা ফাটিয়ে দিয়ে পালাতে হবে তাকে। কথা হয়েছে, সেই পালাবার ব্যবস্থা ওরাই করবে। যদি না করে, তার বন্ধুরা হত্যা করবে জিম্মিদেরকে।

'রেডি, চার্লস,' মাইক্রোফোনে বলল কবীর চৌধুরী। কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিল সে, তারপর নির্দেশ দিল। 'ফায়ার!'

কোস্ট গার্ড পেট্রোল বোট।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শকওয়েভে ডেকে যারা ছিল ছিটকে পড়ে গেল সবাই। গান পাউডারের চোখ ঝলসানো আলোয় কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল ওরা। আগুনের আঁচে পুড়ে গেছে মাথার চুল, জ্বালা করছে গায়ের চামড়া। আইওয়ার দু'নম্বর গান টাওয়ার থেকে মাত্র একটা কামান দাগা হয়েছে, মাথার ওপর দিয়ে গোলাটা উড়ে যাবার সময় আরেকটা ধাক্কা খেল পেট্রোল বোট।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে ব্রিজের রেলিঙের ওপর পড়ল লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার আর্নেস্ট বাকলার। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল হুইলটা। বন বন করে ঘুরিয়ে ইংরেজী এস অক্ষরের মত বাঁক নিল সে। এরপর হঠাৎ ফেটে গেল উইণ্ডশীল্ডের কাঁচ, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মুহূর্তের জন্যে বাকলারের মনে হলো, তাকে যেন কয়েকশো মৌমাছি আক্রমণ করেছে। ডান হাতটা ধাক্কা খেয়ে ছুটে গেল হুইল থেকে। জ্যাকেটের আস্তিনে একটা গর্ত দেখল সে, দ্রুত লাল রক্তে ভরে উঠল সেটা

'আপনার লোকদেরকে বোটের আরেকদিকে সরিয়ে নিন ' সীল ইউনিটের লীডার লেফটেন্যান্ট কোহেনকে বলল সে। 'শালারা গুলি করছে!'

ক্রল করে ডেকে বেরিয়ে এল কোহেন। আগুনের আঁচ আর বিস্ফোরণের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে বসছে ক্রুরা। লীডারের নির্দেশ পেয়ে ক্রল করে এগোল ওরা। আশ্চর্যের ব্যাপার, একমাত্র লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার বাকলার ছাড়া আর কেউ আহত হয়নি মেশিনগানের গুলিতে।

পেট্রোল বোটের সাইনবোর্ড বাম্পার দুম করে ধাক্কা খেল আইওয়ার খোলের সাথে, স্থির হয়ে গেল বোট। আইওয়ার ওপর থেকে গানাররা সাইটে দেখতে

পাচ্ছে না বোটকে, এখন তারা বড়জোর বোটের রাডার মাস্ট লক্ষ্য করে গুলি করতে পারে। এরপর দ্রুত একটা বাঁক নিয়ে খোলা পানির দিকে ছুটে চলল বোট। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট তাড়া করছে ওটাকে। কিন্তু একটা বুলেটও বিশ গজের এদিকে এল না। মেকানিকদের হাতে মেশিনগান পড়লে এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করা যায়।

খানিক পর পিছন ফিরে একবার তাকাল লেফটেন্যান্ট বাকলার। কোহেন আর তার লোকেরা উঠে গেছে আইওয়ায়, কোথাও দেখা গেল না তাদেরকে। বোট আর আইওয়ার দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

ভোরবেলা ব্যায়াম করতে বেরিয়েছে কাস্টমস অফিসার ডোনাল্ড ফারগুসন। আরলিংটন মেমোরিয়াল পেরিয়ে এসে লিংকন মেমোরিয়াল ঘুরে বাড়ির পথ ধরে দৌড়াচ্ছে সে। হঠাৎ একটা আশ্চর্য আওয়াজ! থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ফারগুসন। ক্রমশ বাড়ছে শব্দটা, ফারগুসনের মনে হলো, তীর বেগে একটা ট্রেন ছুটে আসছে যেন, অথচ ভাল করেই জানা আছে তার, এদিকে কয়েক মাইলের মধ্যে কোন রেলপথ নেই। পরমুহূর্তে বদলে গেল শব্দটা, হুশ শ্-শ্ করে কি যেন ছুটে গেল মাথার ওপর দিয়ে। দু'চোখ ভরা অবিশ্বাস আর আতঙ্ক নিয়ে দেখল, টোয়েনটি-থার্ড স্ট্রীটের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। বিস্ফোরণের আওয়াজটা সাথে সাথেই শুনতে পেল সে। বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে কংক্রিটের টুকরো, মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ধুলোর একটা পাহাড়।

বিস্ফোরণের পরও নিজেকে অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল ফারগুসন। একটা ডেলিভারি ভ্যান দেখতে পেল সে। ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা। উইণ্ডশীল্ডটা ভেঙে পড়েছে ভেতর দিকে। ড্রাইভিং সীট থেকে রাস্তায় নেমে এল একজন লোক। হাত দুটো মুখের সামনে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখতে পাচ্ছি না! হেলপ্! প্লীজ, কেউ আমাকে সাহায্য করো!'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠল ফারগুসন। ছুটল ড্রাইভারের দিকে। মুখের সামনে থেকে হাত দুটো মুহূর্তের জন্যে সরতেই চমকে উঠল সে। সারা মুখে লম্বা লম্বা কাটা দাগ, ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে।

রাস্তায় যানবাহনের ব্যস্ততা নামতে এখনও একঘণ্টা বাকি। রানওয়ের মত বিশাল রাস্তাটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। পুলিস আর অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে, কিন্তু কিভাবে? আর একটা মাত্র গাড়ি দেখতে পাচ্ছে ফারগুসন, স্ট্রীট সুইপারের গাড়ি, অলস গতিতে বাঁক নিয়ে ইণ্ডেপেনডেন্স এভিনিউয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সেটা, যেন কিছুই ঘটেনি।

'রেড মুন টু,' রেডিওর সাহায্যে পার্কারকে ডাকল কবীর চৌধুরী, 'ফায়ারের প্রতিক্রিয়া জানাও।'

'স্যার, রাস্তায় পড়েছে…'

'তোমার হিসেবে তাহলে ভুল ছিল!' কঠিন গলায় বলল কবীর চৌধুরী।

'মাফ করবেন, স্যার। আমাদের টার্গেট আরও পঁচাত্তর ফুট সামনে আর একশো আশি ফুট বাঁ দিকে।'

'শুনলে তো চার্লস?'

'অ্যাডজাস্ট করছি, ক্যাপ্টেন।'

'অ্যাডজাস্ট করেই ফায়ার করো, চার্লস।'

'ইয়েস, স্যার।'

পাঁচ ডেক নিচে ম্যাগাজিন ক্রুরা পাওয়ার হ্যামারের সাহায্যে ব্রীচের গলার ভেতর সাতাশশো পাউণ্ড ওজনের আরেকটা আর্মার-ভেদী প্রজেক্টাইল ঢোকাল।

চোদ্দ মাইল দূরে। লিংকন মেমোরিয়াল।

ডেলিভারি ভ্যানের আহত ড্রাইভারকে ধরে ফুটপাথের ওপর বসিয়ে দিল ফারগুসন। সিধে হয়ে দাঁড়াতে যাবে, এই সময় আবার সেই আশ্চর্য শব্দ! পরমুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিমূঢ় বিস্ময়ের সাথে ফারগুসন দেখল লিংকন মেমোরিয়ালের সাদা মার্বেল পাথরগুলো কামানের গোলার মত আকাশের দিকে এলোপাতাড়ি ছুটে যাচ্ছে। ছত্রিশটা বিশাল স্তম্ভ ফুলের পাপড়ির মত বাইরের দিকে হেলে পড়েছে। তারপর ভেঙে পড়তে শুরু করল ভেতরের আকাশ ছোঁয়া দেয়ালগুলো। চার দিকে শুধু পাথর পড়ার ভারী আওয়াজ, সাদা ধুলোয় সামনেটা প্রায় সম্পূর্ণ ঝাপসা হয়ে গেছে।

'কি হচ্ছে? কি হচ্ছে এসব?' ভ্যানের ড্রাইভার কেঁদে উঠল।

'ভয় পেয়ো না,' সমস্ত শব্দ থেমে গেছে ইতিমধ্যে। 'ওটা আরও একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ।'

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে ড্রাইভার। প্রায় ত্রিশটা কাঁচের টুকরো গেঁথে রয়েছে তার মুখে। একটা চোখ থেকে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে আসছে, আরেকটা নেই বললেই চলে, রেটিনা পর্যন্ত দু'ফাঁক হয়ে গেছে।

গায়ের শার্ট খুলে ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিল ফারগুসন। 'ব্যথা সহ্য করার জন্যে এটাকে মোচড়াও, কামড়াও কিংবা টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করো··· কিন্তু মুখে হাত দিয়ো না। আমি তোমার জন্যে সাহায্যের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।' হঠাৎ কান পাতল সে। দূর থেকে ক্ষীণ একটা শব্দ ভেসে আসছে। সাইরেনের শব্দ। 'পুলিস আর অ্যাম্বুলেন্স আসছে,' ড্রাইভারকে বলল সে। 'ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে হবে···তুমি বসো, আমি আসছি।' ছুটল ফারগুসন।

ধ্বংসস্তূপের পাশ ঘেঁষে ছুটছে ফারগুসন। হঠাৎ প্রায় চমকে উঠল সে, দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সে। এখনও একটা জিনিস মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিধ্বস্ত লিংকন মেমোরিয়ালের ভেতর। কি ভাবে সম্ভব হলো এটা, ভেবে পেল না সে। সাদা মার্বেল পাথরের স্তূপ আর ধুলোর মাঝখানে সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে আব্রাহাম লিংকনের উনিশ ফুট লম্বা স্ট্যাচু।

নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন লিংকন, চেহারায় গভীর বিষাদের ছায়া, চোখের দৃষ্টি অনন্তের দিকে প্রসারিত।

ক্রাডলে ঠকাস করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন জেনারেল কার্ট হিগিনস। 'ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে স্পটার,' তিক্ত গলায় বললেন তিনি। 'তার সন্ধান বের করে ফেলেছিল আমাদের মনিটর ইউনিট, কিন্তু সবচেয়ে কাছের পেট্রল সেখানে পৌঁছুবার আগেই কেটে পড়েছে সে।'

'সন্দেহ নেই, গাড়িতে রয়েছে স্পটার,' বললেন ডিফেন্স সেক্রেটারি চার্লস উইলসন। মুশকিল হলো, প্রতি চারটে গাড়ির মধ্যে তিনটেতেই রয়েছে সি-বি রেডিও, লোকটাকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

'রাজধানীর সমস্ত মোড়ে পুলিস আর আমাদের স্পেশাল ফোর্স রোড ব্লকের ব্যবস্থা করছে,' হিগিনস বললেন। 'স্পটারকে যদি টার্গেট এরিয়ার বাইরে সরিয়ে রাখতে পারি আমরা, কবীর চৌধুরীকে আন্দাজের ওপর নির্ভর করে কামান দাগতে হবে।'

এনলার্জ করা লিংকন মেমোরিয়ালের স্যাটেলাইট ছবি দেখা যাচ্ছে ভিউয়িং স্ক্রীনে, সেদিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। 'আমেরিকানদের আঁতে ঘা দিচ্ছে লোকটা,' মৃদু গলায় বললেন তিনি। 'কিছু লোকের লাশ দেখে তারা যতটা না খেপবে, তার চেয়ে অনেক বেশি অপমান বোধ করবে একটা জাতীয় মনুমেন্ট ধ্বংস হতে দেখলে।'

'এর পরের শেলটা যদি কিউ ডি-ভর্তি হয়...' শুরু করলেন মরগান।

'দুটো শেল ছোঁড়া হয়েছে,' টিমোথি মার্চের দিকে তাকিয়ে বললেন হিগিনস। 'আইওয়ার রেট অব ফায়ার হিসেবে করেছেন?'

'এক আর দু'নম্বর শেলের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান ছিল চার মিনিট দশ সেকেণ্ড,' বললেন টিমোথি মার্চ। 'একটু বেশি সময় নিচ্ছে, তার কারণ বোধহয়, ইকুইপমেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে, ক্রুর সংখ্যাও কম, যারা আছে তারাও তেমন দক্ষ নয়।'

'কিন্তু আমি ভাবছি,' এতক্ষণে একটা চুরুট ধরালেন উইলসন, 'টাওয়ারের মাঝখানের কামানটা ব্যবহার করছে কেন কবীর চৌধুরী? বাকি দুটো...'

'নিয়ম মেনে চলছে কবীর চৌধুরী,' বললেন মার্চ। 'রেঞ্জ ঠিক করার জন্যে তিনটে কামান ব্যবহারের দরকার কি? এর পরের বারও যদি তার রেঞ্জ ঠিক থাকে, একসাথে তিনটে কামান দাগবে।'

জেনারেল হিগিনসের সামনে একটা ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে শুনলেন তিনি, চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'তিন নম্বর আসছে।'

পিছিয়ে এল স্যাটেলাইট ক্যামেরা। দু'মাইল চৌহদ্দিসহ হোয়াইট হাউস দেখা গেল স্ক্রীনে। রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার পালা। কেউ জানে না এবারের প্রজেক্টাইলটা কিউ-ডি ভর্তি কিনা, কিংবা কোথায় সেটা আঘাত করবে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে প্রেসিডেন্টের, মুঠো পাকিয়ে গেছে হাত দুটো। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল কনস্টিটিউশন এভেনিউ। রাস্তার পাশের দুটো প্রকাণ্ড গাছ বোমার মত বিস্ফোরিত হলো, ফুটপাথে প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা গভীর একটা গর্ত দেখা গেল।

'ন্যাশনাল আর্কাইভ বিল্ডিংটা ফেলে দিতে চায় কবীর চৌধুরী,' বললেন প্রেসিডেন্ট, গলার স্বরে তিক্ততা। 'শাসনতন্ত্র আর স্বাধীনতার ঘোষণা ধ্বংস করতে চায় সে।'

জেনারেল কার্ট হিগিনসের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'আমি আবেদন জানাচ্ছি, মি. প্রেসিডেন্ট,' ভারী গলাটা কেঁপে উঠল তাঁর, 'এই মুহূর্তে নিউক্লিয়ার আঘাত হেনে আইওয়াকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার অর্ডার দিন আপনি!'

ধীরে ধীরে নিচু হয়ে গেল প্রেসিডেন্টের কাঁধ, যেন শীত করছে তাঁর। 'না,' মৃদু গলায়, কিন্তু রায় ঘোষণার দৃঢ় সুরে বললেন তিনি।

হাত দুটো শরীরের দু'পাশে ঝুলে পড়ল হিগিনসের, ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। টেবিলে একটা পেন্সিল ঠুকছেন চীফ অব ন্যাভাল অপারেশনস, টিমোথি মার্চ। কি যেন ভাবছেন।

'আরেকটা উপায় করা যায়,' ধীরে বললেন তিনি। 'আইওয়ার দু'নম্বর গান টাওয়ার উড়িয়ে দিতে পারি আমরা।'

'টাওয়ার উড়িয়ে দিতে পারি?' ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন হিগিনস। চোখে আশার আলো।

'কিছু এফ-ওয়ান-টোয়েনটি স্পেক্টর জেটে সাতান পেনিট্রেশন মিসাইল আছে,' বললেন অ্যাডমিরাল মার্চ। 'ঠিক, জেনারেল রড?'

এয়ারফোর্স চীফ জেনারেল রড হপকিন্স ওপর নিচে মাথা দোলালেন। 'প্রতিটি এয়ার ক্রাফটে চারটে করে সাতান মিসাইল আছে, তিন গজ নিরেট কংক্রিট ভেদ করে যেতে পারে ওগুলো।'

'বুঝলাম,' দ্রুত বললেন জেনারেল হিগিনস। 'কিন্তু লক্ষ্য ভেদে কতটুকু সফল? একটু এদিক ওদিক হলেই ছড়িয়ে পড়বে কিউ-ডি।'

'লক্ষ্য অব্যর্থ হবে,' ধীরস্থিরভাবে বললেন জেনারেল রড। 'পাইলট মিসাইল ছুঁড়েই সুইচ গাইডেন্স কন্ট্রোল গ্রাউণ্ড ট্রুপসের হাতে ছেড়ে দেবে। আপনার লোক, জেনারেল হিগিনস, আইওয়ার সবচেয়ে কাছে রয়েছে—টার্গেটের দুই ফুট ডায়ামিটারের মধ্যে আঘাত করতে পারবে ওরা।'

ছোঁ মেরে ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন জেনারেল হিগিনস, তাকিয়ে আছেন প্রেসিডেন্টের দিকে। 'কবীর চৌধুরী যদি তার ফায়ারিং সিডিউল মেনে চলে, আমাদের হাতে আর দু'মিনিট সময়ও নেই।'

'তাই করো,' অনুমতি দিলেন প্রেসিডেন্ট।

গ্রাউণ্ড ট্রুপসকে নির্দেশ দিচ্ছেন জেনারেল হিগিনস, ওদিকে আইওয়ার কাঠামো আর গঠন প্রণালী জানার জন্যে একটা ফাইল খুলে পড়ছেন অ্যাডমিরাল টিমোথি মার্চ। 'আইওয়ার গান টাওয়ার সাত থেকে সতেরো ইঞ্চি পুরু স্টীলের আর্মার প্লেটিঙে মোড়া,' বললেন তিনি। 'ওটা হয়তো ধ্বংস করতে পারব না আমরা, তবে ক্রুদের পিলে চমকে দিতে পারব।'

'সীল কমব্যাট ইউনিট,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাদের পদক্ষেপ সম্পর্কে ওদেরকে সাবধান করে দেয়া যায় না?'

গম্ভীর হলো অ্যাডমিরাল মার্চের চেহারা। 'পানিতে নামার পর থেকে ওদের সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই।'

আইওয়ায় ওঠার সময় কোহেনের ত্রিশজন লোকের মধ্যে ছয় জন মারা গেছে। নিজেও আহত হয়েছে সে। ট্র্যান্সমিটারটা গুঁড়ো করে দিয়ে একটা বুলেট তার বাঁ হাতের তালু ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। দু'নম্বর রেডিওটা টীমের অ্যাসিস্ট্যান্টের পিঠে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা ছিল, সে বুকে গুলি খেয়েছে। ভাটির দিকে কোথাও ডুবে গেছে লাশটা।

প্রচণ্ড গুলি বিনিময়ের পর জাহাজে উঠেছে ওরা। নাইলনের মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে মরণপণ যুদ্ধ করতে হয়েছে ওদেরকে। জাহাজের স্টার্ন দখল করে মেইন ডেকের দিকে এগোয় ওরা। ওখানে আরেক বার আক্রান্ত হয় ওরা। কোহেনের লোকেরা আড়ালে গা ঢাকা দেবার জন্যে চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ে। কে কোথায় কি অবস্থায় আছি, কিছুই জানে না সে।

দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। ল্যাণ্ডিং প্যাড দখল করার কোন উপায় [illegible] না কোহেন। নিজের লোকদের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল সে। নিজের কানেও সে-চিৎকার পৌঁছল না, দু'নম্বর গান টাওয়ারের কামানটা গর্জে উঠল আবার।

পাহাড়ের মাথায় শূন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেরিন হেলিকপ্টারগুলো, অধৈর্যের সাথে তার সিগন্যাল পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

এয়ারক্রাফট ক্রেন মাউন্টিঙের আড়াল থেকে সন্তর্পণে উঁকি দিল কোহেন। মেইন ব্রিজের মাথায় স্টীল প্লেটিঙের পিছন থেকে অবিরাম গর্জন করছে একটা মেশিনগান। টীমের লোকেরা আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে, তাদেরকে লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়ছে আইওয়ার গানাররা।

ডান হাতে অটোমেটিক রাইফেলটা বাগিয়ে ধরল কোহেন, গুলি করতে করতে বেরিয়ে এল ডেকে। স্টার্নের দিকে একটা টাওয়ারের পিছনে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় কবীর চৌধুরীর লোকেরা দেখতে পেল তাকে। এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এল তার দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কোহেন, বাঁ হাঁটুর নিচে একটা গুলি লেগেছে।

ক্রল করে ডামি টাওয়ারের আড়ালে চলে এল সে, পিছনে রেখে এল রক্তের একটা ধারা। ডেকে শুয়ে হাঁপাচ্ছে সে। ক্ষতগুলোর ব্যথায় কাতরাচ্ছে। এই সময় মেশিনগানের একটানা আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল জেট প্লেনের তীক্ষ্ণ শব্দ।

সকালের রোদে ঝিকমিক করছে স্পেক্টর জেটের গা। কয়েকটা মিসাইল ছুঁড়ে চলে গেল ওগুলো।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল রানার। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। চোখ মেলল। অন্ধকার কোথায় যেন শুয়ে আছে সে। মাথার ওপর একটা গর্ত দেখল, গর্তের কিনারাগুলো এবড়ো খেবড়ো। পা আর শরীরে বুলিয়ে আঙুলে চটচটে কিছু লাগল না দেখে স্বস্তি বোধ করল ও। ক্ষতির মধ্যে একটা পাঁজরের হাড় চির খেয়েছে, আর

কয়েক জায়গার চামড়া উঠে গেছে।

ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা। মাথার ওপর তাকাল আবার। গর্তের বাইরে দিনের আলো। এতক্ষণে বুঝল, এটা একটা প্যাসেজ। হেলিকপ্টার থেকে সুপারস্ট্রাকচারের গায়ে দড়াম করে পড়েও শরীরটা দলা পাকিয়ে না যাবার কারণটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। স্টীল বাল্ক হেডের জায়গায় বসানো হয়েছে সিকি ইঞ্চি পুরু প্লাইউডের প্যানেল, তারই একটার ওপর কামানের গোলার মত পড়েছিল ও। প্যানেল ভেঙে নেমে এসেছে এই প্যাসেজে।

উঠে দাঁড়াল রানা। সামনে একটা বাঁক দেখা যাচ্ছে। এগোতে যাবে, হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথে থরথর করে কেঁপে উঠল আইওয়া। ষোলো ইঞ্চি কামান, বুঝতে পারল। হঠাৎ তাড়া অনুভব করল। ক'টা শেল ছুঁড়েছে কবীর চৌধুরী? কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল সে?

প্যাসেজ ধরে এগোল রানা। দূরে মেশিনগানের আওয়াজ। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। কে কার সাথে লড়ছে? চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিল ও। কিছু এসে যায় না। সবচেয়ে জরুরী কাজ কিউ-ডি প্রজেক্টাইল দুটোকে অকেজো করা। কিন্তু এরই মধ্যে দেরি হয়ে যায়নি তো?

বিশ ফুট এগিয়ে থামল রানা। এক পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল, আইওয়ার ডেক প্ল্যান ওটা, আরেক পকেট থেকে বের করল টর্চ। জাহাজের ঠিক কোন্ জায়গায় রয়েছে জানার চেষ্টা করছে। মূল্যবান দুটো মিনিট পার হয়ে গেল এই কাজে।

প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এল রানা। চারদিকে আকাশ ছোঁয়া সব আকৃতি, জাহাজের সুপারস্ট্রাকচার ওগুলো। ফরওয়ার্ড শেল ম্যাগাজিনের দিকে এগোল ও। হঠাৎ নিরেট কি যেন একটা ধাক্কা মারল আইওয়াকে, বিশাল জাহাজটা ঝাঁকি খেল একটা। চারদিক থেকে মেঘের মত ধোঁয়া উঠছে। তাল সামলাবার জন্যে হাত দুটো ডানার মত শূন্যে মেলে দিল রানা।

সাতান মিসাইল দু'নম্বর গান টাওয়ারের ক্ষতি করেছে, কিন্তু ধ্বংস করতে পারেনি। স্টীল প্লেটিঙের ছয় জায়গায় গর্ত হয়েছে, কোথাও এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়নি। পোর্টের দিকের গান ব্যারেলের রিকয়েল বেসে মারাত্মক ফাটল ধরেছে। বাকি সব ঠিকই আছে।

কাঁচ ভাঙা ব্রিজের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আপন মনে হাসল কবীর চৌধুরী। ভাগ্য সহায়তা করছে তাকে। অবশিষ্ট মাত্র কয়েকটা স্টীল বাল্কহেডের একটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল সে, এই সময় আঘাত করে সাতান মিসাইল।

হাত বাড়িয়ে মাইক্রোফোনটা তুলে নিল সে। 'চার্লস, ক্যাপ্টেন বলছি। আমার গলা শুনতে পাচ্ছ?'

উত্তর নেই।

'চার্লস?' ভরাট গলায় হাঁক ছাড়ছে কবীর চৌধুরী। 'জবাব দাও, চার্লস! রিপোর্ট করো।'

ঘড়ঘড় করে উঠল স্পীকার। 'ক্যাপ্টেন ফক্স?' অপরিচিত কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ। তুমি কে? চার্লস কোথায়?'

'নিচে, ম্যাগাজিনে, স্যার। হোয়েস্ট ভেঙে গেছে, মি. চার্লস সেটা দেখতে গেছে। আমি টম, স্যার। মি. চার্লসের অ্যাসিসট্যান্ট।'

'কামান চালাতে জানো?'

'হ্যাঁ...মানে, কাজ চালিয়ে নিতে পারব, স্যার।'

'রিপোর্ট করো।'

'তিনটে কামানই লোড করা আছে,' বলল টম। 'ক্রুদের অবস্থা ভাল নয়, স্যার। প্রায় সবাই আহত হয়েছে। প্রায় সবার কান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে যাদের তারা বোধ হয় বেঁচে নেই।'

'কোত্থেকে বলছ তুমি?'

'টাওয়ারের অফিসার্স বুদ থেকে, স্যার। প্রচণ্ড গরম এখানে, স্যার। সবাই ঘামছি আর হাঁপাচ্ছি।'

'আমি আসছি,' বলল কবীর চৌধুরী। কিউ-ডি ভর্তি গোলাটা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছুঁড়তে চায় সে।

'কিন্তু বাইরের ডেকে হ্যাচটা বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভেঙে ডেবে গেছে, স্যার। আপনাকে ম্যাগাজিন হয়ে আসতে হবে, স্যার।'

'ধন্যবাদ, টম। স্ট্যাণ্ড বাই।'

জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল কবীর চৌধুরী। আর মাত্র কয়েক মিনিট। আমেরিকাকে ধ্বংস কর‌্যার বীজ ছড়াতে যাচ্ছে সে। সেই নিষ্ঠুর হাসিটা আবার দেখা গেল তার ঠোঁটে। ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে মাইক্রোফোনটা তুলে নিল সে।

'রেড মুন টু, কাম ইন।'

'ইয়েস, স্যার।'

'হোয়াইট হাউসের রেঞ্জ?'

'দুঃখিত, স্যার।'

'হোয়াট!' হুংকার ছাড়ল কবীর চৌধুরী

'খাকী ইউনিফর্ম পরা পুলিস, স্যার। ঘেরাও করে ফেলেছে আমাকে। গুড লাক, স্যার।'

মাইক্রোফোনের রিসিভারের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকল কবীর চৌধুরী। একজন অন্ধ ভক্তকে হারাল সে। কাঁধ ঝাঁকাল...কিছু করার নেই। বড় কোন কাজ করতে হলে কিছু লোককে হারাতেই হয়।

'ঝাড়ুদার,' ভারী গলায় বললেন জেনারেল হিগিনস। 'কবীর চৌধুরীর স্পটার ছদ্মবেশ নিয়ে একটা সুইপার কার চালাচ্ছিল। সিটি পুলিস এখন তাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে।'

'বোঝা গেল রোড ব্লকগুলো কিভাবে পেরিয়ে গেছে।'

এসব কিছুই যেন শুনছেন না প্রেসিডেন্ট। আইওয়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। স্ক্রীনে ছোট ছোট কালো রঙের মূর্তি দেখতে পাচ্ছেন তিনি, আড়াল থেকে দৌড়ে গা ঢাকা দিচ্ছে আড়ালে। এক এক করে গুনলেন, দশজন সীল সদস্য হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে জাহাজের ডেকে।

'ওদের জন্যে কিছুই করার নেই আমাদের?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন হিগিনস। 'তীর থেকে ফায়ার ওপেন করলে নিজেদের লোককেই মারা হবে। না মি. প্রেসিডেন্ট, ওদেরকে সাহায্য করার কোন উপায় নেই।'

'মেরিন অ্যাসল্ট টীম পাঠাতে অসুবিধে কি?'

'আইওয়ার পেছনের ডেকে হেলিকপ্টার নামলে মেশিনগানের গুলিতে একজনও বাঁচবে না। পঞ্চাশজন করে লোক আছে প্রত্যেক 'কপ্টারে।'

'জেনারেলের সাথে আমি একমত,' বললেন অ্যাডমিরাল মার্চ। 'সাতান আমাদেরকে দম ফেলার খানিকটা সময় দিয়েছে, যতদূর মনে হচ্ছে, দু'নম্বর গান টাওয়ার অকেজো হয়ে গেছে। সীলকে শত্রু নিধনের জন্যে খানিকটা সময় এখন দিতে পারি আমরা।'

চেয়ারে হেলান দিলেন প্রেসিডেন্ট। নিজের তিন পাশের বসা সহকর্মীদের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমরা তাহলে অপেক্ষা করব—এই বলতে চাইছেন আপনারা? চোখের সামনে ওই পর্দায় দেখছি আমাদের তরুণ ছেলেরা গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে—অথচ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব আমরা?'

'হ্যাঁ, স্যার,' উত্তর দিলেন জেনারেল হিগিনস। 'আপাতত বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই আমাদের।'

জাহাজের ডায়াগ্রাম দেখে নিয়ে ছুটল রানা। অন্ধকার একটা প্যাসেজে ঢুকল ও। তারপর অনেকগুলো অলিগলি পেরিয়ে একটা বাল্কহেড দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডায়াগ্রামে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুঠোর ভেতর মুচড়ে দলা পাকাল সেটাকে, ছুঁড়ে ফেলে দিল ডেকের ওপর। দরজার ওদিকেই প্রজেক্টাইল স্টোর।

দরজার গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে একটু একটু করে চাপ বাড়াল রানা। ঘড়ঘড় আওয়াজ করে খানিকটা ফাঁক হলো কপাট। ভেতরে আবছা আলো দেখা গেল। ভারী মেশিনারির ধাতব শব্দের সাথে মানুষজনের চেঁচামেচি শুনতে পেল ও। চেইন টানা-হেঁচড়া করার ঝনঝন শব্দ, তার সাথে ইলেকট্রিক মোটরের গুঞ্জন। শব্দগুলো ওপরের কোথাও থেকে আসছে বলে মনে হলো। সন্তর্পণে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা।

হোয়েস্ট টিউবের কাছে আর্মার-ভেদী শেলগুলো নিখুঁতভাবে সাজানো রয়েছে। দুটো হলুদ বালবের নিচে চোখা মাথাগুলো চকচক করছে। সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপরের ডেকে দু'জন নিগ্রো ক্রু হোয়েস্ট টিউবের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাতুড়ী দিয়ে এলিভেটর ক্রাডলের

গায়ে বাড়ি মারছে। বিস্ফোরণে ঝাঁকি খেয়েছিল আইওয়া, সেই ঝাঁকিতে নষ্ট হয়ে গেছে এলিভেটরের মেকানিজম। পিছিয়ে এল রানা। আড়ালে এসে পরীক্ষা করতে শুরু করল শেলগুলো। মোট একত্রিশটা রয়েছে। মাত্র একটার মাথা গোল। কিউ-ডি ভর্তি আরেকটা শেল নেই এখানে।

বেল্ট থেকে একটা টুল কিট নামাল রানা। টর্চটা জ্বেলে একটা উঁচু জায়গায় শুইয়ে রাখল সেটাকে। ওটার পাশেই রাখল কোল্ট অটোমেটিক। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল ও। আলতোভাবে ছুঁলো কিউ-ডি ভর্তি শেলের মাথাটা। হাতে লকিং স্ক্রুর স্পর্শ পেল ও। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলতে শুরু করল সেগুলো। প্যাঁচগুলো এঁটে বসে আছে, ঘোরাতে গিয়ে পেশীর সবটুকু জোর লাগাতে হলো ওকে।

মাথার ভেতর একটাই চিন্তা, দ্বিতীয় শেলটা যদি ইতিমধ্যে ছোঁড়া হয়ে গিয়ে থাকে, এত পরিশ্রম সব বৃথা যাবে। হঠাৎ শেষ স্ক্রুটা বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। শেলের নাকটা চলে এসেছে রানার দু'হাতে। সাবধানে সেটাকে এখন নামিয়ে রাখল ও। তারপর ওয়রহেডের ভেতরে তাকাল।

ভেতরে একটা এক্সপ্লোসিভ চার্জ রয়েছে। ওটা বিস্ফোরিত হলে ওয়রহেড ফেটে বেরিয়ে আসবে কিউ-ডি ভর্তি খুদে এক ঝাঁক বোমা। এক্সপ্লোসিভ চার্জের কানেকশনগুলো বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করল রানা। কাজটা বিপজ্জনক বা জটিল কিছু নয়। কিন্তু গভীর মনোযোগের সাথে কাজ করছে বলে হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে। রাডার অলটিমিটারের সাথে সংযুক্ত তারটা কেটে এক্সপ্লোসিভ ডিটোনেটরটা সরিয়ে আনল ও। পকেট থেকে বের করল একটা কাপড়ের থলে। তারপর ওয়রহেডের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল।

ভেতর থেকে অতি সাবধানে কিউ-ডি বোমাগুলো বের করে থলিতে ভরল রানা। ব্যাগটা হাতে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও। এগুলোর একটা বিহিত করা দরকার আগে। তারপর দ্বিতীয় কিউ-ডি শেলটার খবর নিতে হবে। নিজেকে এই বলে শান্ত করল, স্টোর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেও, এখুনি সেটা ছুঁড়বে না কবীর চৌধুরী। গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যে আর্মারভেদী শেলগুলো প্রথমে ছুঁড়বে সে, চরম আঘাতটা হানবে সবশেষে।

একহাতে কাপড়ের ব্যাগ ভর্তি কিউ-ডি বোমা, আরেক হাতে কোল্ট অটোমেটিক নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ওপরের ডেক থেকে হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল কবীর চৌধুরী, ভুরু কুঁচকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, ধীরে ধীরে একটা মুচকি হাসি ফুঠে উঠল তার ঠোঁটে—কিন্তু এসবের কিছুই জানতে পারল না রানা।

দু'হাজার ফুট ওপরে রয়েছে হেলিকপ্টার মিনার্ভা। সামান্য একটু দিক পরিবর্তন করল কর্নেল রেজনিক। জেফারসন মেমোরিয়ালকে পাশ কাটিয়ে ইণ্ডিপেনডেন্স অ্যাভিনিউয়ের সাথে সমান্তরালভাবে টাইডাল বেসিন পেরোল।

'ভিড়টা দেখছেন, স্যার?' অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে বলল সে। ইঙ্গিতে

ক্যাপিটল মল দেখাল। এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত চঞ্চল মৌমাছির মত গিজ গিজ করছে আর্মি হেলিকপ্টার।

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'দূরে সরে থাকো। এখন যা মেজাজ ওদের, প্রথমে গুলি করে নামাবে, তারপর প্রশ্ন করবে।'

'শেষবার কতক্ষণ আগে কামান দেগেছে আইওয়া?'

'প্রায় আঠারো মিনিট আগে।'

'দু'নম্বর গান টাওয়ার বোধহয় ধ্বংস করে দিয়েছে ওরা।'

'কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে নামছি না আমরা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ফুয়েলের অবস্থা?'

'চারঘণ্টা উড়তে পারব।'

সীটের ওপর নড়েচড়ে বসলেন অ্যাডমিরাল। 'ন্যাশনাল আর্কাইভ বিল্ডিঙের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে থাকো। আবার যদি কামান দাগে আইওয়া, ওটাই তার লক্ষ্য হবে।'

'ভাবছি মি. রানা কতটুকু কি করতে পারলেন···

উদ্বেগের কোন চিহ্ন দেখা গেল না অ্যাডমিরালের চেহারায়। 'বিপদের গুরুত্ব জানা আছে তার। তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছুই নেই আমাদের।' ঘাড় ফিরিয়ে আরেক পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি, কর্নেল যাতে তাঁর চোখে উদ্বেগের ছায়া দেখতে না পায়।

'উচিত ছিল আমার যাওয়া,' বলল রেজনিক। নির্ভেজাল মিলিটারি শো এটা। ট্রেনিং নেই এমন একজন সিভিলিয়ানের ঘাড়ে এই ভয়ঙ্কর দায়িত্ব চাপানো উচিত হয়নি।

'আর তোমার বোধহয় ট্রেনিং আছে, কর্নেল?'

'মাসুদ রানা একজন ইনভেস্টিগেটর হতে পারেন, অ্যাডমিরাল, কিন্তু আমি মিলিটারির লোক।'

হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'রানা সম্পর্কে তুমি দেখছি কিছুই জানো না!'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রেজনিক। 'মানে, স্যার?'

'রানা একজন অলরাউণ্ডার। আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স—তিনটেরই স্পেশাল, আই রিপিট, রিয়েলি স্পেশাল ট্রেনিং আছে ওর।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল রেজনিক। 'তার মানে, 'কপ্টার চালাতে জানেন তিনি?'

'শুধু 'কপ্টার নয়, আরও অনেক কিছু।'

'কিন্তু উনি যে বললেন···'

'জানি।'

বোকা বোকা হয়ে গেল রেজনিকের চেহারা। 'কিন্তু আপনি কিছু না বলে চুপ করে ছিলেন কেন তাহলে?'

'তোমার বউ ছেলে মেয়ে আছে। আমি, অনেক বুড়ো হয়ে গেছি। যুক্তির নির্দেশ মেনে নিজেকেই বেছে নিয়েছে রানা।'

অবাক হয়ে গেল রেজনিক। চেনা একটা মানুষকে এই মুহূর্তে আবার যেন নতুন করে চিনল সে। বুঝতে পারল কেন বেন নেলসন পীরের মত ভক্তি করে লোকটাকে। বিদেশী লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা অনুভব করল রেজনিক।

অন্ধকার থেকে রোদ ঝলমলে মেইন ডেকে বেরিয়ে এল রানা। থামল। ভাল করে দেখে নিল চারদিক। পিছনের ফায়ার কন্ট্রোল ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। দু'নম্বর গান টাওয়ারের সামনের অংশ এটা। মেশিনগান, অটোমেটিক রাইফেল আর রিভলভারের মুহুর্মুহু আওয়াজ শুনতে পেল ও। কিন্তু সেদিকে মন দিল না, প্রথমে খুদে কুইক-ডেথ অ্যাম্পুলগুলোর একটা গতি করতে চায়। হাতছানি দিয়ে ডাকছে নদী। ডেকের কিনারার দিকে সতর্ক পায়ে এগোল ও। কিনারা থেকে বিশ ফুট দূরে রয়েছে এখন ও, এই সময় কালো রাবারের ওয়েট স্যুট পরা এক লোক টাওয়ারের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ওর সামনে। অটোমেটিক রাইফেলটা রানার বুকে তাক করল কোহেন। ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল।

আহত হিংস্র পশুর মত চেহারা হয়েছে লেফটেন্যান্ট কোহেনের। কবীর চৌধুরীর লোকেরা তার টীমের অর্ধেকের বেশি লোককে মেরে ফেলেছে। রক্তক্ষরণের ফলে তার অবস্থা কাহিল। রানাকে চেনে না সে, চিনতে চায়ও না। নিজের লোক ছাড়া যাকে দেখবে তাকেই গুলি করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

দশ ফুট দূর থেকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। কথা বলল না কেউ। পিস্তল ধরা বাঁ হাতটা নেড়ে পথ থেকে সরে যাবার নিঃশব্দ ইঙ্গিত করল রানা। তারপর এগোল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল কোহেন। লোকটার আচরণের মধ্যে অদ্ভুত একটা কাঠিন্য আর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। পরমুহূর্তে গুলি করল কোহেন রানার বুক লক্ষ্য করে। সিঙ্গেল শট।

গুলি হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই স্যাঁত করে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা। সেই সাথে গর্জে উঠল ওর হাতের কোল্ট। বাঁ হাতের ফুটো তালু দিয়ে ডান হাতের কনুই চেপে ধরল কোহেন। হাত থেকে ঠকাস করে পড়ে গেল অটোমেটিক। গুঁড়ো হয়ে গেছে তার কনুইয়ের হাড়।

এগোল রানা। পা দিয়ে লাথি মেরে সরিয়ে দিল অটোমেটিকটা কোহেনের নাগালের বাইরে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে সে, তাকে পাশ কাটিয়ে কিনারার দিকে এগোল রানা।

কিনারায় দাঁড়িয়ে থলে সহ কুইক-ডেথ ভর্তি খুদে বোমাগুলো নদীতে ফেলে দিল ও।

ঘুরে দাঁড়াল, এবং ছুটল। মহামারীর বীজ ভর্তি আরেকটা প্রজেক্টাইল অকেজো করতে হবে ওকে।

আট

বিশাল গান হাউসের ভেতর রক্তের মিষ্টি গন্ধের সাথে মিশে রয়েছে বারুদ আর উত্তপ্ত তেলের কটূ গন্ধ। বিস্ময় আর আতঙ্ক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ক্রুরা। চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে ওদের। চেহারায় ভীত বিমূঢ় ভাব। অন্যান্যরা ভারী মেশিনারির মাঝখানে বিচিত্র ভঙ্গিতে পড়ে আছে। যারা বেঁচে আছে, মরণের পথে রয়েছে তারা, ব্যথায় গোঙাচ্ছে। কিন্তু সাহায্য করার কেউ নেই এখানে। কবীর চৌধুরীর নির্দেশে সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত।

তিন নম্বর কামানে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে সেটা ব্যবহার করা হবে না। ওটায় রয়েছে আর্মার-ভেদী শেল। বাকি দুটোর মধ্যে একটায় রয়েছে কিউ-ডি ভর্তি প্রজেক্টাইল।

অফিসার্স ফায়ারিং বুথের সামনে 'ফায়ার' বাটন নিয়ে বসে রয়েছে চার্লস। কবীর চৌধুরীর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে সে।

গান হাউসের ফ্রন্ট ব্রিজ থেকে সবাইকে ডেকে নিয়েছে কবীর চৌধুরী। প্রত্যেককে কড়া নির্দেশ দিয়ে বলেছে, এখানে যাই ঘটুক না কেন, কেউ যেন নিজের কাজ থেকে মুখ না তোলে। ফ্রন্ট ব্রিজ থেকে গান হাউসে ঢোকার দরজাটা হাঁ-হাঁ করছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভেতরে কাউকে দেখতে পাবে না রানা।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রানার জন্যে অপেক্ষা করছে কবীর চৌধুরী। হাতে একটা ওয়ালথার। রানার প্রিয় অস্ত্র। অনেক দিন থেকেই নিজের কাছে এটা রেখে দিয়েছে কবীর চৌধুরী। ওরই প্রিয় অস্ত্রের আঘাতে রানার ভবলীলা সাঙ্গ করতে চায় সে।

আর কয়েক মুহূর্ত পর আসবে রানা। আসবেই, জানে সে। দ্বিতীয় শেলটা অকেজো না করে আইওয়া ত্যাগ করবে না ও।

আমেরিকাকে ধ্বংস করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে সে। এখন শুধু ফায়ারিং বাটনে চাপ দেয়া বাকি। রানার সাথে বোঝা-পড়া শেষ করেই চার্লসকে নির্দেশ দিতে পারে সে। ব্যস, তাহলেই পূর্ণ হবে তার প্রতিশোধ। আপন মনে হাসল কবীর চৌধুরী। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চমৎকার একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে সে। আমেরিকা তাকে ঠকিয়েছে, আমেরিকার শত্রুর খরচে তাকে উচিত সাজা দিয়ে কেটে পড়তে যাচ্ছে সে। আইওয়ার পাশেই, মাত্র বিশ গজ দূরে তার জন্যে অপেক্ষা করছে একটা টু-সীটার খুদে সাবমেরিন স্নরকেল। ওটাই তাকে সাগরে নিয়ে যাবে। কেউ টের পাবে না। সাগরে অপেক্ষা করছে বড় সাবমেরিন, তাতে চড়ে ভোঁ হয়ে যাবে সে গোটা উত্তর আমেরিকাকে তিনশো বছরের জন্যে মৃত্যুশয্যায় শুইয়ে দিয়ে।

হঠাৎ কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল কবীর চৌধুরীর। ফ্রন্ট ব্রিজে পায়ের

আওয়াজ!

সিঁড়ি বেয়ে ব্রিজে উঠে এল রানা। খানিক আগে এখানে কাজ করছিল দু'জন নিগ্রো, তারা এখন নেই। গান হাউসের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল ও। ভেতরে আলো জ্বলছে। ইলেকট্রিক মোটরের গুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠছে ভারী মেশিনারির কর্কশ ধাতব শব্দ। এসবের মাঝখানে শোনা যাচ্ছে ক্রুদের শোরগোল। কিন্তু ভেতরে কাউকে দেখতে পেল না ও।

দরজার চৌকাঠ টপকে ভেতরে ঢুকল রানা। দ্রুত এগোল কামানের দিকে। দশ গজও এগোয়নি, এই সময় পিছন থেকে গুলি হলো। মৃদু একটা ঝাঁকি খেল রানা, শার্টের আস্তিন ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। গুলির আওয়াজের পরপরই ভরাট গলা শোনা গেল কবীর চৌধুরীর। 'না, ঘুরো না। হাতের ওটা ফেলো আগে। মাথার ওপর হাত তোলো। তারপর ঘুরে দাঁড়াও।'

স্থির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল রানা।

'লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'তোমার শার্টের আস্তিন ফুটো করার জন্যেই করা হয়েছিল গুলিটা। তোমাকে যদি কখনও খুন করি, তোমার চোখে চোখ রেখেই গুলি করব। তবে যদি বাধ্য করো, সে কথা আলাদা। ফেলো পিস্তল।'

কোল্ট ছেড়ে দিল রানা, ঠকাস করে শব্দ হলো পায়ের কাছে। মাথার ওপর হাত তুলল ও। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল।

সরে গিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে কবীর চৌধুরী। সেই নিষ্ঠুর হাসিটা ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। 'মার্কিনীদের জন্যে এত দরদ কিসের তোমার, শুনি? দুনিয়ার প্রায় সমস্ত সমস্যার জন্যে সুপারপাওয়ারগুলোই তো দায়ী। তাদের দালালী করছ...তাতে অবশ্য আমার কোন আপত্তি নেই—কিন্তু, তোমাকে যতটুকু চিনি, তাতে এমন কি আমারও মনে হয়, এই দালালের ভূমিকায় তোমাকে মানাচ্ছে না।'

কঠিন দৃষ্টি ফুটে উঠল রানার চোখে। এরই মধ্যে দূরত্বটা আন্দাজ করে নিয়েছে ও। দশ গজ। লাফ দিয়ে পৌঁছনো অসম্ভব, তার আগেই কবীর চৌধুরী গুলি করবে। 'কিউ-ডি ভর্তি শেলটা কোথায়?'

'হ্যাঁ,' মৃদু হাসল কবীর চৌধুরী। 'তোমার এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।' তারপর চুপ করে থাকল সে।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'কোথায়?'

'কামানের ভেতর,' শান্তভাবে বলল কবীর চৌধুরী। 'ফায়ারিং বাটনে আঙুল ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে আমার লোক। আমি নির্দেশ দিলেই চাপ দেবে বোতামে। এখুনি দেব নির্দেশ? নাকি আমেরিকার এতবড় সর্বনাশ নিজের চোখে দেখতে চাও না তুমি? ভেবে দেখো। তুমি চাইলে আগে তোমাকে শেষ করে তারপর নির্দেশ দিই। কি?'

শিউরে উঠল রানা। 'তাতে গোটা মহাদেশটা বিরান হয়ে যাবে, তুমি জানো?'

'অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কটের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য আদায় করে নিয়েছি আমি। তুমি যতটা জানো, আমি তার চেয়ে কম জানি না।'

'জানো তাহলে? কোটি কোটি মানুষকে খুন করতে যাচ্ছ তুমি, ওরা তোমার

কোন ক্ষতি করেনি—তবু…'

অকস্মাৎ প্রচণ্ড অট্টহাসিতে বিস্ফোরিত হলো কবীর চৌধুরী। কিন্তু চোখের দৃষ্টি আর পিস্তলের নল রানার দু'চোখের মাঝখান থেকে একচুলও নড়ল না।

ধীরে ধীরে হাসি থামাল কবীর চৌধুরী। 'নীতিবাক্য, কেমন? এই জিনিসটা তোমাকে ছাড়ল না দেখছি। সে যাক, কেমন বোধ করছ তাই বলো। বুঝতেই পারছ, আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বেঁচে আছ তুমি। আজ তোমাকে বাঁচাবার জন্যে সোহানা নেই।…আর যদি মনে করো আমার হাতে মারা গেলে শহীদ হবে তুমি…'

'কিউ-ডি প্রজেক্টাইল বিস্ফোরিত হলে তুমিও বাঁচবে না,' বলল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে ও। সত্যিই কি কামানের ভেতর রয়েছে কিউ-ডি শেলটা?

'এত বোকা তুমি আমাকে মনে কোরো না,' বলল কবীর চৌধুরী। 'আমি যে পালাবার উপায় ঠিক করে রেখেছি, অনুমান করতে অসুবিধে হবার কথা নয় তোমার।' রানার মাথার ওপর দিয়ে ফায়ারিং বুথের দিকে তাকাল সে। হাঁক ছাড়ল একটা, 'চার্লস?'

'ইয়েস, স্যার।'

রানার চোখে চোখ রাখল কবীর চৌধুরী। 'একটা কথা। আমি চাই না ভুল ধারণা নিয়ে বিদায় নাও তুমি। ভেব না হঠাৎ তোমাকে পেয়ে গেছি, তাই ঝামেলা চুকিয়ে ফেলছি। ওরা আমার দশ বিলিয়ান ডলারের চেকটা আটকে দিয়েছে, সেজন্যে তুমিও কম দায়ী নও। তাই খরচের খাতায় তোমার নামটাও টুকে রেখেছিলাম আমি। এখানে এসে তুমি আমার সময় বাঁচিয়ে দিয়েছ, সেজন্যে তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত। তুমি না এলে আমিই যেতাম তোমার কাছে।' থামল চৌধুরী, পরমুহূর্তে হুংকার ছাড়ল সে, 'ফায়ার!'

জানে দেরি হয়ে গেছে, তবু কোল্ট অটোমেটিকটা পায়ে ঠেকতেই ডাইভ দিল রানা। গর্জে উঠল কবীর চৌধুরীর হাতের রিভলভার। সেই সাথে দুলে উঠল আইওয়া।

কিউ-ডি ভর্তি প্রজেক্টাইল বেরিয়ে গেল কামানের ব্যারেল থেকে।

স্টারবোর্ড দিকের ব্যারেল থেকে বেরিয়ে আর্মার-ভেদী প্রজেক্টাইল তার ক্ষমতার শীর্ষে ওঠার পর ক্রমশ নামতে শুরু করল ন্যাশনাল আর্কাইভ বিল্ডিঙের দিকে। লাইমস্টোনের তৈরি গম্বুজের দেয়াল ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে গেল ওয়রহেড। একটুর জন্যে বই আর রেকর্ড-পত্রের একুশটা স্তম্ভ রক্ষা পেল। এগজিবিশন হলের গ্র্যানিট পাথরের মেঝেতে বিস্ফোরিত হলো শেলটা। বিস্ফোরণের জায়গা থেকে মাত্র দশ গজ দূরে রয়েছে কাঁচের কেসে ঢাকা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। পাথরের মেঝেতে গর্ত হলো একটা, চারদিকে সৃষ্টি হলো গভীর ফাটল। কাঁচের কেসটাকে একটা ফাটল মাত্র দু'ইঞ্চির জন্যে ছুঁতে পারল না।

দু'নম্বর শেলটায় রয়েছে কুইক-ডেথের বীজ।

খুদে জেনারেটরের সাহায্যে কুইক-ডেথ প্যাকেজের ভেতর রাডার অলটিমিটার চালু হয়ে গেছে, নিচের মাটিতে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করেছে সেটা,

তির্যকভাবে পতনের মাত্রা এবং পরিমাণ রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। ওয়রহেডটা নামছে তো নামছেই, তারপর মাটি থেকে পনেরশো ফুট ওপরে থাকতে একটা প্যারাস্যুট খুলে গেল। নীল আকাশের গায়ে জ্বলজ্বলে কমলা রঙের ছাতা মেলে ধরল যেন কেউ।

ওয়াশিংটন। রাস্তা থেকে অনেক নিচে প্রেসিডেন্ট এবং তার উপদেষ্টারা অনড় বসে রয়েছেন যাঁর যাঁর চেয়ারে। ভিউইং স্ক্রীনে তাকিয়ে চোখ পিট পিট করে দেখছেন ধ্বংসের বীজ ভর্তি প্রজেক্টাইলটা ধীর গতিতে নেমে আসছে। স্তব্ধ, হতভম্ব হয়ে গেছেন তাঁরা, নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। দুর্বল অসহায় বোধ করছেন, কিন্তু এখনও তাঁদের মনে ক্ষীণ আশা, ওয়রহেডের ভেতরের মেকানিজমটা কোন ভাবে হয়তো অচল হয়ে যাবে, ফাটবে না বোমাটা, অক্ষত অবস্থায় হয়তো রাজধানীর কোন বাগানে এসে নামবে।

কিন্তু খানিক পরই অস্থিরতা দেখা দিল সবার মধ্যে।

উত্তর দিক থেকে হালকা বাতাস বইতে শুরু করল। প্যারাস্যুটটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন বিল্ডিঙের দিকে।

এরই মধ্যে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে রাজধানীর সমস্ত রাজপথ। লিংকন মেমোরিয়াল আর ন্যাশনাল আর্কাইভ বিল্ডিং দুটোকে ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনী। চারদিকে শুধু মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে, তিল ধারণের স্থান নেই কোথাও। তারপর আকাশের দিকে চোখ পড়ল সবার। লক্ষ লক্ষ হাত তুলে একজন আরেকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে প্যারাস্যুটের দিকে।

কনফারেন্স টেবিলে চরম উত্তেজনা। সবার আগে বিস্ফোরিত হলেন জেনারেল হিগিনস। স্ক্রীন থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন তিনি। প্রলয় নেমে আসছে রাজধানীর বুকে, তা ছড়িয়ে পড়বে গোটা মহাদেশে। থরথর করে কেঁপে উঠলেন তিনি। দু'হাত দিয়ে মাথার চুল খামচে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'শেষ!' কর্কশ শোনাল তাঁর গলা 'আমরা শেষ হয়ে গেলাম!'

'কিছুই কি করার নেই আমাদের?' স্ক্রীনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল হিগিনস। শরীরের দু'পাশে হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকিয়ে গেছে। 'গুলি করে ধুলো করে দেয়া যায় ওটাকে, এক সেকেণ্ডও লাগবে না। কিন্তু বীজানুগুলো ছড়িয়ে পড়বে তাতে। এছাড়া আর কি করার আছে, আমি জানি না!'

ডেভিড মরগান দেখলেন, প্রেসিডেন্টের চোখে উপলব্ধির একটা উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল। তিনিও বাস্তবের কাছে মাথা নত করছেন, উপলব্ধি করছেন পথের শেষে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। এ অসম্ভব, ঘটতে পারে না, মেনে নেয়া যায় না, কিন্তু তবু সত্যি। লক্ষ-কোটি মানুষের মৃত্যুর শুরু আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার, মাত্র অল্প কয়েকশো ফুট দূরে।

প্যারাস্যুটের দিকে একাগ্র মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছেন সবাই। স্ক্রীনের এক কোণে ছোট্ট একটা কালো বিন্দু ফুটে উঠল, কিন্তু প্রথমে সেটা কারও চোখেই

পড়ল না। একটু একটু করে আকারে বড় হচ্ছে বিন্দুটা। প্রথমে ওটাকে দেখতে পেলেন অ্যাডমিরাল মার্চ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ভুরু কুঁচকে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, যেন লেযার রশ্মি বের করছেন চোখ দুটো থেকে। এতক্ষণে আর সবাইও দেখতে পেল বিন্দুটাকে। আকার দেখে বোঝা গেল ওটা একটা হেলিকপ্টার। সোজা তীরবেগে ছুটে আসছে ওয়রহেডের দিকে।

'হোয়াট ইন গডস্ নেম...' শুরু করলেন জেনারেল হিগিনস।

'সেই 'কপ্টারটাই না? আইওয়ার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল যেটা? হ্যাঁ, সেটাই।' অ্যাডমিরাল বললেন।

'এবার হারামজাদাকে উচিত সাজা দেব,' কমিউনিকেশন রিসিভারের দিকে হাত বাড়ালেন জেনারেল হিগিনস।

রোদ লেগে ঝলমল করছে হেলিকপ্টারের গা। আকারে আরও বড় হলো সেটা। গায়ে লেখা বড় বড় অক্ষরগুলো পড়া গেল এবার।

'নুমা,' বললেন অ্যাডমিরাল মার্চ। 'তার মানে ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সীর 'কপ্টার ওটা।'

দুহাতে মুখ ঢেকে বসে ছিলেন ডেভিড মরগান। হাত নামিয়ে এর-তার দিকে উদভ্রান্তের মত তাকালেন তিনি, যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলেন। 'নুমা? কে বলল নুমা?'

'স্ক্রীনে তাকান।'

তাকালেন মরগান। পরমুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন তিনি।

'হারামজাদাকে নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ দিচ্ছি,' মুখের সামনে রিসিভার তুললেন জেনারেল হিগিনস। 'গ্রাউণ্ড ট্রুপসকে বলো...'

বোবা হয়ে গেছেন মরগান। চেঁচিয়ে উঠে নিষেধ করতে চাইলেন, কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না। ছুটলেন তিনি।

কিন্তু তার দরকার ছিল না।

'না,' মৃদু গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট।

'স্যার?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন হিগিনস।

'যা করছে করুক ওরা,' বললেন প্রেসিডেন্ট। উপস্থিতদের মধ্যে একমাত্র তিনিই জানেন নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিলার জর্জ হ্যামিলটন কোন কাজে হাত দিলে কাজটার সমস্ত দিক বিবেচনা করেই দেন। তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থা রাখেন প্রেসিডেন্ট।

মাঝপথে থমকে দাঁড়ালেন মরগান। প্রেসিডেন্টের কথা শুনে স্বস্তি বোধ করলেন তিনি। নুমার সাথে মাসুদ রানার একটা যোগাযোগ হয়েছে, জানা ছিল তার। স্ক্রীনের 'কপ্টারটার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, এসবের পিছনে নিশ্চয়ই মাসুদ রানার কোন ভূমিকা আছে। ক্ষীণ একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন যেন তিনি।

দ্রুত কমে আসছে 'কপ্টার আর ওয়রহেডের ব্যবধান।

উজ্জ্বল কমলা রঙের প্যারাস্যুটের দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটল মিনার্ভা। কিন্তু শেষ রক্ষা

হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে কর্নেল রেজনিকের মনে।

কুইক-ডেথ ওয়রহেডের পতনের ধারা হিসেব করতে ভুল করেছিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন এবং রেজনিক। ন্যাশনাল আর্কাইভ বিল্ডিঙের মাথার ওপর হেলিকপ্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রেজনিক, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে খুলে গেল প্যারাস্যুট। মাঝখানে দূরত্ব ছিল তখন সিকি মাইল। মহা মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড নষ্ট হলো 'কপ্টারের নাক ঘোরাতে গিয়ে। তারপর ছুটল হেলিকপ্টার। কয়েক ঘণ্টা আগে রানা যে পরামর্শটা দিয়ে রেখেছে, সেটাই কাজে লাগাতে যাচ্ছে ওরা এখন।

'বারো সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল!' কেবিনের দরজা থেকে চাপা উত্তেজনার সাথে বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

আর আঠারো সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হবে ওয়রহেড। মাটি থেকে এক হাজার ফুটের মাথায়।

'হুক আর উইঞ্চে আমি রেডি হয়ে আছি,' বললেন অ্যাডমিরাল।

দ্রুত এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রেজনিক। 'বড় বেশি ঝুঁকি, স্যার। যা কিছু করার একবারের চেষ্টায় করতে হবে। গুঁতো মারতে চাইছি আমি। আর কোন উপায় নেই। প্যারাস্যুটের রশি আটকে নিয়ে উঠে যাবার চেষ্টা করব।

শিউরে উঠলেন অ্যাডমিরাল। সেই সাথে রেজনিকের বেপরোয়া দুঃসাহস মুগ্ধ করল তাঁকে। 'কিন্তু রোটর ব্লেডে রশি জড়িয়ে যাবে...'

'একটা মাত্র সুযোগ পাব আমরা...মাত্র একবার...' বিড় বিড় করে বলল রেজনিক।

কথা যোগাল না অ্যাডমিরালের মুখে। দ্রুত এগিয়ে এসে কো-পাইলটের সীটে বসলেন তিনি। ব্যস্ত হাতে সীট-বেল্ট বেঁধে নিলেন।

উইণ্ডশিল্ডের সামনে ঝুলছে ওয়রহেড। গরল ভর্তি নীল রঙের লম্বাটে একটা মোড়ক। জোড়া টারবোশ্যাফট্ এঞ্জিনের থ্রটল ঠেলে দিল রেজনিক, একই সাথে টেনে পিছিয়ে আনল পিচ-কন্ট্রোল কলাম।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল মিনার্ভার গতি। ঝাঁকিটা সামলে নিয়ে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন, 'ছয় সেকেণ্ড।'

প্রকাণ্ড প্যারাস্যুটের ছায়া পড়ল 'কপ্টারের গায়ে। স্টারবোর্ড সাইডে সামান্য কাত্ হয়ে গেল 'কপ্টার, একটু দিক বদল করল রেজনিক।

দ্রুত এগিয়ে আসছে প্যারাস্যুটের মোটা রশিগুলো। মিনার্ভার সরু নাক ঢুকে গেল রশির ভিড়ে। কমলা সিল্ক চুপসানো বেলুনের মত নেতিয়ে পড়ল উইণ্ডশীল্ডের ওপর, ঢাকা পড়ে গেল সূর্য সহ সামনের সমস্ত আকাশ। তিনটে রশি পেঁচিয়ে গেল রোটর শাফটের সাথে, কিন্তু পট্ পট্ করে ছিঁড়ে গেল সেগুলো। বাকি রশিগুলো ফিউজিলাজের সাথে জড়িয়ে গেল। টান পড়ল রশিতে। ঝাঁকি খেয়ে প্রায় স্থির হয়ে গেল মিনার্ভা। ভারী প্রজেক্টাইল এখন 'কপ্টারের সাথে ঝুলছে।

'দু'সেকেণ্ড!' অ্যাডমিরালের দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ বেরিয়ে এল।

ভারী শেলটা নিচের দিকে টানছে মিনার্ভাকে। পিচ কন্ট্রোল কলামের সাহায্যে

'কপ্টারকে প্রায় লেজের ওপর খাড়া দাঁড় করিয়ে রেখেছে রেজনিক। বিরতিগুলোয় না থেমে পিছিয়ে আনল থ্রটল। পরমুহূর্তে হাতের দ্রুত এক ঝাপটা মেরে টান দিল কালেকটিভ পিচ লিভার।

এঞ্জিন দুটো তাদের শেষ শক্তি বিন্দু দিয়ে লড়ছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সেকেণ্ড গোনার কাজ ছেড়ে দিয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। সময় পেরিয়ে গেছে আঙুলের ফাঁক গলে। এক হাজার ফুটের ঘরে থরথর করে কাঁপছে অলটিমিটারের কাঁটা। খোলা একটা জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়ে তাকালেন তিনি। পত্ পত্ করে উড়ছে কমলা সিল্কের প্রান্ত। ওটাকে ছাড়িয়ে নিচে নেমে গেল দৃষ্টি। ফিউজিলাজের নিচে ঝুলছে ওয়রহেড। যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে। একটা ঢোক গিলে মাথাটা টেনে নিলেন ভেতরে।

দ্রুত বাতাস কাটছে মিনার্ভার রোটর ব্লেডগুলো। প্যারাস্যুট, প্রজেক্টাইল আর ওয়রহেড একসাথে ঝুলছে।

ভয়ে ভয়ে অলটিমিটারের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। স্থির হয়ে আছে কাঁটা, একচুল নড়ছে না। তাঁর ঘন ভুরুর ভেতর চকচক করছে ঘাম।

দশ সেকেণ্ড নয়, অ্যাডমিরালের মনে হলো দশ বছর ধরে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে মিনার্ভা। ওদিকে মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা সরিয়ে দিয়ে কন্ট্রোলের সাথে যুদ্ধ করছে রেজনিক। নিজেকে এই প্রথম অক্ষম অসহায় বোধ করছেন অ্যাডমিরাল।

'ওঠো, দোহাই লাগে, ওঠো,' রেজনিকের আবেদনের সুরটা কেঁপে গেল।

সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল অলটিমিটারের কাঁটার দিকে। হঠাৎ মনে হলো, এক হাজার ফুট লেখা চিহ্নের ওপর এক চুলের দশভাগের এক ভাগ ওপরে উঠল কাঁটাটা। দ্রুত এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। না, নিশ্চয়ই ভুল দেখেছেন তিনি, চোখের ভুল··· কিন্তু ওই যে! আবার! সন্দেহ নেই আর, কাঁটাটা নড়ছে। একটু একটু।

'আমরা উঠছি,' রুদ্ধ গলায় বললেন তিনি।

রিপোর্ট শুনল রেজনিক, জবাব দিল না।

ওঠার গতি বাড়ছে ক্রমশ। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল অলটিমিটারের দিকে। এখনও যেন সংশয়মুক্ত হতে পারছেন না।

করফারেন্স রুমের ওঁরা সবাই ঝির ঝিরে শান্তির পরশ অনুভব করলেন। জীবনে তাঁরা কেউ এত আনন্দ পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। এমন কি যার মুখে হাসি দেখা যায় না বললেই চলে, সেই জেনারেল কার্ট হিগিনসও বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছেন। দম বন্ধ করা উত্তেজনাকর পরিবেশ, কেয়ামতের অশুভ কালো হাতছানি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। মিনার্ভা টেনে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের বীজ ভর্তি ওয়রহেড, সেদিকে তাকিয়ে হাসছেন সবাই, দু'একজন হাততালি দিয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছেন।

নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছে মিনার্ভা।

চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়লেন প্রেসিডেন্ট। একটা সিগার ধরালেন

তিনি। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ডেভিড মরগানের দিকে তাকালেন, বললেন, 'নুমা কাজটা করতে পারবে, তা তুমি বুঝলে কিভাবে?'

'বুঝিনি, স্যার,' বললেন মরগান। 'আন্দাজ ক'রছিলাম।'

'আন্দাজই বা করো কিভাবে? অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে চেনো, পরিচয় আছে?' অ্যাডমিরাল সম্পর্কে কেউ তেমন কিছু জানে না, অন্তত কারও জানার কথা নয়, প্রেসিডেন্ট তাই পরীক্ষা করছেন মরগানকে।

'না, স্যার। তবে, মাসুদ রানাকে চিনি—অবশ্য মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পরিচয় হয়েছে তার সাথে। অনেক কথা জানি তার সম্পর্কে। বাংলাদেশের লোক। কবীর চৌধুরীর এক নম্বর দুষমন। নুমার সাথে কি যেন একটা সম্পর্ক আছে তার।'

ক্ষীণ একটু ভুরু কুঁচকে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আচ্ছা!'

ফোনের রিসিভার তুললেন অ্যাডমিরাল মার্চ। 'নুমা 'কপ্টারের সাথে কানেকশন দাও!' অর্ডার করলেন তিনি।

'বিপদ কিন্তু কাটেনি এখনও,' বললেন হিগিনস। 'খুব বেশিক্ষণ আকাশে থাকতে পারবে না ওরা।'

ভিউইং স্ক্রীনের পাশের একটা স্পীকার থেকে জানানো হলো, 'কানেকশন পাওয়া গেছে।'

নিজের ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল মার্চ। মিনার্ভার দিকে চোখ, হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন রিসিভার। 'জয়েন্ট চীফসের অ্যাডমিরাল টিমোথি মার্চ বলছি, নুমা 'কপ্টার, প্লীজ পরিচয় দিন।'

স্পষ্ট এবং শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল স্পীকারে। 'জর্জ হ্যামিলটন, মার্চ। কি চাও তুমি?'

দ্রুত সিধে হয়ে বসলেন প্রেসিডেন্ট। 'জর্জ নিজে?'

মাথা ঝাঁকালেন মার্চ। রিসিভারে বললেন, 'কি চাই? কি চাই মানে? তুমি জান না কি চাই আমরা?'

'ঠিক যা চাইছ, যা চাওয়া উচিত, আমরা তাই করছি,' মিনার্ভা থেকে ভেসে এল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের শান্ত গলা। 'ভাল কথা, কুইক-ডেথ ওয়রহেডের বিপদ সম্পর্কে জানো তুমি?'

'জানি।'

'তাহলে তো বুঝতেই পারছ, কি করতে যাচ্ছি আমরা।'

'ব্যাখ্যা কর।'

'পাঁচ হাজার ফুট ওপরে উঠে যাচ্ছি আমরা,' স্পীকারে ভেসে আসছে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের শান্ত কণ্ঠস্বর। 'তারপর আমি আর কর্নেল রেজনিক সাগরের দিকে যাব। ফুয়েল যতক্ষণ থাকবে, যেতেই থাকব আমরা। তারপর ওয়রহেডটা ফেলে দেব পানিতে—তীর থেকে যতদূরে সম্ভব।'

'ঠিক কত দূর, বলতে পার?'

কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। রেজনিকের সাথে আলোচনা করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ডেলাওয়্যার কোস্টলাইন থেকে পুব দিকে প্রায় ছয়শো মাইল।'

'শক্তভাবে আটকে আছে প্রজেক্টাইল? পড়ে যাবার ভয় নেই?'

'মনে হয় না। ভালভাবেই পেঁচিয়েছে রশিগুলো,' বললেন হ্যামিলটন। 'তবে পুরোপুরি ইন্সট্রুমেন্টের ওপর ভরসা না করতে হলে ভাল হত। অন্তত···প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হতাম না আমরা।'

'কি! মানে? আবার বল।'

'প্যারাস্যুটের কাপড়,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'আমাদের উইণ্ডশিল্ড ঢেকে দিয়েছে। আমরা শুধু সোজা নিচের দিকটা দেখতে পাচ্ছি।'

'সাহায্য করতে পারি আমরা?'

'অবশ্যই,' দ্রুত বললেন হ্যামিলটন। 'আমাদের পথ থেকে সমস্ত সামরিক আর বাণিজ্যিক ফ্লাইট ট্রাফিককে দূরে সরে থাকতে বলো।'

'ধরে নাও তোমার নির্দেশ কার্যকরী করা হয়েছে,' বললেন মার্চ। 'সেই সাথে আমি একটা উদ্ধারকারী জাহাজ পাঠাচ্ছি, তোমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করবে।'

'লাভ নেই, মার্চ। তোমাদের ইচ্ছাটা রেজনিক আর আমার জন্যে আনন্দদায়ক, কিন্তু কাজটা হবে বিপজ্জনক, শুধু শুধু কিছু লোক মারা যাবে। ওদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন মানে হয় না।' একটু বিরতি নিলেন। 'বুঝেছ, মার্চ?'

সাথে সাথে উত্তর দিতে পারলেন না মার্চ। তাঁর দু'চোখে ঘনিয়ে এল গভীর বিষাদ। 'বুঝেছি,' প্রায় ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'বুঝেছি, জর্জ। মার্চ আউট।'

ঝাড়া পনেরো সেকেণ্ড একটা শব্দ করল না কেউ। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনার সাথে মিশে রয়েছে অবিশ্বাসের সুর। 'ওঁদেরকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল মার্চ। 'তিক্ত সত্য হলো, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন এবং কর্নেল রেজনিক আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। ফুয়েল শেষ হয়ে গেলে হেলিকপ্টারটা সাগরে ডুবে যাবে। পানি থেকে এক হাজার ফুট ওপরে থাকতে বিস্ফোরিত হবে ওয়রহেড, বেরিয়ে আসবে কুইক-ডেথ জীবানু। বাকিটা আমরা অনুমান করে নিতে পারি।'

'কিন্তু কাপড়টা কেটে ফেলতে পারেন না ওঁরা?' বললেন মরগান। 'তারপর ওয়রহেডটা ফেলে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারেন না?'

'অ্যাডমিরাল মার্চের বক্তব্য বুঝতে পারছি,' বললেন জেনারেল হিগিনস। 'উত্তরটা ভিউইং স্ক্রীনে রয়েছে। প্যারাস্যুটটাই কাল হয়েছে 'কপ্টারের। রোটরের গোড়ায় পেঁচিয়ে গেছে রশিগুলো, কয়েকটা ঝুলছে কার্গো দরজার উল্টো দিকে। 'কপ্টারটাকে শূন্যে দাঁড় করিয়েও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ওই ওপরে একটা ছুরি নিয়ে ওঠা—কোন ভাবেই নাগাল পাবে না সে।'

'হেলিকপ্টার সাগরে পড়ার আগে ঝাঁপ দিয়ে পানিতে পড়তে পারবেন না ওঁরা?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন জেনারেল রড। 'অন্যান্য এয়ারক্রাফটের মত নুমার 'কপ্টারে অটোমেটিক কন্ট্রোল সিস্টেম নেই। পানিতে লাফিয়ে পড়লে ওঁদের

গায়ের ওপরই পড়বে মিনার্ভা।'

'শূন্যে থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করাও সম্ভব নয়। ঝুঁকি নিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে—হয়তো। কিন্তু আমার মনে হয় লাভ হবে না কোন।'

'তার মানে কিছু করার নেই আমাদের?' হতাশায় বিকৃত শোনাল মরগানের গলা।

মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। এক সময় মুখ তুললেন তিনি। 'তোমরা শুধু প্রার্থনা করো ওঁরা যেন তীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন ওয়রহেডটাকে।'

'তারপর?'

'তারপর অক্ষমের মত বসে থাকব আমরা, দু'জন সাহসী মানবদরদী বীরকে মরে যেতে দেখব।'

নয়

ভঙ্গি করল কবীর চৌধুরীকে লক্ষ্য করে লাফ দিচ্ছে, কিন্তু ডাইভ দিল রানা ডান দিকে। ডেকের ওপর দড়াম করে পড়ল ও। কানের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে কবীর চৌধুরীর বুলেট। ডেকে পড়েই শরীরটাকে গড়িয়ে একটা বাল্কহেডের আড়ালে চলে এল রানা। পায়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে আগেই চলে এসেছে কোল্ট অটোমেটিক। খপ করে সেটা ধরে ফেলল, পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। এক পা এগিয়ে বাড়িয়ে দিল হাতটা, গুলি করল দরজার দিকে। তারপর উঁকি দিয়ে তাকাল। কোথায় কবীর চৌধুরী?

আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটল রানা। প্রচণ্ড রাগে রক্ত চড়ে গেছে মাথায়। শয়তানটাকে খুন করবে সে।

ফ্রন্ট ব্রিজ থেকে স্টোরে, স্টোর থেকে প্যাসেজে, এক প্যাসেজ থেকে আরেক প্যাসেজে—ঝড়ের বেগে ছুটল রানা। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে ও, অনেকটা দূরে। তবু আশা, নাগালের বাইরে চলে যায়নি এখনও।

এক মিনিট পর মেইন ডেকে বেরিয়ে এল রানা। চারদিকে কোথাও খুব বেশিদূর দৃষ্টি যায় না। সুপারস্ট্রাকচারে বাধা পেয়ে আটকে যাচ্ছে দৃষ্টি। কান পাতল। কোথাও কোন পায়ের আওয়াজ নেই। শব্দ হলেও, শুনতে চাওয়া বোকামি। অনবরত গর্জন করছে মেশিনগান আর স্মল আর্মস। হঠাৎ, প্রায় চল্লিশ গজ দূরে ধরা পড়ে গেল রানার চোখে কবীর চৌধুরী। হাত তুলেই গুলি করল রানা।

আনন্দে নেচে উঠল মন। একটা ঝাঁকি খেল কবীর চৌধুরী। পরমুহূর্তে দড়াম করে পড়ে গেল ডেকের ওপর।

ছুটল রানা। কিন্তু তিন পা-ও এগোয়নি, স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল

কবীর চৌধুরী। একটু খোঁড়াচ্ছে, কিন্তু ছুটছে তীরবেগে। কাঠের পায়ে লেগেছে গুলিটা, ভেঙে গেছে সেটা। দ্রুত মেইন ব্রিজের পিছনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সে। গুলি করল রানা। কিন্তু লাগল কিনা বুঝতে পারল না ও। খোঁড়াতে খোঁড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেল কবীর চৌধুরী।

ব্রিজের পিছনে এসে কাউকে দেখল না রানা। জাহাজের কিনারায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল ও। পানির গায়ে একরাশ বুদ্বুদ দেখা যাচ্ছে। এক সেকেণ্ড চিন্তা করল সে। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল, পালাচ্ছে কবীর চৌধুরী। নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না রেখেই পারে না। লাফ দিল রানা নিচের দিকে। শয়তানটাকে এত সহজে ছেড়ে দিতে রাজি নয় সে।

পানিতে পড়ার আগে নদীর দূর সীমানায় একটা বোট দেখল রানা। দাঁড়িয়ে আছে, চলে যাচ্ছে, নাকি এদিকেই আসছে, বুঝতে পারল না।

অনেক ওপর থেকে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল রানা। পড়েই নেমে গেল নদীর একেবারে তলা পর্যন্ত, তারপর আবার যখন ভেসে উঠতে শুরু করল, চোখ মেলে চারদিকে ঘোলা পানি ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না।

হাত আর পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটছে রানা। জানে, দেরি করে ফেলেছে সে। কিন্তু হাল ছাড়েনি এখনও। ঘোলা পানি থেকে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকাল ও। এই সময় চোখে পড়ল স্নরকেল। ভাল করে দেখার সময়ও পেল না রানা, হঠাৎ পানিতে একটা আলোড়ন তুলে হুশ্ করে ছুটতে শুরু করল সেটা। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ভাটির দিকে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। শত্রু পালিয়েছে, পানির নিচে থেকে লাভ নেই আর। নদীর মোহনায় নিশ্চয়ই কবীর চৌধুরীর জন্যে অপেক্ষা করছে সাবমেরিন। অর্থাৎ সত্যিই বেঁচে যাচ্ছে ও।

পানিতে একটা কম্পন অনুভব করল রানা। পানির ওপর মাথা তুলে বুক ভরে শ্বাস নিল ও। চোখ মেলতেই দেখল দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে আসছে একটা পেট্রল বোট। এখনও বেশ দূরে রয়েছে সেটা। মাথার ওপর একটা হাত তুলে সিগন্যাল দিল ও। তারপর সাঁতরে এগোতে শুরু করল বোটের দিকে। ধীরে ধীরে গতি মন্থর হয়ে আসছে পেট্রল বোটের। আইওয়ার কাছাকাছি আসতে চায় না।

দশ মিনিট পর। পেট্রল বোটের ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। চোখ ঘুরিয়ে কাঁচ ভাঙা জানালা আর ভাঙা রেডিও অ্যান্টেনা দেখল ও। সামনে এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ডদেহী এক লোক।

'আমি আর্নেস্ট বাকলার,' বলল সে। 'কোস্টগার্ড পেট্রল বোটের কমাণ্ডার। ডকে ফিরে যাচ্ছিলাম, এই সময় আমাকে জানানো হলো ভিলেন পালাচ্ছে আর একজন হিরো তাকে ধাওয়া করছে—দু'জনকেই উদ্ধার করে বোটে তোলো।'

'আমি মাসুদ রানা, নুমার সাথে কাজ করছি,' বলল রানা।

'কিন্তু ব্যাটলশিপে আপনি উঠলেন কিভাবে?'

'উঠিনি। নেমেছি। আপনি আমার কাছ থেকে একটা রেডিও অ্যান্টেনা পাবেন।'

'আপনি!'
'ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল, রিপোর্ট করার সময় পাইনি। দুঃখিত।'
মইয়ের দিকে ইঙ্গিত করল বাকলার। 'কেবিনে চলুন। আপনার বিশ্রাম দরকার। ডকে আপনার জন্যে একজন ডাক্তার অপেক্ষা করছেন।'
নিচের কেবিনে নেমে এল ওরা। রানার হাতে একটা ধূমায়িত কফির কাপ ধরিয়ে দিল বাকলার। তারপর একটা খোলা দরজার দিকে ফিরে সে তার কমিউনিকেশন অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, 'সেই 'কপ্টারটার শেষ খবর কিছু পেলে?'
'চেসাপিক বে-র ওপরে রয়েছে এখনও, স্যার।'
চেয়ারে বসতে গিয়েও বসল না রানা। মুখ তুলে তাকাল। 'কোন্ হেলিকপ্টার?'
'কেন, নুমার,' বলল বাকলার। 'বাপের কালেও এমন বিদঘুটে দৃশ্য দেখিনি। আইওয়ার একটা শেল থেকে বেরিয়ে এল প্যারাস্যুট, সেই প্যারাস্যুটটাকে 'কপ্টারের সাথে জড়িয়ে নিল পাইলট। বোকার হদ্দ ব্যাটা, নয়তো বদ্ধ পাগল—না হয়েই যায় না।'
গোটা ব্যাপারটার তাৎপর্য অনুধাবন করতে ঝাড়া ছয় সেকেণ্ড সময় নিল রানা। 'থ্যাঙ্ক গড্!' বিড়বিড় করে বলল ও, পরমুহূর্তে বিস্ফোরণের মত গলা থেকে বেরিয়ে এল কয়েকটা শব্দ। 'রেডিও! রেডিও দরকার। কোন্‌দিকে রেডিও রুম?'
এক পা পিছিয়ে গিয়ে ভাল করে তাকাল বাকলার রানার দিকে। 'তার মানে?'
'কথা নয়।' দ্রুত বলল রানা। 'এক সেকেণ্ডের এদিক ওদিকে সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের প্রতিনিধি হিসেবে আমি আপনাকে অর্ডার করছি, রেডিওটা কোথায় দেখান আমাকে।'
রানার দৃষ্টি আর গলার আওয়াজে জরুরী একটা ভাব ফুটে উঠতে দেখল বাকলার। কিন্তু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারল না সে। 'কিন্তু একজন সিভিলিয়ানকে সামরিক কমিউনিকেশন ব্যবহার করতে দেবার নিয়ম নেই···'
'আমাকে দেরি করিয়ে দিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারছেন আপনি,' রূঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'আপনার এই অসহযোগিতার খবর দুনিয়ার সবার কানে যাবে। আমি আপনাকে অর্ডার করছি, রেডিও রুমে নিয়ে চলুন আমাকে।'
দ্বিধা কাটে না বাকলারের। কাঁধ ঝাঁকাল সে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, 'বেশ, চলুন।'

উদ্বিগ্ন চোখে টেমপারেচার গজের দিকে তাকাল রেজনিক। একটু একটু করে লাল ঘরের দিকে এগোচ্ছে কাঁটাটা। আটলান্টিক কোস্টলাইন এখনও ষাট মাইল দূরে। প্রচণ্ড উত্তাপে টারবাইন বিয়ারিং কাজ বন্ধ করে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।
রেডিওর কল লাইট দপ দপ করে জ্বলে উঠল কয়েকবার। ট্র্যান্সমিট বাটনটা অন করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'দিস ইজ হ্যামিলটন। গো অ্যাহেড।'
'আপনি নন, আমিই ব্রেকফাস্টের জন্যে আপনার অপেক্ষায় রয়েছি,

অ্যাডমিরাল।'
'রানা!' বিশুদ্ধ বিস্ময়ে বললেন অ্যাডমিরাল। 'কোথেকে বলছ তুমি? কেমন আছ?'
'ভিজে গেছি, ঠক ঠক করে কাঁপছি ঠাণ্ডায়,' হেডফোনে ভেসে এল রানার কণ্ঠস্বর। 'পেট্রল বোট থেকে বলছি।'
'আরেকটা ওয়রহেড?'
'অকেজো করা হয়েছে।'
'কুইক-ডেথ এজেন্ট?'
'নদীতে,' বলল রানা। আপনাদের অবস্থা, অ্যাডমিরাল?'
ধীর, শান্ত ভঙ্গিতে গোটা পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। বাধা না দিয়ে সবটুকু শুনল রানা। অ্যাডমিরাল থামতে মাত্র একটা প্রশ্ন করল ও।
'আকাশে আপনারা কতক্ষণ থাকতে পারবেন?'
'ফুয়েল যা আছে, টেনে-টুনে দু'আড়াই ঘণ্টা থাকতে পারব,' বললেন হ্যামিলটন। 'কিন্তু জরুরী সমস্যা হলো এঞ্জিনগুলোকে নিয়ে। গরম হয়ে গেছে ওগুলো। যে-কোন মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে।'
'হুঁ,' বলল রানা। 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে প্যারাস্যুটের কাপড় ইন-টেক চেম্বারের খানিকটা ব্লক করে রেখেছে।'
'চমকপ্রদ পরামর্শের জন্যে কান খোলা রেখেছি। দু'একটা দিতে পারো নাকি?'
'বোধ হয় পারি,' বলল রানা। 'কান খোলা রাখুন। দেড় দু'ঘণ্টার মধ্যে সাড়া পাবেন আবার। এর মধ্যে যতটুকু সম্ভব ওজন কমিয়ে ফেলুন। সীট, টুলস না থাকলেও চলে এমন প্রতিটি জিনিস ফেলে দিন 'কপ্টার থেকে। তারপর যা করতে হয় করুন, শুধু আমার সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত আকাশে থেকে যান। রানা আউট।'
রেডিও বন্ধ করে লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার বাকলারের দিকে তাকাল রানা। 'তীরে পৌঁছে দিন আমাকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'
'আট মিনিটের মধ্যে ডকে পৌঁচাচ্ছি আমরা,' বলল বাকলার।
'আমার একটা এয়ারক্রাফট দরকার হবে।'
'আল্লাই জানে আপনার কথায় নেচে ভুল করছি কিনা,' গম্ভীর মুখে বলল বাকলার। 'এই উৎকট ঝামেলায় আপনার ভূমিকা কি, তাও বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় আপনাকে গ্রেফতার করে চালান দেয়া উচিত আমার।'
রক্তচক্ষু মেলে বাকলারের দিকে তাকাল রানা। 'বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছেন আপনি, লেফটেন্যান্ট।' রেডিও অপারেটরের দিকে ফিরে তার কাঁধে টোকা মারল ও। 'নুমা হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করো। কুইক।'
'আমার পেট্রল বোটে দাঁড়িয়ে আপনি আমার সহকারীকে হুকুম করছেন!' কঠিন শোনাল বাকলারের কণ্ঠস্বর।
লোকটার একটা হাতে গুলি লেগেছে, তা নাহলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত রানা। এক পা সামনে এগোল ও। 'আপনার সাহায্য পাবার জন্যে কি করতে হবে

আমাকে?'

বাকলারের চোখে হত্যার নেশা ফুটে উঠল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার চোখে। তারপর কেঁপে উঠল তার চোখের পাতা, ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটল ঠোঁটে। 'বলুন, "প্লীজ"।'

'প্লীজ,' মুচকি হাসল রানা।

ঠিক বারো মিনিটের মাথায় একটা কোস্টগার্ড হেলিকপ্টারে উঠে বসল রানা।

ঝড়ের বেগে ওয়াশিংটনের দিকে ছুটছে 'কপ্টার।

দু'ঘণ্টা সময় যেন দুই শতাব্দীর সমান, ফুরোতেই চায় না। স্লটার বীচের কাছে ডেলাওয়্যার তীর-রেখা পেরিয়ে এল মিনার্ভা। তীর থেকে আটলান্টিকের ওপর পাঁচ মাইল চলে এসেছে ওরা। মোটামুটি শান্ত আবহাওয়া, সামান্য কিছু কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে ওদের পথের সামনে।

ভাঙা যায়নি, আর একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ছাড়া বাকি সব ফেলে দেয়া হয়েছে 'কপ্টার থেকে। হ্যামিলটনের অনুমান, প্রায় চারশো পাউণ্ড ওজন কমানো গেছে। ফুয়েল পুড়ে যাওয়ায় আরও কিছুটা হালকা হয়েছে মিনার্ভা। ভার কমে যাওয়ায় খানিকটা রেহাই পেয়েছে এঞ্জিনগুলো, ফলে এখন আর মারাত্মক ভাবে গরম হয়েও উঠছে না।

ককপিট বাল্কহেডে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছেন হ্যামিলটন। সীটগুলোও তিনি খুলে ফেলে দিয়েছেন, শুধু রেজনিকেরটা ছাড়া। গত দু'ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

'কোন শব্দ···রানার কোন সাড়া?'

ইন্সট্রুমেন্ট থেকে চোখ সরাল না রেজনিক। শুধু মাথা নাড়ল এদিক-ওদিক। 'কোন সাড়া নেই,' বলল সে। 'কিন্তু আর কিই-বা আশা করা যায়? মি. রানা তো আর যাদুকর নন, তাঁর কাছে আলাদীনের চেরাগও নেই।'

'কিন্তু ওর সম্পর্কে আমি যদ্দুর জানি,' বললেন হ্যামিলটন, 'অসম্ভবকে সম্ভব করার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে ওর।'

'এক্ষেত্রে নয়। এই পরিস্থিতিতে কারও কিছু করার নেই।' প্যানেল ক্লকের দিকে তাকাল রেজনিক। 'শেষবার কথা হবার পর দু'ঘণ্টা আট মিনিট পেরিয়ে গেছে। মি. রানা বোধহয় অনিবার্য ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন আমাদেরকে।'

তর্ক করার প্রবৃত্তি হলো না অ্যাডমিরালের। হাত বাড়িয়ে হেড সেটটা তুলে নিয়ে কানে আটকালেন তিনি। চোখ বুজে পড়ে রইলেন চুপচাপ। কোমল একটা প্রশান্তির পরশ অনুভব করলেন, ছেলেমেয়েদের চেহারা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। সবাই বড় হয়েছে, সবাইকে তিনি মানুষ করে ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর অনুপস্থিতি সাময়িক একটা দুঃখ হয়ে বাজবে ওদের বুকে, কিন্তু ওরা কেউ কোন অসুবিধেয় পড়বে না···

'এই যে, ভায়া, মি. রেজনিক, আপনাদের সব খবর কি?'

চমকে উঠল রেজনিক। গলার স্বরে নিখাদ বিস্ময় আর উল্লাস।

'মি. বেন। মি. বেন নেলসন! ইয়াল্লা, কোত্থেকে!'
'ট্র্যান্সমিট' বাটনটা অন করলেন অ্যাডমিরাল। 'বেন?'
'ইয়েস, স্যার।'
'কোথায়?'
'আধ মাইল পিছনে,' স্পীকারে ভেসে এল বেন নেলসনের কণ্ঠস্বর। 'মিনার্ভার দুশো ফুট নিচে।'
ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাডমিরালের চোখে তাকাল রেজনিক। কথা হলো না।
'তোমার না হাসপাতালে থাকার কথা?' প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।
'ডাক্তারদের চোখে ধুলো দিয়ে আমাকে ফুসলিয়ে বের করে নিয়ে এসেছে রানা,' বলল বেন।
'কোথায় মি. রানা?' জানতে চাইল রেজনিক।
'আপনার শিরদাঁড়ার শেষ গিঁটের দিকে তাকিয়ে,' বলল রানা, 'একটা 'কপ্টারের কন্ট্রোলে বসে রয়েছি।'
'দেরি করে ফেলেছেন, মি. রানা।'
'দুঃখিত। ঝামেলার কাজ, সময় লাগে। ফুয়েলের কি অবস্থা?'
'ট্যাংকের তলা ছেঁচে আরও কিছু ফোঁটা পেতে পারি,' গম্ভীর সুরে বলল রেজনিক। 'ভাগ্য সহায়তা করলে আর বড় জোর আঠারো থেকে বিশ মিনিট টিকতে পারব।'
'বিশ মাইলের মধ্যে একটা নরওয়েজিয়ান ক্রুজ লাইনার অপেক্ষা করছে—বিয়ারিং টু-সেভেন-জিরো ডিগ্রিজ। আপনাদেরকে রিসিভ করার জন্যে সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে সান ডেক থেকে সরিয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন। কোর্স বদলে রওনা হয়ে যান...'
'পাগল হয়েছেন!' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রেজনিক। 'ক্রুজ শিপ...সান ডেক—এসব কি প্রলাপ বকছেন?'
আগের মতই শান্ত স্বাভাবিক গলায় বলল রানা, 'রশি কেটে প্রজেক্টাইলটা আমরা ফেলে দিলেই আপনি 'কপ্টার নিয়ে ক্রুজ শিপে চলে যাবেন। ওটাকে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধেই হবে না আপনার। মিনার্ভাকে থামান।'
'আপনাদের ভাগ্য! রীতিমত ঈর্ষা হচ্ছে আমার। জাহাজের ক্যাপ্টেন রাজকীয় ব্রেকফাস্ট নিয়ে অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্যে,' বলল বেন।
বেন থামতেই চেঁচিয়ে বলল রেজনিক, 'ব্রেকফাস্ট! হায় আল্লা, ওরা দুজনেই পাগল হয়ে গেছে!' শূন্যে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে সে মিনার্ভাকে।
কো-পাইলটের সীটে বসে রয়েছে বেন, তার দিকে তাকাল রানা। ইঙ্গিতে প্লাস্টার মোড়া একটা পা দেখিয়ে জানতে চাইল, 'ওই পা নিয়ে কন্ট্রোলের দায়িত্ব নিতে পারবে তো?'
'চুলকানো ছাড়া বাকি সব পারব।'
'তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি তাহলে।' কন্ট্রোল কলাম থেকে হাত সরিয়ে নিল রানা। সীট ছেড়ে এগিয়ে গেল কার্গো সেকশনের দিকে। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা

বাতাস ঢুকছে খোলা হ্যাচ দিয়ে। রঙচঙে আলখাল্লা পরে প্রৌঢ় এক লোক সামনে কালো একটা চারকোনা মেশিন নিয়ে বসে রয়েছেন। 'আপনি রেডি, ড. গল?'

'এক মিনিট,' বললেন ড. গল। 'কুলিং টিউবগুলো হুকে আটকে নিলেই হাতের কাজ শেষ হয়ে যাবে। মাথা আর পাওয়ার সাপ্লাইয়ের চারদিকে পানি সরবরাহ না করতে পারলে ইউনিটটা অকেজো হয়ে যাবার ভয় আছে।'

'আমি কিন্তু আরও শক্তিশালী কিছু একটা আশা করেছিলাম,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'লার্জ-ফ্রেম অ্যারগন লেযার এটা। সায়েন্স ফিকশনে ওরা যেটা দেখায় তার কোন অস্তিত্ব নেই বাস্তবে। চিন্তার কিছু নেই, এটা দিয়ে বাস্তব সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যায়।'

'পাওয়ার?'

'খুদে একটা বীমে আঠারো ওয়াট জমাট বেঁধে থাকে, রিলিজ করে দুই কিলোওয়াট এনার্জি—খুব বেশি নয়। তবে কাজ চলে যাবে।'

'প্রজেক্টাইলের কতটা কাছে যেতে হবে 'কপ্টারকে?'

'যতটা কাছে সম্ভব—পনেরো ফুটের কম নয়।'

মাইকের বোতামে চাপ দিল রানা। 'বেন?'

'বলো।'

'প্রজেক্টাইলের পনেরো ফুটের মধ্যে নিয়ে চলো 'কপ্টার।'

'সে কি! অত কাছে গেলে মিনার্ভার রোটর...'

'উপায় নেই,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'রোটর ব্লেডের বাতাস আমাদেরকে উল্টে দেবে বলে মনে করি না।'

লেযারের মেইন সুইচটা শেষবারের মত পরীক্ষা করলেন ড. গল।

'শুনছেন, কর্নেল?' বলল রানা।

'বলুন, মি. রানা।'

'বেন মিনার্ভার যতটা সম্ভব কাছে যাচ্ছে। একটা লেযার বীমের সাহায্যে প্যারাস্যুটের রশি ছিঁড়ে প্রজেক্টাইলটাকে ফেলে দিতে চাই আমরা।'

'বুঝলাম!' বললেন অ্যাডমিরাল।

'পজিশন নিচ্ছি,' শান্তভাবে বলল রানা। 'স্টেডি অন কোর্স।'

ঘড়ি মেরামতকারীর ধৈর্য আর নৈপুণ্য নিয়ে 'কপ্টারটাকে মিনার্ভার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল বেন। মিনার্ভার একটু নিচে শূন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল 'কপ্টার।

কার্গো সেকশন। ড. গলের দিকে তাকাল রানা। তারপর উঁকি মেরে প্রজেক্টাইলটা দেখল। বারবার, দ্রুত দৃষ্টি ফেরাচ্ছে ও।

নুমার হেড ফিজিসিস্ট ড. গল ঝুঁকে পড়লেন লেযারের মাথার দিকে। ভয় বা উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নেই তাঁর চেহারায়। রানার মনে হলো, কাজ করে দারুণ মজা পাচ্ছেন ভদ্রলোক।

'কই, কোন বীম তো দেখতে পাচ্ছি না!' বলল রানা। 'কাজ করছে না নাকি?'

‘ধারণাটাই ভুল,’ বললেন গল। ‘অ্যারগন লেযার বীম হচ্ছে ইনভিজিবল।’
‘কিন্তু তাক করছেন কিভাবে?’
‘এই যে, ত্রিশ ডলারের টেলিস্কোপিক রাইফেল সাইটের সাহায্যে,’ গোল টিউবটার গায়ে টোকা মারলেন গল।
উপুড় হয়ে শুয়ে মাথাটা খোলা হ্যাচের বাইরে বের করে দিয়েছে রানা। বাতাসে চুল উড়ছে তার। মিনার্ভার নিচে ঝুলছে প্রজেক্টাইল। ওটার দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না, এতটুকুন একটা প্যাকেজের ভেতর একটা মহা-দেশের সমস্ত প্রাণী ধ্বংস করার বীজ থাকতে পারে।
‘আরও কাছে নিয়ে চলো, বেন!’ হাঁক ছাড়লেন গল। ‘আরও দশ ফুট।’
‘দশ ফুট কাছে নিয়ে চলো,’ মাইক্রোফোনে বেনকে নির্দেশ দিল রানা।
‘কিন্তু…আরও কাছে গেলে মিনার্ভার রোটর ব্লেড কচুকাটা করবে যে…’ বিড়বিড় করছে বেন। কিন্তু চেহারায় উদ্বেগ বা ভীতির চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু দরদর করে ঘামছে সে। চোখে ক্ষুরধার দৃষ্টি।
এতক্ষণে একটা পরিবর্তন ধরা পড়ল রানার চোখে। প্রজেক্টাইলের ওপরের রশিগুলোর রঙ বদলে কালচে হয়ে গেছে। অদৃশ্য লেযার বীম নাইলনের রশিগুলোকে ধীরে ধীরে পুড়িয়ে ফেলছে। রশির ভিড়ের দিকে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে ও। সংখ্যায় কত ওগুলো! পঞ্চাশটা, নাকি আরও বেশি?
‘মেশিনটা গরম হয়ে গেছে!’ একটা হাহাকার ধ্বনির মত শোনাল ড. গলের কথাগুলো।
ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। এটাই শেষ ভরসা। এতেও যদি কাজ না হয়, ওদেরকে বাঁচাবার উপায় কি!
‘বড় বেশি ঠাণ্ডা এখানে,’ আবার বললেন গল। ‘কুলিং টিউবগুলো জমাট বেঁধে গেছে।’ টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ রাখলেন আবার।
রানা দেখল, কয়েকটা রশি ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলে পড়েছে প্রজেক্টাইলের নিচে। পোড়া কটু গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে ’কপ্টারের ভেতরের বাতাস।
মন্থর গতিতে আরও আট দশটা রশি পুড়ল। কিন্তু বাকিগুলো টান টান হয়ে রয়েছে এখনও।
অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালেন গল। হাতের দস্তানা খুলে ফেললেন তিনি। ‘আমি দুঃখিত, মি. রানা। লেযার কাজ করছে না।’
এখনও ঝুলছে প্রজেক্টাইল। ঝাড়া বিশ সেকেণ্ড নড়ল না রানা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।
‘আর কারও কিছু করার নেই,’ স্বীকারে অস্বাভাবিক শান্ত শোনাল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের গলা। ‘যথেষ্ট করেছ তুমি, রানা। অসংখ্য ধন্যবাদ।’
‘গু-ড-বা-ই, মি. রানা,’ হতাশায় ফিসফিস করে বলল কর্নেল।
কিন্তু ওদের কথা যেন কানেই যায়নি রানার। শান্ত, সহজ গলায় বলল, ‘ডাইভ দিন, কর্নেল। তারপর আচমকা নাক [illegible]লে ওপরে উঠুন।’
‘কি! কি বললেন!’

'এটাই আপনাদের শেষ আশা। নাক নিচু করে ডাইভ দিন। ফুল স্পীডে। রশিগুলোয় ঢিল পড়বে। তখন নাক ওপর দিকে তুলে উঠতে শুরু করবেন। প্রচণ্ড টান পড়বে রশিতে। ছিঁড়ে যাবে ওগুলো। সময় নেই, তাড়াতাড়ি করুন। ডাইভ দিন।'

মৃদু হাসির শব্দ ভেসে এল রেডিও স্পীকারে। 'পণ করেছ বাঁচাবেই, তাই না? কিন্তু পারবে বলে মনে হয় না, রানা।'

'দেখা যাক,' শান্তভাবে বলল রানা। 'কর্নেল, ডাইভ দিন।'

'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সামনে,' বলল রেজনিক।। 'শুধু ইন্সট্রুমেন্টের ওপর নির্ভর করে...'

'অযথা সময় নষ্ট করছেন আপনি!' ধমকে উঠল রানা। 'যা বলছি করুন। আপনাদের পিছনে থাকছি আমরা।'

কন্ট্রোল স্টিক সামনে ঠেলে দিল রেজনিক।

সত্তর ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ডাইভ দিল মিনার্ভা। শুয়ে আছেন অ্যাডমিরাল, পা বাধিয়ে রেখেছেন রেজনিকের সীটের গোড়ায়। মিনার্ভার নাক সাগরের দিকে তাক করা, তীরবেগে নেমে যাচ্ছে সে।

চার হাজার ফুট।

মিনার্ভাকে অনুসরণ করছে বেনের 'কপ্টার, কিন্তু বেশ খানিকটা পিছনে থেকে।

অলটিমিটার আর এয়ারস্পীড ইণ্ডিকেটরের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে কর্নেল রেজনিক।

তিন হাজার ফুট।

বনবন করে ঘুরছে মিনার্ভার রোটর ব্লেড। নিজেদের 'কপ্টার থেকে দেখল রানা, কমলা রঙের প্যারাস্যুটের কাপড় পতাকার মত পত পত করে উড়ছে, ছুঁই ছুঁই করছে রোটরের ব্লেড। তবু চুপ করে থাকল ও, রেজনিকের মাথায় এমনিতেই হাজারটা চিন্তা, আরেকটা বিপদের কথা জানিয়ে এই মুহূর্তে তাকে বিচলিত করার কোন মানে হয় না।

থরথর করে কাঁপছে মিনার্ভা। গতি বাড়ার সাথে সাথে শুরু হয়েছে বাতাসের তাণ্ডব। কন্ট্রোল সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কর্নেল রেজনিক। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো স্টিকটাকে পজিশনে স্থির রেখে এই নিষ্ঠুর যাতনার সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়া যাক। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, সারাদিনে এই প্রথম, স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ে গেল তার। ওদেরকে আবার দেখতে পাবার আকুল ইচ্ছেটা অকস্মাৎ সমগ্র অস্তিত্বে আগুন ধরিয়ে দিল যেন। বিড় বিড় করে প্রতিজ্ঞা করল সে, 'আমাকে বাঁচতে হবে!'

'হ্যাঁ, এইবার,' এয়ারফোনে বজ্রনির্ঘোষের মত শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। 'পুল আউট!'

হ্যাঁচকা টান দিয়ে স্টিকটা পিছিয়ে আনল রেজনিক।

দু'হাজার ফুট।

আকাশের দিকে নাক উঁচু করল মিনার্ভা। উঠতে শুরু করল ওপর দিকে। ঢিল পড়েছিল রশিতে, হঠাৎ প্রচণ্ড টান পড়ল। রশির শেষ মাথায় ঝুলন্ত ভারী প্রজেক্টাইল রশির টানে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ওপর দিকে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, উঠে এসে প্রচণ্ড ধাক্কা মারতে যাচ্ছে সেটা মিনার্ভার পেটে।

আঁতকে উঠল রানা।

আবার নেমে গেল প্রজেক্টাইল। আবার একটা ঝাঁকি খেল রশিগুলো। কিন্তু হতাশায় মুষড়ে পড়ল রানা। একটা রশিও ছেঁড়েনি। শেষ প্রান্তগুলোয় এখনও ঝুলছে প্রজেক্টাইল।

স্পীড কমিয়ে আনল রেজনিক। কিন্তু থামল না। কেউ কথা বলছে না ওরা।

প্রথমে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। আর মাত্র কয়েকটা মিনিট বাকি, তারপর সব শেষ। কিন্তু তাঁর কথার সুরে কৌতুকের ক্ষীণ রেশ ফুটে উঠল। 'যাদুকরের হাতে আর কোন খেলা আছে নাকি দেখাবার মত?'

শুনল রানা, কিন্তু সাড়া দিল না। স্তব্ধ হয়ে গেছে ও। মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তবে কি মেনে নিতে হবে পরাজয়? চোখের সামনে আত্মহত্যা করতে দেবে দু'জন মহৎ হৃদয় মানুষকে? কোন উপায় নেই?

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল বেন। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা।

'আর এগারো মিনিট বাকি,' স্পীকারে ভেসে এল কর্নেলের গলা। 'তারপরই ফুয়েল শেষ হয়ে যাবে। মি. রানা, অনুসরণ করার দরকার নেই আর। অসংখ্য ধন্যবাদ। রেজনিক আউট।'

'শূন্যে দাঁড় করান মিনার্ভাকে,' অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল রানা।

'কিন্তু...'

'দ্যাটস অ্যান অর্ডার!' বাঘের মত গর্জে উঠল রানা।

'কি করতে চাইছ, রানা?' বিমূঢ় বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইল বেন।

শূন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল মিনার্ভা।

'মিনার্ভার ত্রিশ ফুট ওপরে,' বলল রানা, 'রোটর ব্লেডের কিনারা বাঁচিয়ে যতটা কাছাকাছি সম্ভব থামাও 'কপ্টার। দড়ির মই বেয়ে নামব আমি। রেডিও মেসেজ পাঠাও ক্রুজ শিপকে। ফুল স্পীডে আসতে বলো এদিকে। কুইক!'

'রানা!'

রেজনিককে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানাল রানা।

'অসম্ভব!' তীব্র প্রতিবাদের সুরে মিনার্ভা থেকে বললেন অ্যাডমিরাল। 'তুমি আত্মহত্যা করতে চাইছ। এ আমি হতে দেব না।'

'আমাকে আপনি অপমান করছেন, অ্যাডমিরাল,' কঠিন শোনাল রানার গলা। 'কি করতে যাচ্ছি, ভালই জানা আছে আমার। দু'টো 'কপ্টার নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকবে। নাইলনের সিঁড়ির শেষ প্রান্তে ঝুলব আমি। দোল খাব। প্যারাস্যুটের রশি নাগালের মধ্যে না আসার কোন কারণই নেই।'

'কপ্টার দাঁড় করাল বেন। তারপর ধীরে ধীরে, একটু একটু করে মিনার্ভার দিকে এগোল।

পনেরো ফুট দূরত্ব বাকি থাকতে স্থির হলো 'কপ্টার।

নাইলনের সিঁড়ি নামিয়ে দিয়েছেন ড. গল। কোন কথা বললেন না, খাপ সহ একটা ছুরি রানার বেল্টে গুঁজে দিয়ে ওর পিঠ চাপড় দিলেন তিনি।

'রানা...' অ্যাডমিরাল কি যেন বলছেন মিনার্ভা থেকে। কান দিল না রানা।

দু'হাজার পাঁচশো ফুট নিচে আটলান্টিকের ঢেউগুলোকে ছোট ছোট দেখাচ্ছে। বাতাসে দোল খাচ্ছে নাইলনের সিঁড়ি। শেষ প্রান্তে ঝুলছে রানা। ড. গল হুইল ঘুরিয়ে একটু একটু করে নামিয়ে দিচ্ছে ওকে।

মিনার্ভার দুটো জানালায় দেখা গেল দুটো উদ্বেগাকুল মুখ। মাথার ওপর হাত তুলে সিগন্যাল দিল রানা। স্থির হয়ে গেল সিঁড়ি।

পঞ্চাশ ফুট লম্বা সিঁড়ির গোড়ায় ঝুলছে রানা। বাতাসের অনুকূলে দোল খেতে শুরু করল ও।

মাথার ভেতর শুধু একটাই চিন্তা। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে মিনার্ভার ফুয়েল।

দোলের পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। প্রজেক্টাইলের কাছাকাছি এসে আবার ফিরে যাচ্ছে ও। এখনও পাঁচ ফুটের মত কমাতে হবে দূরত্ব। আবার আসছে ও।

প্রজেক্টাইলের রশিগুলো এবারও সাড়ে চার ফুট দূরে রয়ে গেল।

চিৎকার করছেন অ্যাডমিরাল। কি যেন বলতে চাইছেন তিনি। প্রজেক্টাইলের দিকে আবার দ্রুত এগোল রানাকে নিয়ে সিঁড়িটা। মুখ তুলে তাকাল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। মিনার্ভার রোটর ব্লেডের সাথে আরেকটু হলে বাড়ি খেতে যাচ্ছিল সিঁড়ির রশি।

আবার আসছে রানা। এবারই যা করার করতে হবে। এর পরে ব্লেডের সাথে নির্ঘাৎ ধাক্কা খাবে সিঁড়ির ওপরের অংশ। তাহলে ঝুপ করে প্রায় আড়াই হাজার ফুট নিচে নেমে যাবে সে।

সোঁ-সোঁ করে বাতাস কেটে এগোল রানা। জানে, চার ফুটের মত দূরে থাকবে প্যারাস্যুটের রশিগুলো, নাগালের মধ্যে পাবে না ওগুলোকে। অথচ এটাই তার শেষ সুযোগ।

দোলের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছুল সিঁড়ি। স্ট্র্যাপটা আগেই খুলে ফেলেছে রানা। সামনে বাড়িয়ে দিল দুই হাত। ঝাঁপিয়ে পড়ল শূন্যে।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাকিয়ে রয়েছে বেন। উদ্বেগের কোন চিহ্ন নেই চেহারায়।

আঁতকে উঠল রেজনিক। দুই 'কপ্টারের মধ্যবর্তী শূন্যে দেখল সে রানাকে, চোখ বুজে ফেলল। থরথর করে কাঁপছে শরীর।

রানা ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই ছ্যাঁৎ করে উঠল অ্যাডমিরালের বুক। রানাকে চেনেন তিনি। কিন্তু সে চেনায় যেন অসম্পূর্ণতা ছিল। আজ আবার নতুন করে চিনলেন তিনি। তাকিয়ে থাকলেন নিষ্পলক চোখে। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো প্যারাস্যুটের রশিগুলো ধরতে পারল না রানা। কিন্তু পর মুহূর্তে সারা শরীরে স্বস্তির পরশ অনুভব করলেন। প্রজেক্টাইলের কয়েক ফুট ওপরে প্যারাস্যুটের রশি ধরে ফেলেছে রানা।

রশি ধরে ফেলল রানা, হড় হড় করে নেমে গেল দু'ফুট, তারপর স্থির হলো। পায়ের আঙুল থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি নিচে রয়েছে প্রজেক্টাইলের মাথা।

একটা নাইলনের রশি কোমর আর বুকে পেঁচিয়ে নিয়ে ঘাড়ের পিছনে সরিয়ে দিল রানা, মাথার পিছনটা টানটান রশিটার গায়ে ঠেকিয়ে স্থির করল শরীরটাকে। বাঁ হাতে ধরে আছে মাথার ওপরে সেই রশিটাই। ডান হাত দিয়ে বেল্ট থেকে বের করল ছুরি।

ঝুঁকে পড়ল রানা। হাঁটুর কাছে রশিগুলো ছুরি চালিয়ে একটা একটা করে কাটতে শুরু করল ও।

ধারাল ছুরি। কিন্তু নাইলনের রশিগুলো সাংঘাতিক পিচ্ছিল আর শক্ত। অনেক কষ্টে ছুরি বসাল রানা।

দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। মাত্র তিনটে রশি কেটেছে রানা, এখনও পাঁচটা বাকি। ওপর থেকে কে যেন কি বলছে, কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই ওর। হয়তো ফুয়েল শেষ হবার ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ জানাচ্ছেন হ্যামিলটন। শুনে লাভ নেই এখন কোন। অ্যাডমিরাল আর রেজনিকের ভাগ্যের সাথে ওর ভাগ্যও এক সুতোয় গাঁথা হয়ে গেছে। ফুয়েল শেষ হয়ে গেলে...মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা সরিয়ে দিয়ে ছুরি চালাল ও। কিন্তু চিন্তাস্রোত থামল না। কতক্ষণ হলো 'কপ্টার থেকে নেমেছে সে? পাঁচ মিনিট? নাকি দশ মিনিট? আর মিনিট খানেক চালু থাকবে মিনার্ভা?

আর একটা। আর মাত্র একটা রশি কাটতে হবে। অর্ধেকটা কাটা হয়ে গেছে।

বাকি অর্ধেকটা আর কাটতে হলো না রানাকে। ওয়রহেডের ভর সইতে না পেরে পট্ করে ছিঁড়ে গেল সেটা। নিচের দিকে তাকাল রানা। তীর বেগে নেমে যাচ্ছে ধ্বংসের বীজ ভর্তি প্রজেক্টাইল। হাঁপ ছাড়লেন হোয়াইট হাউসের দর্শকবৃন্দ।

হাঁপাতে হাঁপাতে ওপর দিকে তাকাল রানা। সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল মন থেকে। ফুয়েল এখনও শেষ হয়নি। শেষ হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে এভাবে হাসতে পারতেন না।

হাত নেড়ে সিগন্যাল দিল রানা। তৈরি হয়েই ছিল রেজনিক। তার চোখ দিয়ে হু-হু করে পানি গড়াচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। কন্ট্রোল কলামের ওপর ছুটে বেড়াল তার হাত।

ছুটল মিনার্ভা। নিচে প্যারাস্যুট রশির শেষ প্রান্তে ঝুলছে রানা।

মাত্র ছয় মাইল দূরে-দেখা যাচ্ছে নরওয়েজিয়ান ক্রুজ শিপ।

আস্তিন দিয়ে চোখ মুছে ফুয়েল ইণ্ডিকেটরের দিকে তাকাল রেজনিক। স্পীড কমিয়ে আনল মিনার্ভার। এখনও যা ফুয়েল আছে, আরও দশ মাইল যেতে পারবে ওরা।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে নিচে, রানার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল রানাও। গায়ের পোশাক, চুল বাতাসে উড়ছে ওর। চোখাচোখি হতেই হাসল ও। তারপর মাথা ঘুরিয়ে সামনে তাকাল।

কিন্তু রানার দিকে এখনও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ

হ্যামিলটন। আশ্চর্য! আশ্চর্য! অদ্ভুত একটা ছেলে।

দশ

কয়েক ঘণ্টা পরের কথা। হোয়াইট হাউস।

গভীর মনোযোগের সাথে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কথা শুনছেন প্রেসিডেন্ট। মুখোমুখি দুটো সোফায় বসে আছেন তাঁরা। দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে তৃতীয় কোন ব্যক্তি উপস্থিত নেই।

কথা শেষ করে থামলেন অ্যাডমিরাল। একটা চুরুট ধরালেন তিনি।

'তার মানে বিপদের সম্ভাবনা রয়েই গেল,' চিন্তিত ভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কবীর চৌধুরীকে ছোট করে দেখে মারাত্মক ভুল করেছে সি.আই.এ। এ-ব্যাপারে আমি একটা তদন্তের নির্দেশ দেব। কিন্তু, জর্জ, লোকটাকে ধরার উপায় কি বলো তো?'

'আবার নতুন কোন বিপদের কারণ না ঘটানো পর্যন্ত তাকে না ঘাঁটালেই ভাল হয়,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'মাসুদ রানার সাথে আমার যোগাযোগ তো থাকছেই, কবীর চৌধুরীর ওপর তীক্ষ্ণ নজর আছে ওর। কবীর চৌধুরী আবার কোন মতলব আঁটলে জানতে পারব আমি।'

রিস্টওয়াচ দেখলেন প্রেসিডেন্ট। যা ঘটে গেল, এর প্রতিক্রিয়া ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিতে পারে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগেই কয়েকটা জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে তাঁকে। ফুল কেবিনেট মীটিং বসতে যাচ্ছে দশ মিনিটের মধ্যে। এরই মধ্যে নিউজ মিডিয়াগুলো যার যা খুশি গুজব রটাতে শুরু করে দিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা অন্য এক রঙে পরিবেশন করতে হবে, যাতে স্বস্তি পায় দেশের মানুষ, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকে।

'দুঃখিত, আরও একটা কথা বলা হয়নি আপনাকে, মি. প্রেসিডেন্ট,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কট মারা গেছেন। অসুস্থ শরীরে ট্রুথ সেরামের ডোজ সহ্য করতে পারেননি তিনি।'

বিষাদের ছায়া পড়ল প্রেসিডেন্টের চেহারায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আশ্চর্য বলিষ্ঠ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি, সন্দেহ নেই। এতগুলো বছর কুইক-ডেথ রহস্য চেপে রাখা আর কারও পক্ষে সম্ভব হত কিনা জানি না। যাই হোক, "সব ভাল যার শেষ ভাল"। মহা-ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেছি আমরা।'

'রঙ্গেলো আইল্যাণ্ড এখনও রয়েছে, মি. প্রেসিডেন্ট,' স্মরণ করিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'হ্যাঁ,' ওপর নিচে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। 'বিষাক্ত ক্ষতটা রয়ে গেল।'

'কুইক-ডেথের অবশেষ রাখা উচিত হবে না, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'তোমার কোন প্রস্তাব আছে, জর্জ?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'রঙ্গেলো দ্বীপকে মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই।'

'তা কিভাবে সম্ভব? আণবিক বোমা ফাটালে সোভিয়েট রাশিয়া মহা হৈ-চৈ শুরু করে দেবে। তুমি জানো, মাটির ওপর আণবিক বোমা টেস্ট করা শীঘ্রিই নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।'

'আমরাই যে ওটা ফাটিয়েছি, তা কেউ জানবে কিভাবে? চাইনীজ মেইনল্যাণ্ডের যতটা সম্ভব কাছে একটা মিসাইলবাহী সাবমেরিন পাঠাব আমরা, ওখান থেকে একটা নিউক্লিয়ার ওয়রহেড ছুঁড়ে গায়েব করে দেয়া হবে রঙ্গেলোকে।'

চিন্তার গভীর রেখা ফুটে উঠল প্রেসিডেন্টের কপালে। তাকিঁয়ে আছেন অ্যাডমিরালের দিকে।

'সোভিয়েটরা জানে, এই মুহূর্তে আমাদের হাতে কোন টেস্ট প্রোগ্রাম নেই। বিস্ফোরণ এলাকার দু'হাজার মাইলের মধ্যে আমাদের বা আর কারও কোন সারফেস শিপ বা এয়ারক্রাফট নেই, সোভিয়েটদের স্পাই স্যাটেলাইটে ধরা পড়বে চাইনীজ টেরিটরি থেকে ছোঁড়া হয়েছে মিসাইলটা।'

'কিন্তু চীনারা...'

'সোভিয়েটদের প্রচণ্ড অভিযোগের মুখে কি করবে চীনারা? যা নিয়ম, ওরাও পাল্টা অভিযোগ করবে। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হতে দু'হপ্তার বেশি লাগবে বলে মনে হয় না।'

বিবেকের সাথে লড়ছেন প্রেসিডেন্ট। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। পায়চারি শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ থামলেন অ্যাডমিরালের সামনে।

'খোদার কাছে প্রার্থনা করি,' বললেন তিনি, 'ইতিহাসে আমিই যেন শেষ মানুষ হই যে সজ্ঞানে একটা নিউক্লিয়ার বোমা হানার অনুমতি দিয়েছে।'

জানুয়ারি।

রঙ্গেলো দ্বীপ। নামেই দ্বীপ, আসলে ওটা একটা প্রবালের ছোট্ট টুকরো বৈ কিছু নয়। চারপাশে এক লক্ষ ষাট হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে গভীর পানি ছাড়া আর কিছু নেই, পানির ওপর সামান্য একটু মাথা তুলে রয়েছে শুধু এই খুদে প্রবাল। পানি থেকে মাত্র ছয় ফুট উঁচু রঙ্গেলো, দশ মাইল দূর থেকেও দেখা যায় না।

কয়েকটা পামগাছ ছাড়া আর কিছু নেই রঙ্গেলোয়। শুধু মাঝখানে পড়ে আছে ড. ভিটেলি আর তার সহকারীদের কঙ্কাল। মণিহীন চোখ তুলে অনন্তকালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কঙ্কালগুলো।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কমলা রঙের মেঘের ভেতর থেকে সোনালী রঙের একটা খুদে আকৃতি নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। প্রচণ্ড গর্জন তুলে ছুটে আসছে মিসাইলটা, কিন্তু সে গর্জন রেখে আসছে পিছনে।

অকস্মাৎ চোখ ধাঁধানো নীলচে-সাদা একটা আলো কয়েকশো মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। বিশাল একটা আগুনের গোলক গ্রাস করে ফেলল রঙ্গেলোকে। এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে বিস্ফোরিত হলো দ্বীপটা। কমলা রঙের আলোটা

টকটকে লাল হয়ে উঠছে। শক ওয়েভের ধাক্কায় আকাশের দিকে লাফ দিল সাগর। পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠল ঢেউগুলো। তারপর আগুনের গোলকটা উঠতে শুরু করল আকাশের দিকে। কয়েক মিলিয়ন টন প্রবাল এরই মধ্যে ছাই হয়ে গেছে। পাঁচ বর্গ মাইল জুড়ে ভাসছে রঙ্গেলোর অবশিষ্ট ভস্ম। এক মিনিটেরও কম সময়ে আগুনের গোলকটা এক লক্ষ পনেরো হাজার ফুট ওপরে উঠে গেল। ওখানে ভেসে থাকল ওটা। ক্রমশ ঠাণ্ডা হচ্ছে, সেই সাথে বিশাল কালো ধোঁয়ায় রূপান্তরিত হচ্ছে তার চেহারা। ধীরে ধীরে সরে গেল উত্তর দিকে।

মানচিত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল রঙ্গেলো দ্বীপ।

সেই সাথে কুইক-ডেথ অরগানিজম।

****